অরূপ রতন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ : বৈশাখ, ১৩৫০

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ পট
শ্রীমনোজ বিশ্বাস

পনেরো টাকা

পাড়াগাঁয়ের মহাপ্রাণ ধন্বন্তরি
প্রয়াত ডাঃ চিত্তরঞ্জন সিংহের
স্মৃতির উদ্দেশে

পূর্বকথা

বসন্তপুর হল্ট থেকে পশ্চিমে ক্রোশ দুই গেলে মাঝারি আয়তনের একটি নদী পড়ে। নদীর নাম করালী। করালীর ওপারে কিছুদূর বিস্তৃত এক বনভূমি। তার ভেতর দেবী করালীর জীর্ণ প্রাচীন মন্দির। একসময় এই মন্দিরের চারপাশ ঘিরে পাঁচিল এবং ধর্মশালাও ছিল। কালক্রমে পাঁচিল ভেঙে পড়েছে। ধর্মশালার অবস্থাও তদ্রূপ। মেঝেয় ফাটল ধরেছে। ফাটলের ভেতর দিয়ে পেছনের বটগাছের শেকড় বাকড় এগিয়ে এসেছে। যেন মহাকাল তাঁর নৈসর্গিক পাঞ্জায় মনুষ্যসৃষ্ট এক রম্যনিকেতনকে বেশি মাত্রায় শাসন করতে গিয়ে তাকে ধ্বংস করেই ফেলেছেন প্রায়।

বাংলা ১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে বাঁকা-শ্রীরামপুরের মথুরামোহন তাঁর মেয়ে কনককে নিয়ে করালীর মন্দিরে পূজো দিতে গিয়েছিলেন। মথুরামোহন ততকিছু পয়সাওলা মানুষ ছিলেন না। জমিদারী সেরেস্তায় নিছক হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। তাঁর পদটিকে বলা হত সেরেস্তাদার। মাসে সাড়ে সাতটাকা বেতন। সেরেস্তায় সার্বিকভাবে যে উপরি আয়ের গোপন চক্র ছিল, সেখান থেকে মাঝে-মধ্যে তাঁর ফতুয়ার পকেটে দুচারপয়সা নেহাত মুখচাপা দিতেই গুঁজে দেওয়া হত। সরল মানুষ মথুরামোহন নীতিবোধ সত্ত্বেও মুখ বুজে এই উপরি নিতেন। না নিয়ে উপায়ও ছিল না। কিন্তু পাপভয়ে সেই বাড়তি রোজগারের সবটাই নানাভাবে দান করে ফেলতেন। এই অভ্যাসের ফলে তাঁর বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটেনি। এমন কী একালের মধ্যবিত্ত চাকুরেদের মতো মাঝেমাঝে তিনি প্রচণ্ড অর্থাভাবে পড়তেন। করালীর মন্দিরে যাবার সময় তাঁর ওইরকম দৈন্যদশা চলছিল।

তাই বসন্তপুর হল্টে নেমে গরুর গাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য সেদিন তাঁর ছিল না। চোদ্দবছর বয়সের মেয়ে কনকের একটি পা জন্মাবধি বিকল। ওই বিকলাঙ্গ মেয়েকে দুক্রোশ দূরত্ব পেরিয়ে করালীর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া বস্তুত কঠিন কর্ম। কিন্তু মথুরামোহনের শারীরিক সামর্থ্য ছিল প্রচুর। কনক একটি লাঠির সাহায্যে কিছুটা চলাফেরা করতে পারত। সেও বড়জোর বাড়ির সীমানার মধ্যে। করালীর মন্দিরে যাবার রাস্তায় কয়েকপা এগিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন মথুরামোহন মেয়েকে কাঁধে তুলে নিচ্ছিলেন। এই রাস্তায় এমন দৃশ্য নতুন কিছু ছিল না।

করালী নদীতে চৈত্রের গোড়ার দিকে চড়া পড়ে যায়। সোনালী বালির ভাঁজে-ভাঁজে ঝিলমিল করে ক্ষীণ জলের ধারা বয়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বাবা ও মেয়ে করালী নদীতে সেটুকু জলও দেখতে পেল না। তাদের তৃষ্ণা পেয়েছিল। নদী পেরিয়ে বনভূমির ভেতর সামান্য কিছুটা এগিয়ে যখন মন্দির দেখা গেল, তখন কনক মৃদুভাবে 'জল' শব্দটা উচ্চারণ করল।

মথুরামোহন শান্তভাবে হেসে বললেন, 'এখনই জল পেয়ে যাবি, মা। একটুখানি ধৈর্য ধর। প্রাঙ্গণে ইঁদারা আছে।'

ততক্ষণে বনভূমির ভেতর এই মন্দিরে শেষ বেলার ধূসরতা গাঢ় হয়েছে। ভাঙা তোরণের দুপাশে ইটের স্তূপে ক্ষয়াখর্বুটে গুল্ম জন্মেছে। মাথার ওপর বিশাল সব গাছের ডালপালা আর পুরু পাতার ছাউনি আকাশকে আড়াল করেছে। চারপাশে গভীর কোন অন্তরাল থেকে পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কখন বাতাস থেমে গেছে মথুরামোহন লক্ষ্য করেননি। পাখিদের ওই তুমুল অথচ চাপা চিৎকারও যেন একটা গুমোট স্তব্ধতারই অংশ হয়ে উঠেছে। নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে কনককে নামিয়ে রেখে মথুরামোহন একটু কেসে সাড়া দিলেন। তারপর ইঁদারার দিকে এগিয়ে গেলেন। ইঁদারার গোড়াটা গোল করে কালোপাথরে বাঁধানো। পাথর মসৃণ হয়ে আছে। একপাশে দড়ি ও বালতি যত্ন করে রাখা আছে। বালতি নামাবার সময় মথুরামোহন মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, কনক তার লাঠির সাহায্যে একপা-একপা করে এগিয়ে আসছে। তার সুন্দর মুখে তৃষ্ণার রেখা ফুটে রয়েছে।

মথুরামোহন ইঁদারার ভেতর ঝুঁকে জল দেখার চেষ্টা করলেন। বালতিটা যেন অনন্তকাল ধরে নেমে চলেছে। এইসময় তিনি হঠাৎ একটা দুর্গন্ধ টের পেলেন। ইঁদারার ওপরে অবশ্য খানিকটা জায়গা ফাঁকা এবং আকাশ দেখা যাচ্ছে। তাই ইঁদারার তলায় মলিন কাচের মতো মসৃণ অর্ধবৃত্তাকার বস্তুটি যে জল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুর্গন্ধটা কি জল থেকেই ভেসে আসছে? মথুরামোহন বিরক্ত হলেন। মন্দিরের একজন সেবায়েত আছেন। পাশের একটা গ্রামে তাঁর বাড়ি। এই মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি তিনিই ভোগদখল করেন। তাঁর কি উচিত নয় ইঁদারাটা পরিষ্কার রাখা? বিশেষ করে আজ বৈশাখী পূর্ণিমার দিনটা অনেক ভক্ত আসে এখানে। আগের মতো ভিড় হয় না বটে, ধুমধামও কিছু হয় না—কালক্রমে যেন মা করালীর মাহাত্ম্য লোপ পেয়েছে, তাহলেও এরকম অব্যবস্থার কারণ কী?

বালতিকে জলস্পর্শ না করিয়ে মথুরামোহন এদিক-ওদিক তাকিয়ে

সেবায়েতকে খুঁজলেন। শুনেছেন, বিশেষ তিথির দিনটা ছাড়া সেবায়েত সন্ধ্যার আগেই বাড়ি চলে যান, ফেরেন প্রত্যূষে। আজ বিশেষ তিথি। অথচ মন্দির সংলগ্ন ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। ভারি আশ্চর্য তো!

মথুরামোহন মন্দিরের দিকে তাকালেন। মন্দিরের দরজা যথারীতি খোলা রয়েছে। মন্দিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। কতকাল সংস্কার করা হয়নি। চূড়ার ত্রিশূল হেলে রয়েছে। ফাটলে আগাছা গজিয়েছে। সামনের দেয়ালে জায়গায়-জায়গায় পলেস্তারা, বাকি সবটাই নোনাধরা ইটের থাক। দরজার সামনে উঁচু চত্বরটার অবস্থাও করুণ। তবে পরিষ্কার করার চিহ্ন রয়েছে। নিচের প্রাঙ্গণটাও পরিচ্ছন্ন। একদিকে শুকনো পাতা জড়ো করা আছে। মথুরামোহন মন্দিরের গর্ভবাসিনী দেবীর উদ্দেশে মনে মনে বললেন, 'ক্ষমা করো মা।'

কনক এগিয়ে এসে ইঁদারার ধারে পাথরের চত্বরে বসে ফের বলল, 'জল খাব, বাবা।'

মথুরামোহন উদ্বিগ্ন মুখে ইঁদারার ভেতর আবার ঝুঁকলেন। বালতিটা ছেড়ে দিলেন। দূরে গভীরে একটা শব্দ হল। যেন অন্য কোনো জগতের স্পন্দন ধ্বনিত হল। কিন্তু কী দুর্গন্ধ! মথুরামোহন ক্ষুণ্ণমনে মুখ তুলে মেয়ের উদ্দেশে বললেন, 'তাই তো কনক! বড় বিপদে পড়া গেল দেখছি।'

কনক অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল, 'কেন বাবা? কী হয়েছে?'

'ইঁদারার জলটা বেজায় দুর্গন্ধ।'

বুদ্ধিমতী কনক একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'গাছের পাতা পড়েছে। সেই পচা পাতার গন্ধ।'

'না মা। খুব বিচ্ছিরি গন্ধটা। মনে হচ্ছে—' থেমে গেলেন মথুরামোহন। কথাটা বলতে বাধল। তিনি বলতে চাইলেন, জীবজন্তুর মড়ার পচা গন্ধের মতো কতকটা।

কনক শিশুর মতো জেদ করে বলল, 'হোক। ওই জলই খাব। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে যে।'

মথুরামোহন বিব্রত বোধ করলেন। তারও তেষ্টা পেয়েছে। মন্দিরে পৌঁছে জল খাবেন ভেবে বসন্তপুর হাটে জল খাননি। কনকও খেতে চায় নি। ভুল হয়ে গেছে। মথুরামোহন আবার এদিক-ওদিক মুখ ঘুরিয়ে একটা কিছু হাতড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ মাথায় এল, সেবায়েতের ঘরে জল থাকা সম্ভব। জলের অভাবে কষ্ট হচ্ছে বলে তো মড়াপচা জল খাওয়া যায় না! নিশ্চয় ইঁদারার ভেতর কাঠবেড়ালী হোক, কিংবা এই জঙ্গলের কোনো প্রাণী হোক, দৈবাৎ পড়ে গিয়ে মারা গেছে।

মথুরামোহন দড়িটা ইঁদারার মুখে লোহার আংটায় বেঁধে রেখে সেবায়েতের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কনক অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে বাবা! কোথায় চললে হঠাৎ?'

মথুরামোহন যেতে যেতে বললেন, 'আসছি।' তারপর সেবায়েতের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন, দরজাটা ঠেকা দেওয়া আছে। তাহলে কি সেবায়েত নেশার ঘোরে সন্ধ্যা অব্দি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন? মথুরামোহন বিনীতভাবে একটু কেসে ডাকলেন, 'ঠাকুর মশাই আছেন নাকি? ঠাকুর মশাই!'

কোনো সাড়া এল না। বনভূমির অভ্যন্তরে ততক্ষণে আবছা আঁধার ঘনিয়েছে। পা বাড়িয়ে দরজায় টোকা দিতে গিয়ে সেই অস্পষ্ট আলোতে পায়ের সামনে কালো কয়েকটা ছোপ দেখতে পেলেন মথুরামোহন। বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় জেগে উঠল যেন। এগুলো কি রক্ত? কিসের রক্ত?

হেঁট হয়ে ঝুঁকে দেখে মথুরামোহন স্থির জানলেন, রক্তই বটে। তাঁর সারা শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু তিনি মরীয়া হয়ে দরজা জোরে ঠেলে দিলেন। ঘরের ভেতরটা আঁধার হয়ে আছে। স্খলিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন মথুরামোহন, 'ঠাকুর মশাই! ঠাকুরমশাই!'

কোনো সাড়া এল না। তখন মথুরামোহন ছুটে গেলেন কনকের কাছে। করালীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করতে হবে বলে পুঁটুলির ভেতর যথেষ্ট চিঁড়ে গুড় এবং একখানা ছোট সতরঞ্জি এনেছেন। একটা ঘটি আর বেঁটে চৌকোনো কাচের লণ্ঠনও এনেছেন। লণ্ঠনে দুর্মূল্য কেরোসিন ভরা রয়েছে। সেরেস্তার নায়েব মশাইয়ের সম্পত্তি এটি। অনুগ্রহ করে দিয়েছেন সজ্জন সেরেস্তাদারকে। সে-আমলে কেরোসিন দামের জন্য নয়, বিলাসিতার জিনিস হিসেবেই গণ্য হত পাড়াগাঁয়ে। অধিকাংশ বাড়িতেই রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলত। কদাচিৎ কোনো-কোনো বাড়িতে কেরোসিনের কুপি বা লণ্ঠন। আসলে গ্রামের মানুষ বড় বেশি ঐতিহ্য অনুগত। প্রথা ভাঙতে চায় না সহজে। তাছাড়া সাধারণভাবে সৌখিনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন নিন্দার বাঁকা দৃষ্টিও পড়ত। মথুরামোহন ঐতিহ্য-অনুগত সাধারণ গেরস্থহিসেবেই জীবনযাপন করতেন। এমন কী দেশলাই কাঠিও কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। চকমকি-পাথর আর একটুকরো শোলা ছিল তাঁর প্রিয় জিনিস। মাঝে মাঝে হুঁকো এবং বিড়ি টানার নেশা ছিল। তাই চকমকি সঙ্গে রাখতেন। একটা কৌটোর ভেতর যত্ন করেই রাখতেন।

কনকের প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে ব্যস্তভাবে তিনি চকমকি ঠুকে শোলাটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর শুকনো নারকোল ছোবড়ার গুটি বের করে

ফুঁ দিয়ে ধরালেন। গোলাটা নিভিয়ে রেখে ফুঁ দিতে থাকলেন ছোবড়ার গুটিতে। সেই সঙ্গে কনককে ফরমাস করলেন, 'ঝটপট ওই পাতাগুলো কুড়িয়ে দে তো মা!'

কনক যেখানে বসে ছিল, সেখানে ইঁদারার চত্বরের নিচের খাঁজে শুকনো পাতা বাতাসের টানে উড়ে এসে জমে আছে প্রচুর। কনক ভাবল, বাবা ঠিকই করছেন। লণ্ঠন জ্বালার সময় হয়েছে। সে পাতাগুলো হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে সামনে রাখল। তখন মথুরামোহন জ্বলন্ত ছোবড়ার গুটিটা পাতাগুলোর তলায় রেখে ফুঁ দিতে শুরু করলেন। একটু পরেই পাতাগুলো জ্বলে উঠল।

এইভাবে অনেক পরিশ্রমে যখন লণ্ঠনটা ধরেছে, তখন গাছপালার আড়ালে পূর্ণ চাঁদও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গাছের ছাউনির ফাঁকে চাঁদটাকে দেখতে পেয়ে কনক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আনমনা হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। গ্রাম্য বালিকাদের এই স্বভাব। সে তেষ্টার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গেল।

মথুরামোহন ততক্ষণে সেবায়েতের ঘরের ভেতর উঁকি মেরে আবার থরথর করে কাঁপছেন। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা খাটিয়া, আলনায় একটা গামছা আর ফতুয়া ঝুলছে। খাটিয়া এবং মেঝেয় চাপ-চাপ কালছে রক্ত।

সবচেয়ে ভয়ংকর লাগল মথুরামোহনের, জলের কুঁজোটা উল্টে পড়ে রয়েছে।

দৃষ্টি আরও স্বচ্ছ হলে এবার লক্ষ্য করলেন, একটা কোনা খুঁড়ে চূণসুরকি আর মাটির চাবড়া স্তূপ করে রেখেছে কারা।

মুহূর্তে বুঝলেন মথুরামোহন, গোপন ধনসম্পদের লোভেই ডাকাতরা সম্ভবত সেবায়েতকে খুন করে ইঁদারার ভেতর ফেলে দিয়েছে।

কনকের বুঝি গা ছমছম করছিল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মৃদু হলুদ জ্যোৎস্না মন্দিরপ্রাঙ্গণকে চিত্রিত করেছে। সে অস্বস্তিতে বাবাকে ডাকছিল। সেই ডাকে মথুরামোহনের সম্বিৎ ফিরল এতক্ষণে তিনি অনুমান করতে পারছেন, আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কেন করালীর মন্দির এমন জনশূন্য। যারা পুজো দিতে এসেছিল, সম্ভবত এ ঘটনা চাক্ষুষ করে তারা তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করেছে।

মথুরামোহন ভারি পায়ে মেয়ের কাছে ফিরে এসে শুধু বললেন 'জল নেই।' কনক ভয় পাবে বলে অন্যকথা গোপন রাখলেন।

কিন্তু কাছে জল না থাকলে মানুষের তৃষ্ণা বেড়ে যায় আরও। কনক বারবার অস্ফুটস্বরে জল শব্দ উচ্চারণ করতে থাকল। আর মথুরামোহনেরও ওই ভীষণ দৃশ্য দেখে কণ্ঠতালু আরও শুষ্ক হয়েছে। শরীর প্রায় বিধ্বস্ত। মাথা ঘুরছে। এ অবস্থায় কনককে কাঁধে তুলে দুক্রোশ পথ হেঁটে বসন্তপুর হল্টে পৌঁছানোর

কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। হঠাৎ মথুরামোহনের মনে পড়ে গেল, পুজো দেবার আগে ভক্তরা করালীর দহে নাকি স্নান করে আসে। এই মন্দিরের দেবীমাহাত্ম্য যাদের কাছে শুনেছিলেন, তারাই বলেছিল একথা।

মথুরামোহন বললেন, 'মা কনক! শুনেছি নদীতে কোথাও একটা দহ আছে। সেখানে জল থাকা স্বাভাবিক। চল্, আমরা সেটা খুঁজে দেখি।'

কনক বলল, 'ঘটি নিয়ে তুমি যাও বরং। আমি এখানে থাকছি।'

'সে কী! এখানে একা থাকতে তোর ভয় করবে না তো মা?'

কনক বলল, 'না। আমাকে কি কখনও ভয় পেতে দেখেছ?'

সেকথা ঠিক। মথুরামোহন তবু ইতস্তত করছিলেন। কনককে কিছু না জানিয়ে এই ভয়ংকর নির্জন স্থানে একা রেখে যাওয়া কি ঠিক হবে? কিন্তু কনকের তাগিদে শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ঠন ওর কাছে রেখে ঘটি নিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় সাবধান করে গেলেন, যদি সে ভয় পায়, যেন বাবাকে চিৎকার করে ডাকে।

জনহীন বনভূমি পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। নদীতে পৌঁছে প্রথমে মথুরামোহন গেলেন কিছুদূর উত্তরে। কিন্তু সর্বত্র বালির চড়া জ্যোৎস্নায় ধু ধু করছে। তখন ফিরলেন দক্ষিণে। বেশ কিছুদূর চলার পর বনভূমির অন্যপ্রান্তে ছোট একটা দহ সত্যি দেখতে পেলেন। দহের জলও প্রায় শুকিয়ে এসেছে। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে জলপান করলেন মথুরামোহন। কাঁধে মুখে জল ছেটালেন। তারপর আরও একটু এগিয়ে ঘটি ডুবিয়ে জল নিলেন।

শরীরের ক্লান্তি দূর হবার ফলে আতংকটাও অনেক হ্রাস পেল। সাহস এল মনে। বিড়বিড় করে মা করালীর নাম উচ্চারণ করতে করতে পাড়ে উঠলেন মথুরামোহন। বনের ভেতর দিয়ে মন্দির অনুমান করে দ্রুত হাঁটতে থাকলেন।

একটু পরে মন্দির দেখতে পেলেন। তখন কনককে আশ্বস্ত করার জন্য মথুরামোহন গলা চড়িয়ে বললেন, 'পেয়েছি মা! যাচ্ছি। তুমি ভয় কোরো না।'

গাছের ফাঁকে স্থানে-স্থানে যথেষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তার ফলে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব কিছু। শুধু কোথাও কোথাও লতাগুল্মের স্তূপ কালো হয়ে আছে। সেই ভাঙা তোরণের সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন মথুরামোহন। লণ্ঠন দেখা যাচ্ছে না কেন? ডাকলেন, 'কনক! কনক!'

কিন্তু কোনো সাড়া এল না। কনক কি তাহলে মন্দিরে মাকে প্রণাম করতে ঢুকেছে? মথুরামোহন ব্যস্তভাবে মন্দিরের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু মন্দির অন্ধকার। ফের ডাকলেন, 'কনক! কনক! তুই কোথায় গেলি?'

নির্জন মন্দির, বন এবং জ্যোৎস্না প্রৌঢ় পিতার ব্যাকুল চিৎকারে কেঁপে-কেঁপে উঠতে থাকল। তবু কোনো সাড়া এল না। মথুরামোহন উন্মাদের মতন প্রাঙ্গণে একবার এদিকে একবার সেদিকে ছোটাছুটি করে বেড়ালেন। ইঁদারার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে আর্তনাদ করে ডাকলেন. 'কনক! কনকলতা!' পুরোহিতের প্রেতাত্মা যেন গভীর, দুর্গন্ধ, কালো জলের ভেতর থেকে প্রতিধ্বনিতে সাড়া দিল, 'কনকলতা!' কনকলতা!'

কনককে কি তাহলে বাঘে ধরে নিয়ে গেছে? অসহায় মথুরামোহন বিভ্রান্ত পদক্ষেপে প্রাঙ্গণে নেমে আসতেই তাঁর পায়ে লণ্ঠনটা ঠেকল। লণ্ঠনের কাচ চূর্ণ। কেরোসিনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তার পাশেই তাঁর বৃহৎ পোটলাটি পড়ে রয়েছে।

মথুরামোহনের হাত থেকে এতক্ষণে জলপূর্ণ ঘটি সশব্দে পড়ে গেল। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই উন্মূল গাছের মতো আছাড় পড়লেন প্রৌঢ় সেরেস্তাদার। 'মা করালী! এ তুমি কী করলে? এই উদ্দেশ্যেই তুমি কি আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলে রাক্ষুসী?'

১৩২২ সালের বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে জনহীন দেবীকরালীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে বলিপ্রদত্ত প্রাণীর মতো ধড়ফড় করতে থাকলেন বাঁকা-শ্রীরামপুরের হতভাগ্য মানুষ মথুরামোহন সেরেস্তাদার।

ভাইবোন

বাংলার শীত বড় মধুর। মানুষের জীবনের মূল তিনটে ব্যাপার আহার-নিদ্রা-মৈথুনের কথা ভাবলে বাংলার শীতের মতো রোমাঞ্চকর ও উদ্দীপনাময় আর কোনো ঋতু দেখা যায় না। সতেজ টাটকা সব্জির এত বেশি আমদানি আর কোনো সময় চোখে পড়বে না। মাছ-মাংসেরও স্বাদ যেন এ সময়টাতে সুমিষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে প্রধান শস্য ধান এসময়ই উৎপন্ন হয়। তার ফলে লোকের হাতে টাকা আসে। রাতের বেলা লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমের আরামটাও কি কম? তাছাড়া অন্যান্য প্রাণীর যেমন একটা করে মৈথুনঋতু থাকে, মানুষের বেলায় সম্ভবত এর অন্যথা নেই। মানুষ এবং মানুষীর এই শীতে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা কামনা খুবই স্বাভাবিক। কথায় বলে না মাঘ মাসে যার মাগ নেই সে যাক না শ্মশানঘাটে?

রতু ডাক্তার শতদ্রুকে এসব তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। রতুবাবু সুরসিক মানুষ। শতদ্রুকে সম্পর্কে নাতি বিবেচনা করেন। বলেছিলেন, 'ভায়া! মেমসায়েবদের দেশ থেকে যখন একা ফিরতে পেরেছ, তখন বোঝা যাচ্ছে, তুমি খাঁটি সাত্ত্বিক ভারতীয়। অতএব ভারত-ঐতিহ্যমতে ঝটপট একটি স্ত্রী-সংগ্রহ করো। আমার সন্ধানে এ বস্তুটির অভাব নেই।'

বিকেলে শতদ্রু হাইওয়েতে বেড়াতে বেরিয়ে রতুডাক্তারের রসিকতা মনে পড়ায় হঠাৎ খুক খুক করে হেসে ফেলল।

তার বোন বিপাশা বলল, 'কীরে দাদা?'

শতদ্রু বলল, 'কিছু না! আচ্ছা বিয়াস, কাল সন্ধ্যায় তোর ঘরে একটি মেয়েকে দেখছিলুম, সে কে রে?'

বিপাশা শতদ্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'ওকে তোর চোখে ধরেছে বুঝি?'

'ভ্যাট! চোখে ধরেছে কী বলছিস?' শতদ্রু সংকোচের সঙ্গে হাসল। 'চোখে পড়েছে বলতে পারিস!'

ওই একই কথা।' বিপাশা কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল। 'ওর নাম রঙ্গনা। তুই যখন স্টেটসে গেলি তখন ও এ্যাত্তোটুকুন ছিল। তাই লক্ষ্য করিস নি। রঙ্গনার দিদি অপরূপা আমার ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল। রঙ্গনার সঙ্গে আমার বয়সের কত তফাত।'

'কত ?'

'পাঁচের কম হবে না।' বিপাশা প্রশ্ন করল। 'কিন্তু কেন ওর কথা জিগ্যেস করছিস ?'

'এমনি। চেনা লাগছিল যেন।' শতদ্রু চুপচাপ হাল্কা পায়ে হাঁটতে থাকল। সে টের পেয়েছিল, বিপাশা রঙ্গনা সম্পর্কে কী এক বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইছে। আসলে এমনটা তার পক্ষে হয়তো স্বাভাবিক। দুমাসের লম্বা ছুটিতে শতদ্রু দেশে এসেছে। এই সুযোগে বাবা-মা তার জন্য ঝটপট একটা পাত্রী যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। কলকাতার ইংরিজি কাগজে ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছে। আত্মীয় স্বজনকে চিঠি লিখেও তৎপর করা হয়েছে। শতদ্রুর এতে আপত্তি নেই অবশ্য। মার্চে ফেরার সময় একজন সঙ্গিনী থাকা মন্দ হবে না। অন্তত একাকিত্ব তো দূর হবেই।

এই অবস্থায় বুঝি বিপাশা চাইছেনা, দাদা যাকে-তাকে হুট করে জুটিয়ে নিক। শতদ্রু মনে মনে হাসতে লাগল। কিন্তু রঙ্গনা নামটা এতক্ষণে তার বেশ মনে পড়ে গেছে। মানুষের জীবনে কেন যেন কোনো একটা দৃশ্য বহুদিন নিখুঁতভাবে স্মৃতিতে থেকে যায়।

কতবছর আগে, ঠিক মনে পড়ছেনা। এই বসন্তপুর স্কুলে (তখনও কলেজ হয় নি) কী একটা অনুষ্ঠান ছিল। শতদ্রু স্টেজের পেছনে ফ্রকপরা একটা মেয়েকে একান্তে একটা চেয়ারে বসে তন্ময়ভাবে বই পড়তে দেখেছিল। ওখানে একটা মিটমিটে বাল্ব জ্বলছিল মাথার ওপর। মেয়েটির বয়স তখন কত আর হবে? এগারো-বারোর বেশি নিশ্চয় ছিল না। স্টেজে তখন গান কিংবা নাচ চলছে। এখানে অমন করে কী বই পড়ছে মেয়েটি ? শতদ্রু অবাক হয়েছিল। শুধু অবাক নয়, খুব ভালও লেগেছিল। মিষ্ট চেহারার মেয়ে, তার মুখের দুপাশে চুল এসে পড়েছে। আলতো হাতের আঙুলে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চোখ তুলতেই চোখ পড়েছিল শতদ্রুর চোখে। মুখে কিন্তু হাসি বা লজ্জা কিছুই ছিল না। কেমন যেন উদাসীন চাহনি ! ফের সে বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়েছিল। শতদ্রুর শুধু এটুকুই মনে আছে, কেউ তাকে রঙ্গনা বলে ডাকছিল। তখন সে বলেছিল, 'যাই !' তারপর এতবছর ধরে হঠাৎ কখনও-কখনও দৃশ্যটা তার মনে পড়েছে। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এত অদ্ভুত আবেগময় অনুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়েছে। একটা স্বপ্নের মতো ঘটনা যেন। অথচ সে বুঝতে পারে না কেন ওই কিশোরীকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। নাকি রঙ্গনা নামটাই এর মূলে ?

এ ঘটনা তার একান্ত ব্যক্তিগত। তাই কাকেও জিগ্যেস করেনি শতদ্রু,

কিশোরীটি কোথায় থাকে এবং কী তার পরিচয়। এতকাল পরে তাকে ফের দেখে সে মনে মনে খুব বিচলিত হলেও মুখ ফুটে বিপাশাকে জিগ্যেস করতে বেধেছিল।

এতক্ষণে জনপদের বাইরে এসে রতুডাক্তারের রসিকতা প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে হয়েছে, বিপাশাকে জিগ্যেস করলে এমন কিছু মহভারত অশুদ্ধ হবে না।

শতদ্রুর কাছে এখানকার শীত শীতই নয়। সে একটা চকরা-বকরা উজ্জ্বল রঙের গুরু পানজাবি, তার ওপর হাতাকাটা ভেলভেটের জ্যাকেট চড়িয়েছে। পরনে চুস্ত-ছাঁটের পাজামা। আসার সময় নিউইয়র্কে ব্রডওয়েতে ফুটপাতে সাজানো খ্রিসমাস সেলের পোশাকের স্তূপ হাতড়ে সস্তায় এগুলো কিনেছিল। সবসুদ্ধ মোটে ডলার চারেক দাম। সে থাকে ইলিনয় স্টেটের আরবানা শহরে। এসব বিচিত্র পণ্য সেখানে মেলে না।

বিপাশার সাজগোজের স্বভাব নয়। হালকা সোনালী রঙের তাঁতের শাড়ির ওপর সে একটা ধুসর কার্ডিগান চাপিয়েছে। কথাবার্তা ও আচরণে সে একটু ধারালো, কিন্তু তার চেহারায় আবছা ধরণের বিষন্নতা আছে—সেটা তার চোখের তলায় এবং কপালের কয়েকটা সূক্ষ্ম ভাঁজে চোখ না পড়ে পারে না। শতদ্রু বিদেশে থাকার সময়ই জানতে পেরেছিল, হঠাৎ এক ঝড়বৃষ্টির সন্ধ্যায় চিলেকোঠায় ওঠার সিঁড়িতে কিছু দেখে প্রচণ্ড ভয় পেয়ে বিপাশা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে তাকে একটা ভয়-পাওয়া রোগে ধরেছে।

তাদের বাড়িটা খুব পুরনো। ঠাকুরদারও ঠাকুরদার আমলে নাকি তৈরি। তবে পুরুষপরম্পরা সংস্কার করা হয়েছে। গায়ে অনেকগুলো ঘরও পরবর্তীকালে যুক্ত করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বাড়িটা আয়তনে বিশাল হয়ে গেছে। সামনে পেছনে পাঁচিলঘেরা প্রচুর ফাঁকা জায়গায় ফুল ফলের বাগান আছে। তারা বনেদী পরিবারের লোক। ঠাকুরদা অমরনাথ ছিলেন মাঝারি ধরনের জমিদার। অমরনাথের ছেলে বৃষ্ণনাথ জমিদারী উচ্ছেদের পর কণ্ট্রাকটারি করতেন। প্রচুর টাকাকড়ি কামিয়ে এখন অবসর নিচ্ছেন। বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। বসন্তপুর এলাকায় কেষ্ট কণ্ট্রাকটার নামে সবাই চেনে তাঁকে।

বিপাশা গাড়ি করে বেরুতে চেয়েছিল। কিন্তু শতদ্রুর তাতে ভীষণ আপত্তি। সে গাড়ির দেশ আমেরিকা থেকে এসেছে। পায়ে হেঁটে ঘুরতেই তার ভাল লাগছে। পাঁচবছর বিদেশে থাকার পর বসন্তপুরকে হাস্তবর রকমের নোংরা দেখালেও প্রাণ গেলে সে তা বলছে না। বরং ভাল লাগাবার চেষ্টা করছে মনে-মনে। আশ্চর্য, একবার সিউক্সে একটা মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় বসন্তপুরের এই উত্তরের মাঠটার কথা মনে পড়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল।

তবে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমটি আর নেই বসন্তপুর। সামান্য পাঁচটা বছরেই কী প্রচণ্ড বদলে গেছে। স্টেশনে ওভারব্রিজ হয়েছে। প্ল্যাটফর্মগুলো উঁচু হয়েছে। তেমনি ভিড়ও বেড়েছে। তার চোখের সামনেই ছেলেবেলার সমৃদ্ধ গ্রামকে সে শহরে রূপান্তরিত হতে দেখেছিল। এখন বসন্তপুর আরও যেন জটিল হয়েছে। বাস লরি টেম্পো রিকসা ট্যাকসি প্রাইভেটকার গিজ গিজ করছে!

এই হাইওয়ে স্টেশনের একটু তফাত দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে সোজা পূর্বে এগিয়ে গেছে। রেললাইন পেরিয়ে হাইওয়ে কয়েক পা এগোতেই কে ডাকল 'বিয়াস! বিয়াস!'

অমরনাথই নাতি-নাতনির নাম রেখেছিলেন শতদ্রু এবং বিপাশা। উনি রসিকতা করে এদের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'সাটলেজ' এবং 'বিয়াস' নামে ডাকতেন। তার ফলে বসন্তপুরে সাটলেজ এবং বিয়াস নামেই ছোটবেলায় সবাই ডাকত ওদের।

বিপাশা ঘুরে দেখে বলল, 'দাদা! এই সেরেছে রে! অপরূপা আসছে।'

শতদ্রু বলল, 'রঙ্গনার দিদি?'

বিপাশা মাথা নাড়ল। স্টেশনের দিক থেকে লাইনের ধারে-ধারে সাবধানে কাপড় গুটিয়ে অপরূপা আসছিল। বিপাশা হাসিমুখে বলল, 'তুই কি ট্রেনে এলি? কোন ট্রেনে? যাঃ বাবা! কোনো ট্রেন তো দেখলুম না।'

অপরূপা সে-কথার জবাব না দিয়ে নমস্কার করল শতদ্রুকে। 'আপনি এসেছেন খবর পেয়েছি। দেখা করতে যাওয়ায় সময় পাইনি।' তারপর বিপাশার দিকে ঘুরে বলল, 'এসেছি তো অনেকক্ষণ। একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথায় কথায় দেরি। তোরা বেড়াতে বেরিয়েছিস?'

বিপাশা হাসিমুখে মাথাটা দোলাল।

শতদ্রু বলল, 'ইচ্ছে করে তো আপনিও আসতে পারেন। খুব চমৎকার আবহাওয়া।'

অপরূপা বলল, 'ইচ্ছে নিশ্চয় করছে। কিন্তু উপায় নেই। ঠাকমা একলা আছে। রঙ্গনা যা মেয়ে!'

বিপাশা বলল, 'তুই গিয়েছিলি কোথায় রে?'

'কলকাতা।' বলে অপরূপা একটু চোখ নাচাল। 'জব্বর একটা ইন্টারভিউ দিয়ে এলুম জানিস?'

'তাই বুঝি? কিসে?'

'একটা বড় প্রাইভেট কোমপানি।' অপরূপা ফের শতদ্রুর দিকে তাকাল। 'আপনি একেবারে কিন্তু সায়েব হয়ে গেছেন। চেনা যাচ্ছে না।

বিপাশা বলল, 'তাহলে আয় তুই। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

অপরূপা চলে গেলে শতদ্রু বলল, 'তোর বন্ধুটিকে কি আমি চিনি? মনে পড়ছে না তো!'

বিপাশা বলল, 'দেখেছিস। মনে থাকার কথা না।'

শতদ্রুর কৈশোর থেকেই কলকাতায় কেটেছে। বাড়ি এসেছে বছরে দু'এক বার মাত্র। বসন্তপুর তার বরাবর অপছন্দ ছিল। বাবা-মায়ের তাগিদে বাড়ি আসত বটে, ঝটপট কেটে পড়ত। কৃষ্ণনাথ বলতেন, 'ওর মামী ওকে তুক করেছে।'

চওড়া কংক্রিটে ঢাকা রাস্তার দুধারে আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ। দূরে কোথাও আবছা হলুদ আর সবুজ রঙের ছোপ। সামনে অনেকটা দূরে একখানে সাদা ব্রিজের ওপর শেষ বেলার নরম রোদ পড়েছে। তার পেছনে কালচে এবং ধূসর একটা টিলার মতো জিনিস দেখিয়ে শতদ্রু বলল, 'ওটা কি কোনো গ্রাম?'

'কোনটা?'

'ওই যে—ওখানে।'

বিপাশা দেখতে-দেখতে বলল, 'ও। এটা করালীর মন্দির। লোকে বলে, মা করালীর ভিটে।'

'ওখানে গেলে মন্দ হত না রে!'

বিপাশা ব্যস্তভাবে বলল, 'তোর মাথাখারাপ? পাকা ছ কিলোমিটার ডিসট্যান্স। তাছাড়া ওখানে গিয়ে কী দেখবি? জঙ্গলে ভর্তি।'

বিপাশা করালীর মন্দিরের কথা বলতে থাকল। মন্দিরের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বটগাছ গজিয়ে সবটাই ঢেকে ফেলেছে। এপাশে-ওপাশে ইটের স্তূপ ছিল প্রচুর। আশেপাশের গ্রামের মুসলমানরা সব নিয়ে গেছে। ওরা তো ঠাকুরদেবতা মানে না। তবে এই রাস্তাটা করার সময় খুব গণ্ডগোল হয়েছিল। মন্দিরের প্রায় ওপর দিয়ে রাস্তার নকসা করেছিল কোন ইনজিনিয়ার। সে মুখে রক্ত উঠে মারা গড়ে। পরে নকসা বদলানো হল। কিন্তু কেউ মাটি কোপাতে চায় না। বলে, 'মা করালীর ভিটেয় কোপ বসাতে পারব না।' এসব কাণ্ডের পর রাস্তা জঙ্গলের পাশ দিয়ে ঘোরানো হল। জঙ্গলটা থেকে গেল। ওখানে কেউ গাছের ডাল পর্যন্ত কাটতে সাহস করে না। তবে মুসলমানদের কথা আলাদা।

শুনে শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'তুই বুঝি এসব বিশ্বাস করিস বিয়াস?'

'কী সব?'

'ওই যে বললি মুখে রক্ত উঠে কে মরেছিল।'

বিপাশা কথার জবাব না দিয়ে মুখে একটা হু হু শব্দ করে বলল, 'এই। আর না। বড্ড শীত করছে। কী বিচ্ছিরি হাওয়া এখানে।'

শতদ্রু ঘুরে বলল, 'ইলিনয় স্টেট একটু উত্তরঘেঁষে তো। তাই সেপ্টেম্বরেই কোনো-কোনো দিন বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা পড়ে। তবে এই ওয়েদারকে তুই ঠাণ্ডা বলছিস? আমেরিকানরা যেদিন আকাশে মুখ তুলে 'আ! ফাইন! ভেরি প্লেজান্ট ওয়েদার' বলে ওঠে, তখন আমার বুক কেঁপে ওঠে।'

বিপাশা আনমনে বলল, 'কেন?'

'টের পাই, সেদিন ইণ্ডিয়ানদের পক্ষে জঘন্য আবহাওয়া।' শতদ্রু হাঁটতে হাঁটতে বলল। 'একে তুই শীত বলছিস—আই মিন, ঠাণ্ডা? প্রকৃত শীত বা ঠাণ্ডা কাকে বলে কল্পনা করতে পারবিনে। নাকে গালে কামড়ে যেন মাংস তুলে নিচ্ছে মনে হবে।'

'ডিপফ্রিজের ভেতরকার মতো?'

শতদ্রু হো হো করে হাসল। 'থাক। তোকে বোঝাতে পারব না। বরং গেলে হাতেনাতে প্রমাণ পাবি।'

বিপাশা বলল, 'আমি যাব? যাচ্ছি। ইস্!'

'কেন? সায়েবদের দেশ দেখতে ইচ্ছে করে না?'

বিপাশা কিছু বলল না। চুপচাপ হাটতে থাকল। শতদ্রুর মনে হল, পাঁচ-বছর আগের বিপাশার সঙ্গে এ বিপাশার কোনো মিল নেই। বড় খামখেয়ালী দেখাচ্ছে ওকে। রেলফটকের কাছে এসে ওরা দাঁড়াল। একটা মালগাড়ি আসছে। মাল গাড়িটা চলে গেলে শতদ্রু বলল, 'তোর ওই বন্ধু—অপরূপাদের বাড়ি কোনটা রে?'

মালগাড়ির শব্দের জন্য স্পষ্ট শুনতে পেল না বিপাশা। ফটক পেরিয়ে গিয়ে বলল, 'কী বলছিলি যেন?'

'কিছু না।'

বিপাশা হাসল। 'অপরূপার কথা জিগ্যেস করছিলি। একটা কথা বলি শোন। ওদের ফ্যামিলিটা মোটেও ভাল না। এখানে কেউ ওদের সঙ্গে গা মাখা-মাখি করতে চায় না। অপরূপা নেহাত গায়ে পড়ে মেশে। তাই একটু পাত্তা দিই। তবে রঙ্গনাটা ভাল।

'তাহলে খারাপ কে?'

'অপরূপার দাদাকে তুই দেখেছিস নিশ্চয়। তার নাম অনির্বাণ। অনি বলে ডাকে সবাই।'

'ওয়েল। তারপর?'

বিপাশা বলল, 'অনি ফেরারী আসামী। অনেকদিন হল লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কেন?'

'শুনেছি কোথায় খুনটুন, নাকি ডাকাতি করেছিল।'

শতদ্রু বলল, 'বাড়ির একটা ছেলে অমন হতেই পারে। ধর, আমি যদি…'

কথা কেড়ে বিপাশা বলল, 'তুই বা আমি এমন হব না। ওটা বংশের দোষ। রক্তে থাকে।'

'মানলুম। কিন্তু ওর বাবাও কি তাই ছিলেন নাকি?'

বিপাশা জোরে মাথাটা দোলাল। 'না। ওর বাবা সোনাবাবুর গদিতে কাজ করতেন। কিন্তু অনিদার ঠাকুরদা…' বলে সে শতদ্রুর মুখের দিকে তাকাল। 'তুই কী ছেলেরে! মনে পড়ছে না—ওই কালুবাবু আসছে বললেই তুই ঘরে গিয়ে লুকোতিস?'

শতদ্রু বলল, 'তাই বুঝি? আমার কিছু মনে থাকে না।'

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল, 'সায়েবরা তোর ব্রেনওয়াশ করে দিয়েছে।'

শতদ্রু মাথার বড়-বড় চুল আঁকড়ে বলল, 'যা বলেছিস!'

'কালুবাবু নাকি সংঘাতিক ডাকাত ছিল। পুলিশের গুলিতে মারা যায়।'

শতদ্রু বোনকে পরিহাসের ছলে বলল, 'আর তুই তা দেখেছিলি বুঝি?'

একথার জবাবে বিপাশা কেন যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। আস্তে বলল, 'না। শুনেছি। তুইও শুনে থাকবি—মনে নেই।'

'তোর কি শরীর খারাপ করছে?'

'হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল।'

বিপাশাকে দাঁড়াতে দেখে শতদ্রু উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। মায়ের চিঠিতে শুনেছে, বিপাশার মাথা-ঘোরা অসুখ আছে। হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায়। শতদ্রু একটা সাইকেলরিকশো দাঁড় করাল। বিপাশা চোখ বুজে দাঁড়িয়ে ছিল। শতদ্রু তার হাত ধরে বলল, 'রিকশোয় ওঠ্। আমারই ভুল হয়েছিল।'

বিপাশা চোখ খুলে রুগ্ন হেসে দাদার সাহায্যে রিকশোয় উঠল।

কুড়ানি ঠাকরুনের জীবনকথা

শীতের দুপুরে রোদেভরা উঠোনে মাদুর পেতে বসে রঙ্গনা একটা রঙীন ইংরেজি পত্রিকা পড়ছিল। তার দিদি অপরূপা তাকে বলে বইপোকা। এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসও আছে রঙ্গনার। তাই তার আরও একটা নাম দিয়েছে পাড়াবেড়ানী। রঙ্গনার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। ছোটবেলা থেকেই খানিকটা আত্মভোলা মেয়ে সে।

ইংরেজি পত্রিকাটা সিঙ্গিবাড়ির ছেলে আমেরিকা থেকে এনেছে। রঙ্গনা তার বোনের কাছে সেটা দেখতে পেয়ে চেয়ে এনেছিল। বসন্তপুরে শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে রঙ্গনার মেধাবী বলে সুনাম ছিল। তার ইংরেজি জ্ঞানের খ্যাতি স্কুল থেকে। লাইব্রেরী হাতড়ে ইংরেজি বই নিয়ে যেত। সহ-পাঠিনীরা বলত ভড়ং। রঙ্গনার গ্রাহ্য ছিল না। দুঃখের বিষয়, স্থানীয় কো-এডুকেশানের কলেজে দুবছর পড়ার পর তাকে পড়া ছাড়তে হয়েছে। ভীষণ অর্থাভাব।

এমন মেয়েকে সাহায্য করতে অনেকেই রাজি ছিল। কলেজে ফ্রি-শিপেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার দাদা অনির্বাণের এক গোঁ। 'গরীব হতে পারি, ভিক্ষে নেব না কোনো শালার কাছে।' গোঁয়ার অর্ধশিক্ষিত অনির্বাণ ছোটবোনের পড়াশুনায় বাদ সেধেছিল। এদিকে রঙ্গনা তার দাদার ভীষণ ভক্ত।

অপরূপা ততদিনে বি. এ. পাশ করেছে। সে দাদাকে ভক্তি করে না, ভয় করে। সে জানে, দাদার নিজের পড়াশুনা হয় নি বলে বোনেদের শিক্ষায় বাদ সেধেছে বরাবর। তার আক্ষেপ, বাবা বেঁচে থাকলে রঙ্গনাকে কলেজ ছাড়তে হত না। বাবার মৃত্যুর পর স্বভাবত অনির্বাণ তাদের গার্জেন হয়ে উঠেছিল।

বাড়িটা বসন্তপুরের শেষ প্রান্তে মাঠের সীমানায় অবস্থিত। এদিকটায় এখনও সেকালের বসন্তপুর কিছুটা টিঁকে আছে। বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল, পচা ডোবা, শেয়ালের ডাক, গরুর হাম্বারব এই সব নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত সনাতন পাড়াগাঁ। অথচ একটুখানি পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই প্রশস্ত পীচের পথ, বাজার, বিদ্যুৎ, ভিড়, মোটরগাড়ি। এখানে এখনও সন্ধ্যায় লম্প জ্বলে। ভুতুড়ে অন্ধকারে শ্যাওড়াগাছে প্যাঁচা ডাকে। প্রেতিনীরা ডোবার ধারে জোনাকির আলো নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মধ্যরাতে হাড়ি-বাড়ির পিরিমল ওঝা ঘুম-ঘুম গলায় তার পোষা দুরন্ত প্রেতটিকে ধমক দিয়ে বলে, 'খুব হয়েছে! এবারে যা দিকিন!'

রঙ্গনাদের অবস্থা একসময় ভালই ছিল, তার প্রমাণ এখনও বাড়ির আনাচে কানাচে ছড়ানো রয়েছে। চারদিকঘেরা দালানবাড়ি কালক্রমে ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। কিছুটা অনির বাবা গৌরমোহন এবং পরে বাকিটা তাঁর ছেলে অনির্বাণ বেচে দিয়েছে। সেকালের ইট-কাঠের ওপর অনেক লোকের একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে। তবে ইটগুলো সত্যি মজবুত ছিল। শতরুর বাবা কৃষ্ণনাথ কন্ট্রাকটার অনিদের ওইসব ইট, লাইম-কংক্রিটের চাবড়া, সুরকি ইত্যাদি রাস্তায় ব্যবহার করেছেন। ব্লক অফিসের বহু কাজেও লাগিয়েছেন। বাড়ির সেই সব শূন্যতা ঢেকে ফেলেছেন স্নেহময়ী প্রকৃতি। চারপাশে আগাছা, টিবিজুড়ে ঘন জঙ্গল। মধ্যখানে একটা জীর্ণ একতলা দুটো ঘরের একটা বাড়ি টিঁকে আছে কোনক্রমে। তার ছাদ থেকে বর্ষায় জল চুইয়ে পড়ে। আশংকা হয়, কবে হঠাৎ ধসে পড়বে হয়তো।

তবু এবাড়িতে যেন কী একটা শ্রীও আছে। উঠোনটুকু সবসময় ঝকঝকে। প্রাচীন ইঁদারার জল এখনও সুপেয়। উঠোনের একপ্রান্তে সুন্দর শিম, লাউ, শশার মাচান। কয়েকটা পেঁপেগাছ। কিছু ফুলফলের গাছও ঋতুভেদে ফুলফল দান করে। সংকীর্ণ খিড়কির পথের দুধারে জবাফুলের ঝাড়। ডোবার ঘাটের মাথায় কয়েকটা কলাগাছ ফলভারে এখন প্রায় অবনত। সত্যি বলতে কী, এইসব ফুলফল ও আনাজপত্র এ সংসারে ক্ষুধার অন্ন যোগায় আজকাল। লোকেরা এসে কিনে নিয়ে যায়। রঙ্গনার ঠাকমা, কুড়ানি ঠাকরুন বলে যিনি পরিচিত, দরাদরি করে বেচেন। এসব তাঁরই হাতে লাগানো। এবয়সেও ওই খঞ্জ বৃদ্ধা বগলে ক্রাচ ভর করে ডোবা থেকে জল এনে সেচন করেন। তাঁর বাঁ পা-খানি হাঁটুর নিচে থেকে কাঠির মতো দেখতে এবং পায়ের পাতা দোমড়ানো।

শীতের দুপুরে স্নানাহার সেরে কুড়ানি ঠাকরুন ছোট্ট চাটাইয়ে বসে নাতনির দিকে তাকিয়ে ঝিমোচ্ছিলেন। হঠাৎ কী মনে হল, ঝিমুনি ভেঙে ডাকলেন, 'অ রনি! রনি রে!'

রঙ্গনা মন দিয়ে 'অবজারভার' পত্রিকায় কিংবদন্তীখ্যাত আটলান্টা নগরী আবিষ্কারে এক পাগলা সায়েবের সাম্প্রতিক অভিযানকাহিনী পড়ছিল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী!'

'রনি রে! আমায় একবারটি করালীর থানে নিয়ে যাবি?' বৃদ্ধা হঠাৎ কী কারণে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। 'অ রনি! তোর পায়ে পড়ি ভাই! একবারটি…'

রঙ্গনা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে হাসিমুখে ঘুরল ঠাকমার দিকে। 'বলো, কী বলছ। তোমারটা শুনে নিই আগে।'

কুড়ানি ঠাকরুনের বয়স প্রায় বাহাত্তর হয়ে গেছে নিজের হিসেবে। তবু একটাও দাঁত ভাঙেনি, এটাই আশ্চর্য। সরু সরু মুক্তোর মতো দাঁতে হেসে বললেন, 'বাসে চেপে যাব, বাসে চেপেই ফিরব। তুই শুধু বাসরাস্তা থেকে থানপর্যন্ত একটু ধরে নিয়ে যাবি। ব্যস্! আর তোকে কিছু কত্তে হবে না। অ রনি, যাবি না ?'

রঙ্গনা ভুরুকুঁচকে বলল, 'কোথায় ?'

'বললুম না ? করালীর থানে।' বৃদ্ধা কাকুতিমিনতি করলেন। 'বড্ড [illegible] কেমন করছে রে! কাল রাত্তির থেকে খালি স্বপন হচ্ছে। অ রনি, তোর পায়ে পড়ি!'

'আবার তুমি ওই ভূতের জঙ্গলে যাবে?' রঙ্গনা কপটভাবে ধমক দিল। কিন্তু সে মিটিমিটি হাসছিল দুচোখে। তার মতো করে চোখে হাসতে খুব কম মেয়েই পারে। 'সেবারে গিয়ে কেমন ভিরমি খেয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছিলে মনে নেই ? আর আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যাচ্ছিনে বাবা!'

কুড়ানি ঠাকরুন পাছা ঘষড়ে এবং ক্রাচটা নিয়ে ওর কাছে এলেন। 'আজ সন্ধে করব না। বুঝলি ? দিন-সবরেই ফিরে আসব। দোহাই নক্ষি মেয়ে, আমার সোনা! মাণিক!'

রঙ্গনা তার কাঁধ থেকে ঠাকমার হাত আলতোভাবে ছাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যেতে পারি। একটা শর্তে।'

বৃদ্ধা করুণমুখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাই বল কী তোর শত্ত।'

'একখানা বই কিনে দেবে।'

[illegible] ভয়ে বললেন, 'বই ? দাম কত রে ?'

'[illegible]—মোটে টাকা।' রঙ্গনা চাপা গলায় বলল ফের, 'মধুববাবুকে চেনো [illegible] ওই যে ভট্টাচায্যিদের মধুববাবু। ওদের বাড়িতে অনেক বই আছে। [illegible] [illegible]জার লোভে লুকিয়ে একটা করে বেচে দেয়। আমিই তিনখানা [illegible]নেছি মনে পড়ছে না মধুরবাবুকে ?'

[illegible] ঠাকরুনের মাথায় এসব ঢোকে না। তবু বললেন, 'বুঝিছি। সেই [illegible]'

[illegible] ফিসফিস করে বলল, 'ম[illegible]বাবুর মামা জানতে পারলে বিপদ হবে। [illegible] মুখ ফসকে কাকেও বলে ফেলো না।'

বৃদ্ধা জোরে মাথা দোলালেন।

'তাহলে দিচ্ছ তো ছটাকা ?' রঙ্গনা ঠাকমার গলা জড়িয়ে আদুরে গলায় [illegible] ঠাকমা!'

বৃদ্ধা শ্বাস ফেলে আস্তে বললেন, 'তাই তো!'

'তাই তো বলো না। তোমার আবার টাকার অভাব?' রঙ্গনা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'ঠাকুরদার গুপ্তধনের খবর তুমিই তো জানো। অনেক টাকা পুঁতে রেখে গেছেন—না গো?'

কুড়ানি ঠাকরুন ঘোলাটে চোখে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন রঙ্গনার দিকে।

রঙ্গনা বলল, 'কী? বলছ না যে? তোমার কাছেই তো গল্প শুনেছি, ঠাকুরদা দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিলেন। ডাকাতরা সোনাদানা টাকাপয়সা লুকিয়ে রাখে কে না জানে!'

বৃদ্ধার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে শুরু করল। রঙ্গনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওঁর মুখের দিকে। একমুহূর্ত পরে কুড়ানি ঠাকরুন থানের আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ধরা গলায় বললেন, 'তাই যদি হত রে, এবয়সে খোঁড়া পায়ে কি ডোবার জল বয়ে এসব পালতুম?' সবজিমাচান, ফুলফলের গাছের দিকে জরাগ্রস্ত লোল একটা বাহু তুলে ঠাকরুন বললেন, 'এসব কিচ্ছু পালতুম না তাহলে। রাণীর মতন পালংকে শুয়ে শেষবেলায় দাসদাসীর সেবা নিতুম। আমার খুব কষ্টের জেবন ভাই, সে সবকথা তোরা বুঝবিনে।'

কুড়ানি ঠাকরুন হঠাৎ ক্রাচটা তুলে শূন্যে নেড়ে কোনো পাখি অথবা কুকুর-বেড়ালের উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'যা! যা! দূর! দূর!'

বাড়িতে কেউ না থাকলেই মুশকিল। চোরে সব শেষ করে ফেলবে। তাই কতবার ইচ্ছে করে, তবু করালীর থানে যাওয়া হয় না। অপরূপা না ফিরলে তাই যাওয়া হবে না। সে আজকাল চাকরির জন্য ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এবেলা কোথায় গেছে বলে যায় নি। কখন ফিরবে তাও জানা নেই।

অপরূপা ফিরতে বেলা গড়িয়ে গেল। ঠাকমার করালীর থানে যাওয়ার কথা শুনে সে কোনোরকম উচ্চবাচ্য করল না। ব্লকে কিছু স্থানীয় সমাজশিক্ষা সংগঠক নেবে—আজ তার তদ্বিরে মুরব্বি ধরতে গিয়েছিল। আশ্বাস পেয়ে মনটা ভাল আছে অপরূপার। শুধু বলল, 'দেখো—যেন সেবারকার মতো কেলেংকারি বাধিও না। রনি তোমার মতো বুড়োহাড় কাঁধে বইতে পারবে না।'

রিকশো করে বাসস্ট্যাণ্ডে, তারপর বাসে যখন চলেছেন কুড়ানি ঠাকরুন, তখনও মনের ভেতর অপুর কথাটা বাদুড়ের মতো ঝটপট করে আঁচড় কাটছে। কাঁধে বইতে পারবেনা···কাঁধে বইতে পারবেনা···কাঁধে বইতে পারবেনা

ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কণ্ডাকটার চেচাচ্ছে, 'ও দিদিমণি! করালীর ভিটে! করালীর ভিটে!'

এখানে স্টপ নেই। কালে-ভদ্রে কদাচিৎ কেউ ওই মন্দিরে এখনও আসে। তাদের খাতিরে বাস দাঁড় করাতে হয়। অন্য-যাত্রীরা খাপ্পা হয়ে চেঁচায়, 'ঘন্টি মারো! ঘন্টি মারো!' তাদের দোষ নেই। বাসটাকে দূর থেকে দেখায় একটা চলমান মৌচাকের মতো। আস্টেপিষ্টে লোক গিজগিজ করছে ছাদে, পেছনে। জানালা আঁকড়েও ঝুলছে কত লোক। ড্রাইভারের কোলেও জনাকতক। মফস্বলে বাস যত বেড়েছে, যাত্রী বেড়েছে তার চৌগুণ। আজকাল গ্রামের লোকে এক পা পায়ে হাটতে রাজি নয়।

কণ্ডাকটার ছোকরাটি সম্ভবত রঙ্গনার মুখ চেয়েই তার ঠাকমাকে দুহাতে তুলে যাত্রীদের মাথা ও কাঁধের ব্যূহ ভেদ করে নামিয়ে দিল। যাবার সময় হাত নেড়ে রঙ্গনার উদ্দেশে প্রেমিকের হাসি হেসে বলে গেল, 'টা' টা দিদিমণি! ফিরতি টিপেই নিয়ে যাব। ওয়েট করবেন।'

ব্রিজ পেরিয়ে এসে প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের কাছে বাসটা থেমেছিল। বাস চলে গেলে কুড়ানি ঠাকরুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চারদিক দেখছেন। তখনও মাটিতে বসে উনি। রঙ্গনা জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এবার? এসে তো গেছি না হয়।'

বৃদ্ধা নড়বড় করে উঠে দাড়ালেন। গাছে ভর করে বললেন, 'হ্যাঁ! নদীটা কোন বাগে রে? চোখে কিছু সোজে না কেন?'

মাঝে মাঝে ঠাকমার মুখের কথায় অদ্ভুত একটা টান লক্ষ্য করে রঙ্গনা। বসন্তপুর এলাকায় লোকের কথায় এমন বেসুরো টান নেই বলে তার ধারণা। সে রসিকতা করে ঈষৎ ভেংচি কেটে বলল, 'সোজে না কেন—কী বলছ? পেরিয়ে এলে না নদী?'

'অ'—বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'বিরিজ হয়েছে বটে। তা অ লা মুখপুড়ি, তুই আমায় ভেঙাচ্ছিস যে বড়? জানিস, কার মাটিতে দাড়িয়ে আছিস এখন?'

রঙ্গনা চোখ কপালে তুলে বলল, 'হঠাৎ যে জোর বেড়ে গেল তোমার। ব্যাপারটা কী?'

কুড়ানি ঠাকরুন মিষ্টি হেসে হাত বাড়ালেন। 'নে ধর। টুকুস টুকুস করে যাই।'

রাস্তা থেকে গড়ানে জায়গা। নিচে ঝোপঝাড়ের ভেতর সাপ পায়ে চলা একফালি পথ গিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে। ডাইনে নদী। করালীর ভিটে উঁচু জায়গা বলে বাঁধ দেওয়া হয়নি এদিকটায়। সাবধানে ঠাকমাকে ধরে নিচের পথে নামাল রঙ্গনা। তারপর বলল, 'তোমার জোর বেড়ে গেল কেন বললে না? তা?'

আগে চলতে চলতে বৃদ্ধা বললেন, 'বাড়বেই তো। এ হল গে আমার মায়ের ভিটে।'

'মায়ের ভিটে!' রঙ্গনা হাসতে লাগল। 'দেবী করালী তো বিশ্বসুদ্ধু সবার মা।'

'ফককুরি করিস নে রনি।' বৃদ্ধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

রঙ্গনার মনে পড়ল, কবছর আগে এমনি করে ঠাকমাকে নিয়ে এসেছিল। তখন কিন্তু ওঁর আচরণ ছিল অন্যরকম। ভীষণ কান্নাকাটি করছিলেন। শেষে মন্দিরতলায় ঘাড় গুঁজে পড়ে রইলেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই। রঙ্গনা খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস দৈবাৎ নদীর ওপারে ধানক্ষেতে কয়েকটা লোকের দেখা পেয়েছিল। রঙ্গনার ডাকে তারা ব্রিজ পেরিয়ে দৌড়ে এসেছিল। ধরাধরি করে তারাই বাসে তুলে দেয়। কুড়ানি ঠাকরুন তখনও আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন আর কান্নাকাটি করছিলেন। রঙ্গনার তখন বয়স কম। ভয়ে সারা।

তাই আজ রঙ্গনার সন্দিগ্ধতা ঘুচছে না। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বৃদ্ধার দিকে লক্ষ্য রেখেছে—কোনোরকম কুলক্ষণ দেখা যায় নাকি। বৃদ্ধা লাফিয়ে-লাফিয়ে এগোচ্ছেন। চোখদুটো গাছপালার ডগার দিকে। নিষ্পলক দৃষ্টি। মুখের গাম্ভীর্য আছে বটে, কিন্তু তাতে অপ্রকৃতিস্থতা নেই।

মন্দিরতলায় ফাঁকা জায়গা খুব কম। সবত্র বটের ঝুরি। প্রাচীন ইঁদারা ধসে একটা গর্তমতো রয়েছে। তার চারদিকে গুল্ম-লতা। একটুকরো পাথর অবশিষ্ট নেই কোথাও। মন্দিরের একটা দেয়াল এবং ত্রিকোণ চূড়ার কিছু অংশ বটের কয়েকটা ঝুরির মধ্যে আটকে রয়েছে মাত্র। বেদীসহ কালোপাথরের ছোট্ট মূর্তিটি কোন গ্রামে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠার কথা শোনা যায়। কিন্তু সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না কোন গ্রামে। মন্দিরের মেঝেয় ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে কুড়ানি ঠাকরুন চোখ বুজে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বসে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলেন।

দেখাদেখি ভয়ে-ভয়ে রঙ্গনাও দাঁড়ানো অবস্থায় একটা প্রণাম করল। [illegible]বাবুর কাছে ছ'টাকায় একটা মস্ত বড় ইংরেজি নভেল পাবে, এই তার আকাঙ্ক্ষা। প্রণামের সময় অবচেতন তাগিদে [illegible] [illegible] হয়ে [illegible]।

বৃদ্ধা সেবারকার মতো বিশ্রি রকম হাঁউমাউ করে কাঁদলেন না বটে, কিন্তু ফোঁস ফোঁস করলেন কিছুক্ষণ। গাছপালার ভেতর বলে এখানে বেশ খানিকটা
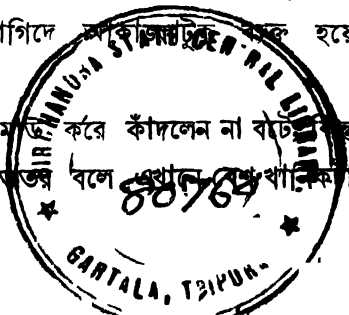
ওম আছে। নদীর ওদিকে হাওয়া বেশ উত্তাল। বেলা গড়িয়ে এসেছে বলে সেই হাওয়া শীত ধরিয়ে দেয়। রঙ্গনা বলল, 'হল? আর কতক্ষণ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'এটা কত সন চলছে রে রনি?'

রঙ্গনা বলল, 'ইংরেজিটা জানি। বাংলা কে জানে কত!'

'তেহাত্তর?' কাঁপা-কাঁপা গলায় বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন। ঘোলাটে চোখের ফ্যাকাসে তারা ফেটে বেরিয়ে আসছে যেন।

রঙ্গনা বলল, 'ইংরেজি! ইংরেজি তিয়াত্তর।'

'তেরশো বাইশ সনের বোশেখী-পুন্নিমেতে বাবা আমাকে কাঁধে করে এখেনে বয়ে এনেছিল।' বৃদ্ধা সেইরকম নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে যেন গাছপালা আর শূন্য মন্দিরকে গল্প শোনাচ্ছেন। ...'ডাগরপানা চাঁদখানা উঠেছিল ওইখেনে। বড় জল তেষ্টা পেয়েছিল। ইঁদারার জলটায় গন্ধ। তাই বাবা গেল নদী থেকে জল আনতে। আমি বসে আছি। পাশে লণ্ঠন জ্বলছে। কেউ কোথা নাই। তাপরে...'

রঙ্গনার গা ছমছম করছিল এই জনহীন বনের ভেতর। করালীর ভিটে নিয়ে অসংখ্য ভূতের গল্পও সে ছোটবেলা থেকে শুনেছে। যত শিগগির চলে যেতে পারে, তত ভাল। ঠাকমার কথা কেড়ে সে বলল, 'ও ঠাকুমা! বাড়ি গিয়ে শুনব। তুমি ওঠ এবার। বাসটা এক্ষুনি ফিরে আসবে।'

বৃদ্ধার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। 'অ। বাস আসবার সময় হল বুঝি?'

'হবে না? তুমি এবার ওঠ।'

বৃদ্ধা করুণ মুখে বললেন, 'উঠি।:আমায় ধরদিনি এট্টুখানি।' রঙ্গনার সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফের বললেন, 'দুদণ্ড থাকতে বড় ইচ্ছে করে। তোর ঠাকুদা বেঁচে থাকতে পায়ে মাথা ভেঙিচি, ওগো, একবারটি আমার মায়ের থানে নিয়ে চলো' সে বড় পাষাণ মানুষ ছিল—তোর ঠাকুদা।'

রঙ্গনা পা বাড়িয়ে বলল, 'আমি দেখিনি।'

'তুই তখন কোথা যে দেখবি?' বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'তোর বাবাকে যদি বলতুম, ও গউর, আমায় একবার থানে নিয়ে যা বাবা! গউরের আর সময়ই হত না—মুখে বলত, যাব। রনি, তোর মনে বড় দয়া। তাই তুই কতকাল পরে মায়ের ভিটেতে আমায় এনেছিলি। আজ আবার নিয়ে এসিছিস! তোর ভাল হবে দেখবি। আশীর্বাদ কচ্ছি। ওই ছাখ, মাও কচ্ছেন, তোর খুব ভাল হবে। বড় ঘরে বে হবে। সোনার চাঁদ ছেলে প্রসব করবি।...'

রঙ্গনা রাগ করে বলল, 'নাও, শুরু হল! ফিরে গিয়ে ছটা টাকা দেবে, ব্যস।'

কুড়ানি ঠাকরুণ ক্রাচ ঠকঠক করে পা বাড়িয়ে বললেন, 'দোব। তুই লক্ষ্মি মেয়ে।' তারপর হঠাৎ ঘুরে কান পেতে কিছু শোনার ভংগিতে বললেন, 'অই! অই!'

রঙ্গনা ভড়কে গিয়ে বলল, 'কী? কী ঠাকুমা?'

বৃদ্ধা দুঃখিতভাবে একটু হাসলেন। 'এখেনে আসাঅব্দি খালি কানে শব্দটা বাজছে—কনক! কনকলতা রে!'

বিস্মিত রঙ্গনা বলল, 'কনকলতা মানে? ও ঠাকুমা, কনকলতা মানে কী? কে সে?'

'আবার কে! বাবা ওই নামে ডাকতেন।'

'তোমার নাম কনকলতা নাকি?' রঙ্গনা হেসে উঠল। 'কী সুন্দর নাম গো তোমার! কিন্তু আমরা যে জানি কুড়ানি ঠাকরুন! ব্যাপারটা কী?'

'আমার শাউড়িঠাকরুণ বড় হেনস্তা করতেন। তোর ঠাকুদার ভয়ে সামনে কিছু বলতেন না। আড়ালে কতরকম মাগী-টাগী গালমন্দ করতেন। বলতেন, অ কুড়ুনির বেটি কুড়ুনি! সেই থেকে ওই নামই বহাল হল।'

'ঠাকর্দা কী নামে ডাকতেন?'

'স্বর্ণলতা বলে ডাকতেন।'

দুজনে ফিরে যেতে-যেতে এইসব কথা হল। রঙ্গনা এবার ঠাকমার কাঁধ ধরে হাঁটছিল। একটু তফাতে নিচে নদীর জলে এখন ছায়া পড়েছে। দূর থেকে পাম্পিং মেসিনের চাপা ধক ধক শব্দ ভেসে আসছে। নদীর ওপারে ঘন সবুজ গম-সরিষার ক্ষেত। এখানে-ওখানে লোকজন চোখে পড়ে।

পাকা রাস্তায় উঠতে খুব কষ্ট হল। ঠাকুমাকে প্রায় টেনে হিঁচড়ে রঙ্গনা রাস্তায় ওঠাল। রাস্তার কিনারায় কাঁচা অংশে ঘাসের ওপর বসে কুড়ানি ঠাকরুন হাঁফাচ্ছিলেন। রঙ্গনা জানে, বাস ফিরতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি হবে। সদর শহর থেকে আসবে বাসটা। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে যাবে। এখনই সবখানে কুয়াসা জমে গেছে। তবে রাস্তা নির্জন নয়। মাঝে মাঝে বিকশা বা ট্রাক আনাগোনা করছে।

রঙ্গনা ঠাকমার গায়ে তাঁর চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এবার থেকে তাহলে তোমায় কনকঠাকমা বলব।'

বৃদ্ধা জোরে মাথা নেড়ে বললেন, 'না না।'

'আচ্ছা ঠাকমা! দিদি বা দাদা তোমার আসল নাম জানে?'

'কেউ জানে না। কাকপক্ষীটিও না।'…বৃদ্ধা আবার একটু হাসলেন। 'কাকেও বলিনি ভাই, কী দরকার? কেবল তোকেই বললুম।'

'ঠাকুমা, তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল গো?'

'বাপের বাড়ি? বাঁকা-ছিরামপুর চিনিস কোথা?'

'উঁহু। কোথায়?'

কুড়ানি ঠাকরুন মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে লাগলেন। মুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। রঙ্গনা ডাকলে আস্তে বললেন, 'শুনিছি নিমতিতের উদিকে কোথা যেন। কেউ সঠিক করে বলতে পাবে না।'

রঙ্গনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই বৃদ্ধার কোলে সে একরকম মানুষ হয়েছে। শৈশবে মায়ের মৃত্যুর পর ঠাকমাই ছিলেন তার মায়ের মতো। অথচ আশ্চর্য, সে কোনোদিন ঠাকমাকে তাঁর জীবন, তাঁর অতীত সম্পর্কে একটাও প্রশ্ন করে নি। একটু পরে রঙ্গনার মনে হল এটাই তো স্বাভাবিক। বাড়ির লোকেদের অতীত কথা কেই বা শুনতে চায়। ওঁরা নিজেরা যেটুকু বলেন নিজে থেকে, সেইটুকুই। ঠাকুমা না ঠাকুমা। এত আপন, এত কাছের মানুষ—তার বাইরের অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতেও পারে না।

রঙ্গনা দুঃখিতভাবে বলল, 'সে কী! তুমি বুঝি বাপের বাড়ি বিয়ের পর আর যাওনি?'

'না। কেউ নিয়ে যায় নি। বললুম না, তোর ঠাকুদা ছিল পাষাণ মানুষ।'

'কী আশ্চয! তুমি লুকিয়ে গেলেও পারতে। আমি হলে তাই করতুম!'

'তোরা একালের মেয়ে। তোদের কত সাহস কত জোর! তাছাড়া আমি খোঁড়া-খঞ্জ মানুষ, ভাই।'

রঙ্গনা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'তাই বলে তুমি এটুকুও জানবে না, বাঁকা-শ্রীরামপুর না কী বললে, সেটা ঠিক কোথায়?'

বৃদ্ধা হাসলেন। 'খোঁড়া হয়ে মায়ের পেট থেকে জন্মেছিলুম। বাড়ির বাইরে কি কখনও গেছি? তাছাড়া বাবা এই থানে যখন নিয়ে এল, তখন বয়সই বা কত? তেরো-চোদ্দর বেশি হবে না। খোঁড়া বলে বে হচ্ছিল না, তা জানিস?'

রঙ্গনা অবাক হয়ে বলল, 'তখন বুঝি অতটুকু মেয়ের বিয়ে হত?'

'আটবছর-দশবছর বয়েস হলেই বর খুঁজতে বেরুত লোকে।'

'বলো কী!' রঙ্গনা হাসতে লাগল। 'হ্যাঁ গো, তখন ঠাকুর্দার বয়স কত ছিল?'

বৃদ্ধা মুখ নামিয়ে দ্বিধাজড়িত গলায় বললেন, 'সে-হিসেব কি জানি? তখন সোমত্ত পুরুষ। পেল্লায় যোয়ান। তা আমার ডবল বয়েস তো হবেই।'

রঙ্গনা আরও হেসে বলল, 'তা যাই বলো—ঠাকুর্দাকে পাষাণটাষাণ করছ বটে, কিন্তু ওঁর উদারতার প্রশংসা করছ না। তোমার মতো প্রতিবন্ধী মেয়েকে বিয়ে করে ঠাকুর্দা খুব বড় মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।'

বৃদ্ধা হাঁ করে কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন, 'আমার শাউড়ি ঠাকরুন আমায় অ-জাত কু-জাত বে-জাত বলে খোঁটা দিতেন। কেঁদে কেটে বলতুম, বিশ্বাস করো মা, আমি কায়েতের মেয়ে। অমনি মুড়ো ঝাঁটা তুলে বলতেন, বেরো, বেরো! বামুনের জাত মেরে আবার কথা হচ্ছে?'

রঙ্গনা চঞ্চল হয়ে হাততালি দিল। 'ঠাকুর্দা বেঁচে থাকলে কনগ্রাচুলেশান জানাতুম! ভাবা যায়? অসবর্ণ বিয়ে করে গেছেন ভদ্রলোক!'

অন্যমনস্কভাবে কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'অনিকে কতবার বলেছি—অপুকেও বলেছি, একবার বাঁকা-ছিরামপুর ঠিক কোথা একটু খোঁজখবর কর্। শোনে নি। বলেছে, সেখানে কী আছে? তবে আমারই দোষ, ভেতরের কথা খুলে তো বলি নি। বললে হয়তো খোঁজ করত।'

'বাবাকে বলো নি কেন?'

'গউর? তাকে বলতে নজ্জা হত ভাই। বড় নজ্জা হত।'

'সে কী! লজ্জা কিসের নিজের ছেলেকে?'

'রনি! জাতের খোঁটা বড় খোঁটা। গউর জানলে দুঃখু পেত। তাই কিছু বলিনি।'

রঙ্গনা রাগ দেখিয়ে বলল, 'বড় অদ্ভুত মানুষ তুমি! আজ হঠাৎ আমায় বললে যে?'

'বললুম।' বৃদ্ধা একটু চুপ করে থাকার পর ফের বললেন, 'মা বললেন, তাই বললুম। আমার বোধ হয় ডাক এসেছে, তাই মা কাল রাত্তির থেকে স্বপন দিচ্ছেন খালি। তাই তোকে বলে গেলুম। রনি! তোর হাতে ধরে বলছি, এসব কথা কাকেও যেন বলবিনে ভাই।'

রঙ্গনা কী বলতে যাচ্ছে, একটু তফাতে ব্রিজের ওপর একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াল। আসন্ন সন্ধ্যার ধুসরতা ক্রমশ ঘন হয়েছে। গাড়ির হেডলাইটে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কুড়ানি ঠাকরুন হকচকিয়ে বললেন, 'অই! বাস এল বুঝি?'

রঙ্গনা বলল, 'বাস ওদিক থেকে আসবে নাকি? ওদিকে তো নসমপুর। বাস আসবে এদিকে থেকে।'

'লেট কল্লে তাহলে।'

মোটরগাড়িটা ফের স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে এল। রঙ্গনাদের পাশে দাঁড়াল। রঙ্গনার বুকটা ধড়াস করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সে বিহ্বল দৃষ্টে তাকাল গাড়িটার দিকে।

গাড়ি থেকে নেমে এল শতদ্রু। 'নমস্কার! আপনি রঙ্গনা না?'

রঙ্গনা চিনতে পেরে মুহূর্তে খুশি হয়ে বলল, 'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?' বিয়াসদি আসে নি?'

'ওর শরীরটা ভাল না।' শতদ্রু বলল। 'তা আপনারা এখানে কী করছেন সন্ধ্যাবেলা?'

'ঠাকুমাকে নিয়ে করালীর থানে এসেছিলুম। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।'

'আসুন।' বলে শতদ্রু কুড়ানি ঠাকরুনের দিকে তাকাল। 'ওঁকে ধরতে হবে বুঝি? আপনি উঠুন—আমি দেখছি।'

কুড়ানি ঠাকরুন হতবাক হয়ে গেছেন। রঙ্গনা বলল, 'বিয়াসদির দাদা। বিলেতে থাকেন…'

'স্টেটসে।' শুধরে দিল শতদ্রু।

রঙ্গনা হাসল।…'ঠাকুমার কাছে বিলেতই এনাফ।' ওঠ ঠাকুম, তোমার কপাল! আসলে তোমার মা করালীই তোমার জন্য গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন!'

রঙ্গনার সাহায্যে বৃদ্ধা উঠলেন—তখনও হতচকিত অবস্থা। গাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে সিঁটিয়ে বসে রইলেন। জীবনে বাসমোটরে দু'চারবার চেপেছেন। এমন গদিআঁটা গাড়িতে চাপেন নি। রঙ্গনা দেখল, তার ঠাকমা হাত বুলিয়ে গদি পরখ করছেন।

শতদ্রু বলল, 'আপনি সামনে আসুন না। কথা বলতে বলতে যাই।'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'থ্যাংকস। ঠাকুমা হয়তো অস্বস্তি বোধ করবেন একা।'

শতদ্রু বলল, 'তাই বটে। ঠিক আছে।'

গাড়ি সামনে এগোচ্ছে দেখে রঙ্গনা একটু চমকাল। আমরা উল্টোদিকে যাচ্ছি।'

'ভাববেন না। ঠিক পৌঁছে দেব। শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল। 'এই সুন্দর সন্ধ্যায় একটু চক্কর দিয়ে আসতে দোষ কী? বাসের আলো সামনে দেখলেই গাড়ি ঘোরাব।'

শেষ অব্দি ভালই লাগল রঙ্গনার। কিন্তু এমন প্রচণ্ড গতিতে গাড়ি চলেছে

দেখে তার বুক টিপটিপ করছিল। মাঝে মাঝে লরি আসছে চোখে আলো ফেলে। পলকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবারই প্রাণের আশা ছেড়ে দিচ্ছে রঙ্গনা। শেষে বলল, 'ইস! ভীষণ জোরে গাড়ি চালাতে পারেন দেখছি।'

'আমেরিকার রাস্তা আরও চওড়া। একমুখো। তাছাড়া গাড়িগুলোও দারুণ। সেই অভ্যাস।' শতদ্রু আমেরিকার গল্প জুড়ে দিল। রঙ্গনাকে আকৃষ্ট করার ইচ্ছায় সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আর এদিকে রঙ্গনারও ক্রমশ দ্বিধা কেটে যাচ্ছিল। সে অসংখ্য প্রশ্ন করতে থাকল। বইতে পড়া বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা। কুড়ানি ঠাকরুণ কাঠ হয়ে বসে আছেন। কোনো সাড়াশব্দ নেই।...

বইচোর

মধুরবাবু আজ খুব সমস্যায় পড়েছিলেন।

সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। তারপর সন্ধ্যার দিকে হাওয়া উঠেছে কেঁপে। সেইসঙ্গে টিপ টিপ বৃষ্টি। উত্তরের হিম হাওয়ার সঙ্গে এই টিপ টিপ বৃষ্টিকে স্থানীয় লোকে বলে পউষে বাদলা। বসন্তপুরের বাজার এলাকা। তবু প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। দোকানপাটের ঝাঁপ পড়ে গেছে তাড়াতাড়ি। শুধু চায়ের আড্ডা, হোটেল, সিনেমাঘরের আনাচে-কানাচে আমুদে লোকেরা গুড়ে মাছি আটকে যাওয়ার মতো সেঁটে আছে। রাস্তায় সার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা প্রকাণ্ড ট্রাক। সর্দারজীরা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসের চত্বরে আটচালায় খাটিয়ায় বসে দারু পান করছে। পাত্রে গরম মাংসের ঝোল আর ইয়া মোটা চাপাটি

মধুরবাবুর আগের দিনটা সুখের ছিল। আজ এমন দিনটা দুঃখের। পয়সাকড়ি ফুরিয়ে গেছে হেমন্তের কামারশালে সন্ধ্যা নাগাদ গাঁজার আসর বসে। হেমন্ত আজ সন্ধ্যাতেই ঝাঁপ বন্ধ করে শুতে গেছে। মধুরবাবু শেয়ালভেজা হয়ে বাজারের এদিকে-ওদিকে ছোঁক-ছোঁক করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একটা ছাতি অবশ্য আছে। কিন্তু হাওয়ার দাপটে খালি উল্টে যায় সেটা।

আবগারির দোকানে আর ধার মেলে না। কুবের শা মধুরবাবুকে দেখলেই ট্যারা চোখে তাকিয়ে বলেন, 'পয়সাটা?' দেড় টাকা বাকি। 'পয়সা' বলেন এও মধুরবাবুর বাপের ভাগ্যি। পয়সা থাকলে হড্ডু মুচির মারফত মাল আনিয়ে নেন। টের পান না শা মশাই।

এই কাল-সন্ধ্যায় হড্ডু পেট্রোল পাম্পের পাশে তার ঝোপড়িতে ঢুকেছে। তেরপলের তাঁবুমতো আস্তানা। হাওয়ায় থরথর করে কাঁপছে। মধুরবাবু টের পান, ফুটোয় চোখ রেখে হাওয়ার গতিক আঁচ করছে হড্ডু। তার জন্য মনে কষ্ট হয়। আহা, পৃথিবীতে কত মানুষের কত রকমের দুঃখদুর্দশা।

মধুরবাবুর হঠাৎ মাথায় এল সিঙ্গিবাড়ির শতদ্রুর কথা। ছোকরা তো মার্কিন মুলুকে থাকে। সেখানে নাকি হরেকরকম শুকনো নেশার ছড়াছড়ি। হেরোইন, মারিজুয়ানা, এল এস ডি। এদেশের বড়লোকের ছেলেরাও সেই রাস্তা ধরেছে। ধরবেই তো। সায়েবরা মাথায় লম্বা চুল রাখলে নেটিবরাও রাখবে। ওরা সখ

করে ছেঁড়া পাতলুন পরলে এরাও পরবে। আর ওই যে হিপি-হিপি করছে, আরে বাবা, হিপিই বলো, লম্বা চুল বলো, ছেঁড়া কাপচোপড় বলো, ন্যাংটা-আধন্যাংটা হওয়া বলো—সবই আগে ভারতে, তারপর সায়েবদের দেশে। কী বোকা এদেশের লোকেরা ভাবা যায় না।

মনে-মনে শতদ্রুর সঙ্গে এইসব তর্কাতর্কি করতে-করতে সিঙ্গিবাড়ির গেটে পৌঁছে দেখলেন গেট বন্ধ। দারোয়ান জঙ্গ বাহাদুরও কোন গর্তে সেঁধিয়েছে। শতদ্রুকে ছেড়ে কেষ্ট কন্ট্রাকটারের মুণ্ডুপাত করতে-করতে মধুরবাবু হতাশ ও ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িটা বিরাট। বসন্তপুরে বরাবর বনেদী বড়লোকের বাস। মধুরবাবু এ বাড়ির আশ্রিত। কমলাক্ষ ভটচায তাঁর অতি দূর সম্পর্কের মামা। ভটচাযরা পুরুষানুক্রমে সেবায়েতী এবং যজমানী বৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন, কমলাক্ষের আমলে তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। কমলাক্ষের বয়স এখন প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। এখনও খুব শক্তসমর্থ মানুষ। স্থানীয় স্কুলে জাঁদরেল হেডমাস্টার ছিলেন। বইপড়ার প্রচণ্ড নেশা। বাড়িতে বেশ বড় আকারে একটা পারিবারিক লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। নিচের হলঘরে আলমারি ভর্তি বইয়ের যত্ন-আত্তি এখনও করেন। ক'মাস আগে একটা আলমারি ভেঙে অনেক বই চুরি গেছে। সেই থেকে হলঘরে কাকেও ঢুকতে দেন না। কড়া নজর রাখেন। তবু তাঁর অগোচরে প্রায়ই একটা করে বই চুরি হচ্ছে। চোর যে ঘরের মানুষ, তাঁর মাথায় এখনও ঢোকে নি।

বাড়ি যেমন বড়, লোকজনও প্রচুর। চার ছেলে, তাদের বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে বৃহৎ একান্নবর্তী সংসার। এযুগে এমন সংসার দেখা যায় না। তবে কমলাক্ষের মৃত্যু হলে কী হবে, অনুমান করা সোজা।

খিড়কির দরজার পাশে যে পাঁচিল, তার ওদিকে খানিকটা আগাছাভরা পোড়ো জায়গা। কেউ জানেনা, ঝোপের ভেতর একটা চাষবাসের ছোট্ট মই লুকোনো আছে। মইটা মধুরবাবু চাষীপাড়া থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। বাড়ি ফিরতে রাত হলে মইটা কাজে লাগে। পাঁচিল থেকে জবাগাছের প্রকাণ্ড ঝাড়ে পা রেখে নামেন। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে মইটা যথাস্থানে রেখে আসেন।

খিড়কির দিকের উঠোনটুকু ঠাকুরদালানের। এ পরিবারের পূজ্য গৃহদেবতা সিংহবাহিনী আত্রেয়ী দেবী। এ অঞ্চলের সব দেবদেবীর ইনিই নাকি অধীশ্বরী। তাই ভটচাযদের অনেকে অনেক স্থানীয় দেবীর পূজোআচ্চা এবং সেবায়েতীও করেছেন, বংশে দোষ ঢোকে নি কোনোকালে। কিন্তু শোনা যায়, ঈশানপুরের

মাঠে নদীর ধারে প্রাচীনা এক দেবী করালীর সেবায়েতী করতে গিয়ে কমলাক্ষের জ্যাঠামশাই বেণীমাধব গৃহদেবীর কোপে পড়েন। তাঁর মুণ্ডহীন দেহ উদ্ধার করা হয় করালীর থানের ইঁদারা থেকে। এ ঘটনা প্রায় ষাট বছর আগেকার। কমলাক্ষের তখন সবে হাঁটি-হাঁটি দশা। সঠিক কী ঘটেছিল কেউ বলতে পারে না। জনরব আছে, দেবী করালীর সামনে প্রণামরত বেণীমাধবের মুণ্ডচ্ছেদ করেন দেবী আত্রেয়ী এবং মুণ্ডটি নিজে গ্রহণ করে দেহটি অধীনস্থ করালীকে অনুকম্পা-ভরে দান করেন। দেবী করালীও কম নন। ঘৃণা ভরে সে-দেহ প্রত্যাখ্যান করেন এবং লাথি মেরে ইঁদারায় নিক্ষেপ করেন। তারপর মনের দুঃখে সেই দেবী করালী নিরুদ্দিষ্টা হয়ে যান। তাঁর বিগ্রহ আর কেউ থানে দেখেনি সেই থেকে

জনরবের আর একটু গোপন অংশ আছে। বেণীমাধব নাকি দেবী করালীর ভিটেতে প্রচুর ধনরত্ন পেয়েছিলেন। সেই টাকায় রাতারাতি ভটচাযপরিবারের আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছিল। এত বড় বাড়িটা তিনিই রেখে গেছেন। কমলাক্ষর বাবা সত্যসুন্দর তো চির-রুগী মানুষ ছিলেন। খেঁটে কাষায় বস্ত্র পরে ঘুরতেন। ন্যাড়া মাথায় একটি দীর্ঘ শিখা, পেটের রোগের কারণে হাতে সবসময় গাড়ু। জমিদার সিঙ্গিদের ভাণ্ডার কাজে জৈবকর্মে যেতেন এবং নাকি প্রতিদিন একটা করে ইট হাতে বাড়ি ফিরতেন। একদিন সিঙ্গিরা হাতে-নাতে ধরে খুব অপমান করেছিলেন। তারপর সত্যসুন্দরের দাদা বেণীমাধব প্রতিজ্ঞা করেন, সিঙ্গিদের চেয়ে বড় দালানবাড়ি না বানিয়ে জলস্পর্শ করব না।

মধুরবাবু ওঁদের কাউকে দেখেন নি। তাঁর বয়স প্রায় বাহান্ন বছর। ধানবাদের দিকে রেলে টিকিটচেকার থাকার সময় তুচ্ছ কারণে চাকরি যায়। চিরকুমার মানুষ। এখানে-ওখানে হন্যে হয়ে শেষে বসন্তপুরে আশ্রয় নেন। কমলাক্ষ টের পেয়েছিলেন, এই ভাগ্নেবাবাজীর গতিক সুবিধের নয়। বাড়ির বাজার করা, সাংসারিক হাজারটা কাজে সহায়তা, কখনও কাচ্চা-বাচ্চাদের পড়ানো—এসব কাজে প্রচুর ফাঁকি দিতেন মধুরচন্দ্র। শেষে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়েছে। এ বাড়ির লোকেরা এখন আড়ালে বলে, শিবের ষাঁড়। কানে এটাও হজম করতে হয় মধুরবাবুকে। বাইরে লোকের কাছে বলেন, 'আথায় প, শাখে ফুঁ আর কানে ফুঁ দেওয়া বংশ তো। বরাবর সেবায়েতী সম্পত্তি হরেহদ্দে খেয়ে ফুলে ঢাক হয়েছে। রোসো না, বুড়ো টেঁসে যাক—কী হয় দেখবে। তাসের ঘর হুড়মুড় করে ধসে যাবে—হুঁ বাবা!'

পউষে বাদলায় সাত-সন্ধেয় খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে টের পেলেন মধুরবাবু।

ঠাকুরদালানে মিটমিটে বাল্ব জ্বলছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন ঘাপটি মেরে। এমন একটা রাতে মৌতাত হল না—দুঃখে প্রাণটা কাতর হয়ে গেছে।

থামের আড়ালে চোখ বুজে ঘণ্টাখানেক পড়ে থাকার পর বাড়ি যখন সুমসাম হয়ে গেল, তখন ছাতিটা বগলদাবা করে পা টিপে টিপে বেরুলেন।

টানা বারান্দার পর ভেতর বাড়ির দরজা। দরজা আটকানো আছে। বাঁয়ে হলঘর। খড়খড়ির জানালা। ছাতির ডগা দিয়ে খড়খড়ি তুলে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে হাত ভরে একটা পাট সাবধানে খুললেন।

একটা মরচেধরা গরাদ অনেকদিন আগে থেকে আলগা করে রেখেছেন। ওপরে চৌকাঠটা রেখেছেন ফাটিয়ে। নিচের দিকটা ঠেলে তুলতেই সেটা উঠে গেল। তখন গরাদটা টেনে বের করে দিলেন। এই পথেই একবার বাউরি পাড়ার বংকার সাহায্যে এক বস্তা বই চুরি করে বেচে এসেছিলেন কলকাতায়।

রোগা পাঁকাটি গড়ন। গলিয়ে যেতে অসুবিধা হয় না মধুরবাবুর। অন্ধকার হলঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ শ্বাস চেপে দাঁড়িয়ে রইলেন। কদিন থেকে মফেজ হোসেন দপ্তরী এসে পুরনো বই আর মাসিক পত্রিকা বাঁধিয়ে দিচ্ছে। মেঝের হাতুড়ি, ছেনি, ময়দার লেই, সুতোর গুটি, শিরিস কাগজ, চামড় এসব অনেক জিনিস পড়ে আছে। পায়ে লাগলে শব্দ হবে। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালতে গিয়ে দেখলেন, ভিজে চুর হয়েছে। এদিকে নিজেরও হিমথাওয়া ভেজা শরীরে নিঃসাড় অবস্থা। ঘরের ওমে কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন মাত্র।

হাঁটু গেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে বুকটা ধড়াস করে উঠল। একগাদা বই হাতে ঠেকেছে। হাত বুলিয়ে বুঝলেন, ভারি একটুকরো পাথর চাপিয়ে রেখে গেছে মফেজ দপ্তরী।

একখানা বইয়েরই ওজন কম নয়। তাই সই। কথায় বলে, চোরের কপনিটুকুও লাভ।…

কিছুক্ষণ পরে মধুরবাবু যখন আগাছার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পুরনোপাড়ার পথে হাঁটছেন, তখন পউষে বাদলার আরও জোর বেড়েছে। মাথার ওপর গাছপালা এবং ছাতিটা থাকায় তাঁকে ঘায়েল করতে পারছে না বাদলাটা।

কালু মুখুয্যের ভিটেয় ঢুকে দেখলেন, টিনের কপাটের ফাঁকে আলো নজর হচ্ছে। মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকলেন, 'বান! ও রনি! রনি মা!'

অপরূপা পাশের ঘরে শুয়ে পড়েছে। অন্যঘরের দরজা তখনও খোলা। কুড়ানি ঠাকরুনের শুতে অনেক দেরি হয়। কদিন থেকে বঙ্কনা তার কাছ

ঘেঁষে ঘুরছে। তাঁর কাছেই শুচ্ছে। কুপি জ্বলছে দরজার চৌকাঠের কাছে। কুড়ানি ঠাকরুন পাশে দু'পা ছড়িয়ে বসে বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন। রঞ্জনা সামান্য তফাতে বসেছে বিছানার পায়ের দিকটায়। মেঝেয় বিছানা করেই শোন ঠাকরুন। কুপির শিস হাওয়ায় ঘুরে কেবল নাকে এসে ঢোকে। তাই রঞ্জনা কুপির একটু দূরে স্থান নিয়েছে। বিছানার পায়ের দিকে উপুড় হয়ে সে ভার্জিনিয়া উলফ পড়ছে। বইটার টাইটেলপেজ সুদ্ধু মলাট ছেঁড়া। এটাই মধুরবাবুর কাছে ৩টাকায় দরাদরি করে কিনেছিল সে।

কুড়ানি ঠাকরুনের কান এখনও পাতলা। চমকে উঠে বললেন, 'অই! অই!'

রঞ্জনা বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই বলল, 'উঁ?'

কুড়ানি ঠাকরুন নড়বড় করে ওঠার চেষ্টা করে গলা চেপে বললেন, 'অই গো! অনি এসেছে নাকি।'

রঞ্জনা চমকে উঠে তাকাল। 'দাদা? কই? কোথায়?'

'ডাকছে! ওই শোন্।' ঠাকরুন আরও গলা চেপে বললেন। চোখ বড় হয়ে গেছে। তারাদুটো ঠেলে বেরুচ্ছে যেন।

রঞ্জনা বুড়মুড় করে উঠে পড়ল। পাশের ঘরের দরজায় দিদিকে ব্যস্তভাবে ডাকতে থাকল। কোনো সাড়া পেল না। অপরূপা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। তখন রঞ্জনা দৌড়ে বৃষ্টির মধ্যে উঠোন পেরিয়ে টিনের দরজাটা যেই খুলেছে, মধুরবাবু ঢুকে পড়লেন।

রঞ্জনা তখনও চিনতে পারে নি। লম্পের আলো এতদূর পৌঁছয়নি—বারান্দার থামের আড়ালে রয়েছে। দরজা আটকে সে বলল, 'কোত্থেকে এলে এভাবে? কোথায় ছিলে এ্যাদ্দিন?'

মধুরবাবু বারান্দায় গিয়ে উঠেছেন বিনা বাক্যব্যয়ে। রঞ্জনা যথেষ্ট ভিজে এসে যখন দেখল মধুরবাবু—দাদা নয়, তখন সে প্রথমে বিরক্ত হয়ে পরমুহূর্তেই হাসিতে ভেঙে পড়ল।

মধুরবাবু কুড়ানি ঠাকরুনকে প্রায় ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'ক্লোজ দা ডোর! ক্লোজ দা ডোর—ইমিজিয়েটলি!'

বৃদ্ধা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে মধুরবাবুকে দেখছেন। রঞ্জনা দরজা বন্ধ করল না। বলল, 'বই এনেছেন মধুর কাকা? কী বই, দেখি—দেখি।' সে বইটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। সুন্দর ও মজবুত বাঁধানো প্রকাণ্ড বইটার গন্ধ শুঁকল আগে। সদ্য বাঁধানো বলে গন্ধটা তার মনঃপূত হল না। বইয়ের গন্ধ তার কী যে ভাল লাগে। খুলে দেখল, প্রবাসী পত্রিকা।

মধুরবাবু মেঝেয় বসেছেন এবং হু হু হা হা শব্দে কাঁপছেন। রঙ্গনা লম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ল বইয়ের পাতায়। রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির কিস্তি, আবার তাঁরই কবিতা। অভ্যাসমতো দ্রুত চোখ বুলোচ্ছিল রঙ্গনা। মধুরবাবু অতিকষ্টে বললেন, 'বেশি চাইব না মা। দুটো—মাত্তর দুটো টাকা এখন দে। পরে যা হয় কিছু দিবি। আর শোন, লুকিয়ে পড়বি। কেউ যেন না দেখতে পায়। আর মা রনি, যদি এক কাপ চা খাওয়াতে পারিস, প্রাণভরে আশীর্বাদ করব মা!'

রঙ্গনা বই বুজিয়ে রেখে হাসিমুখে তাকাল। '…চা? ঠাকুমা, একটু চা করা যায় না? উনুনে আঁচ নেই?'

কুভানি ঠাকরুন গুম হয়ে বললেন, আঁচ নিভে গেছে। দুধও নেই, বাছা!'

'হুঁ।' নিরাশ গলায় মধুরবাবু বললেন, 'তা একটুখানি কাঠকুটো জ্বেলে চা কি করা যায় না? রনি, টোটাল প্রাইস বরং একটা টাকা ধরেই দেব'খন। বড় ঠাণ্ডা, মাদার! শেয়ালভেজা ভিজেছি!'

রঙ্গনা বলল, 'দেখছি। তবে দুধ নেই যে!'

'র-টিই খাব। প্লিজ মাদার রঙ্গনা!' দুঃখিত মুখে হাসলেন মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী।

বারান্দার শেষে রান্নাঘর। রঙ্গনা কুপি হাতে বেরুল। অন্ধকারে মধুরবাবু আর কুভানি ঠাকরুন চুপচাপ বসে আছেন। একটু পরে বৃদ্ধা গলা ঝেড়ে নিয়ে ডাকলেন, 'বাবুমশাই!'

'বলুন বুড়িমা।'

কুভানি ঠাকরুন এই লোকটিকে কয়েকবার দেখেছেন। রঙ্গনাকে বই বেচে যান। তাই নামটাও শোনা আছে। খঞ্জ মানুষ—বিশেষ করে তাঁর মতো স্ত্রীলোকের জীবনের গণ্ডী চিরদিন খুব সীমাবদ্ধ। বড়জোর বাড়ির আনাচ-কানাচটুকু খুঁটিয়ে জানা।। তার বাইরে যাবার সুযোগও কম এবং গেলে পরে ফাঁপরে পড়ে যান। বললেন, 'একটা কথা বলতুম আপনাকে।'

মধুরবাবু টাকা এবং চায়ের স্বপ্নে আবিষ্ট। খুশি হয়ে বললেন, 'বলুন, বলুন।'

রনির কাছে শুনিছি, আপনি রেলের লোক। রেল গাড়িতে টিকিট পরীক্ষে করতেন।'

করতুম বটে।' মধুরবাবু আরও খুশি হয়ে বললেন।

'তা আপনি তো ঢের-ঢের দেশে ঘুরেছেন।'

'ঘুরেছি।'

'নিমতিতের উদিকে বাঁকা-ছিরামপুর চেনেন বাবুমশাই ?'

রেলের লোক বলেই 'বাবুমশাই' এই সম্ভ্রমসূচক সম্বোধন কুড়ানি ঠাকরুনের। মধুরবাবু অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে বললেন, 'নিমতিতের ওদিকে বাঁকা-শ্রীরামপুর? মনে আসছে আবার আসছে না। একটু ধৈর্য ধরুন বুড়িমা। চা পেটে পড়লেই মেমরি খুলবে।'

বাইরে পউষে বাদলার সারাক্ষণ শোঁ শোঁ ঝির ঝির বিচিত্র শব্দ। বৃষ্টিটা বেশিক্ষণ চললে ছাদ চুইয়ে জল পড়বে। রঙ্গনা চা আনল গেলাসে। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, 'মধুরকাকা, পত্রিকাটা আপনি নিয়ে যান।'

মধুরবাবুর গলায় চা আটকে গেল। কাসতে থাকলেন। লালচে চোখের ঢ্যালা বেরিয়ে এল। শিরাবহুল গলার ওপর ধুকধুকি নড়তে দেখা গেল কুপির আলোয়।

রঙ্গনা তেমনি হাসিমুখে বলল, 'প্রথম কথা, পত্রিকা-টত্রিকা আমার তত ভাল লাগে না।'

'অ।' মধুরবাবুর মুখ দিয়ে বেরুল। মনে মনে বললেন, হারামজাদী। এতক্ষণ রান্নাঘরে বসে ভেবে-টেবে এই ঠিক করেছ তাহলে? হায়! কোন মুখে যে চা খাব বললুম। বোঁকের মাথায় যা হবার হত।

রঙ্গনা বলল, 'দ্বিতীয় কথা, আমার কাছে এখন একটা পয়সাও নেই।'

মধুরবাবু ঝটপট বললেন, 'পরে দিবি। সকালে দিবি। একটু বেলা হলেই দিবি বরঞ্চ।'

রঙ্গনা নির্বিকারভাবে মাথাটা দুপাশে দোলাল। 'বিশ্বাস করুন, নেই।'

'সেদিন তো অতগুলো টাকা দেখলুম।' মবীয়া মধুরবাবু শেষ চেষ্টা করলেন।

'সে তো ঠাকুমার। তাই না ঠাকুমা?'

বৃদ্ধা ওর দিকে একবার তাকালেন মাত্র। মধুরবাবু মেঝেয় পাছা ঘষটে বৃদ্ধার কাছে এসে 'ইউরেকা' বলার সুরে বলে উঠলেন, 'অই। মনে পড়েছে—বাঁকা-শ্রীরামপুর পাকুড় স্টেশনের কাছে।'

বৃদ্ধা সন্দিগ্ধ স্বরে অস্ফুট বললেন, 'পাকুড়। পাকুড়। নাম শুনিছি।'

'ওদিকে পাকুড়, এদিকে নিমতিতে— মাঝামাঝি।'

'বড় গাঁ। জমিদারী কাছারি ছিল।' বৃদ্ধা বলতে থাকলেন। 'ঝুলনপুন্নিমেতে রাসের মেলা বসত কাছারি বাড়িতে। সে কী হুলস্থুলস, সে কী ভিড়। বাবার কোলে চেপে মেলায় যেতুম। আর ছিল পেল্লায় পেতলের রথ। একশো লোকে

টেনে নড়াতে পারত না। তখন ডাক পড়ত কৈলেসের। কৈলেস ছিল পাহাড় পুরুষ। গায়ে অসুরের শক্তি। মাথায় জটা গজিয়েছিল কৈলেসের। ভাং খেত একবালতি করে। সেই কৈলেস এসে বাবার নামে জয় হেঁকে যেই না দিয়েছে রশিতে হাত, চাকা গড় গড় করে গড়াতে নেগেছে।'

কুড়ানি ঠাকরুন শীর্ণ একটা হাত দুলিয়ে দিলেন দরজার দিকে—যেন চাকা গড়িয়ে দিলেন প্রাচীন এক রথের।...'আমার বাপের গাঁয়ে আর একটা হুলুস্থুলুস ছিল পুণ্যার দিন। পুণ্যা কত্তে জমিদার আসতেন কোন মুল্লুক থেকে। শুনিছি, তিনি পদ্মাপারের লোক। হাতি চেপে আসতেন। হাতির গলায় ঘন্টা বাঁধা থাকত। আমাদের বাড়ির ছামু দিয়ে হাতি যেত ঘন্টা বাজিয়ে। আমি তো খোঁড়া-খঞ্জ মেয়ে। ছটফট কত্তাম। পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছড়া গাইতে গাইতে হাতির পেছনে-পেছনে যাচ্ছে, হাতি তোর গোদা গোদা পা। হাতি তুই নেদে দিয়ে যা...'

বৃদ্ধা হাসতে থাকলেন। 'কে নিয়ে যাবে আমায় বলো? বাবা ছেরেস্তাদার মানুষ। আছেন কাছারিতে। আমার মাকে চোখে দেখিছি বলে মনেও পড়ে না। খাঁচার পাখির মতো ঘরে বন্দী আছি। ওই যে পাখি যেমন ছোলাদানা খায়, বাবা বেঁধেবেড়ে রেখে গেছেন, ক্ষিদে পেলে খাচ্ছি। হঠাৎ হাতির গলায় ঘন্টার শব্দ।' হঠাৎ যেন মাথায় ঘা খেয়ে চুপ করে গেলেন। ঘোলাটে চোখের ক্যাকাসে তারা বজবজ করছে জলে।

রঞ্জনা বাঁধানো পত্রিকাটা ফেরত দেবার আগে সুযোগ পেয়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। এবার ঠাকুমার দিকে তাকাল। মধুর বাবুর চা শেষ। জায়গামতো কোপ বসানোর অপেক্ষায় আছেন। বললেন, 'সেই বটে, সেই বটে। সেই বাঁকা-শ্রীরামপুর। খুব চিনি, খুব চিনি।'

কুড়ানি ঠাকরুনের চোখ ভিজে গেছে। ক্লান্তভাবে বললেন, 'তা আমায় একবার নিয়ে যেতে পারেন বাবা? আমি আপনার মায়ের মতন। গউর বাঁচলে এ্যাদ্দিন আপনার বয়সী হত।'

মধুরবাবু সায় দিতে দেরি করলেন না। 'আলবাৎ নিয়ে যাব। বাঃ, এ কী একটা কথা হল? এ বয়সে বাপের গাঁ যেতে কার না ইচ্ছে করে? এই যে দেখছেন, আমারও অবস্থা কি অন্যরকম? আমাদের বাড়ি ছিল রামপুরহাটের ওদিকে। প্রাণ কেঁদে যায় মা, বুঝলেন? কিন্তু যাব কোথায়? ভিটেমাটি-টুকুও আর নেই।'

বৃদ্ধা সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'কী হল বাবা?'

'আত্মীয়স্বজনে দখল করে নিয়েছে। আর কী হবে?' মধুরবাবু রঙ্গনার দিকে আড়চোখে চেয়ে ফের বললেন, 'আপনার বেলায় তা হবে না। আপনি তো স্ত্রীলোক। আপনার বাবাজ্যাঠার বংশ এখনও ভিটে আলো করে বসে আছে। দেখলে কত আদর করে তুলে নেবে।'

কুড়ানি ঠাকরুন নিস্তেজ ভংগিতে বললেন, 'কে জানে কে বেঁচে আছে কি নেই! এখানে এসে তো আর যাওয়া হয় নি।'

পারিবারিক ব্যাপারে হাত পড়েছে দেখে রঙ্গনা সজাগ হল। পত্রিকাটা বুঁজিয়ে মধুরবাবুর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে বলল, 'রাত অনেক হল মধুর কাকা। এবার আমরা ঘুমুব।'

মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেও মধুরবাবু দাঁত বের করলেন। 'ঠিক, ঠিক। তাহলে এটা রাখবিনে মা?'

'না।'

'এক কাজ কর।' মধুরবাবু চাপা গলায় বললেন। 'রাত্তরটা তোর কাছেই থাক। সকালে এসে নিয়ে যাব। কেমন? আর বুড়িমা, তাহলে ওই কথা রইল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ওয়েদার ভাল হলেই মায়ে-পোয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

পত্রিকাটা বিছানায় রেখে মধুরবাবু উঠলেন। দরজার বাইরে গিয়ে ছাতিটা নিলেন। তারপর একটু কেসে বৃদ্ধার দিকে হেঁট হয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'একটা কথা বলছিলুম, মা!'

'বলো বাবা!'

'এখন একটা টাকা হবে? ধারই চাইছি। খুব দরকার, মা। দিন না একটা টাকা!'

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের কাছে কাপড়ের ভেতর হাত পুরে দিলেন। দুটো আধুলি বের করে বললেন, 'আমি গরীব মানুষ। ফলটা ফুলটা বেচে খাই, বাবা। সকালে একঝুড়ি পেয়ারা বেচেছিলুম।'

মধুরবাবু আধুলি দুটো তুলে নিয়ে ঝটপট বেরিয়ে গেলেন। হাওয়াটা আছে। বৃষ্টি একটু কমেছে। ঘুরঘুটে অন্ধকার এই পাড়াটা। তবু এই দুর্যোগের রাতকে মৌতাতে জমিয়ে তোলার তাগিদে মধুরকৃষ্ণ পাগলের মতো ছুটে চললেন বাউরি-পাড়ার দিকে। ন্যাড়া বাউড়ি গোপনে গাঁজা বেচে।

ন্যাড়াকে ঘুম থেকে ওঠানো সহজ কথা নয়। মালটা তার বউ দিল। মধুরবাবুর গায়ে তখন মত্ত হাতির বল।

ঠাকুরদালানের এদিকে নিচের তলায় কোণার ঘরে মধুরবাবু থাকেন। একটা

জীর্ণ তক্তাপোষে নোংরা বিছানা পাতা। তক্তাপোষটা পাশ ফিরলেই বিশ্রি শব্দ করে। নমু ঠাকুর সপরিবারে থাকে পাশের একটা ঘরে। রাতের খাবারটা সে যত্ন করে ঢেকে রেখে যায় এ ঘরে। সেও গাঁজাখোর মানুষ। তবে নিজে কেনে না, প্রসাদ পায়।

মধুরবাবু ভিজে দেশলাই অনেক সাধ্যসাধনা করে জেলে হেরিকেন ধরালেন। এঘরের বাল্বটা কতদিন থেকে জ্বলে না। বলে-বলে হদ্দ হয়ে গেছেন। কেউ গ্রাহ্য করে না। তাই অভিমানে একটা হেরিকেন চেয়ে এনেছেন হেমন্ত কামারের কাছে। হেমন্ত বিদ্যুৎ নিয়েছে কামারশালে। হেরিকেনটা তাই পড়েছিল অযত্নে।

হেরিকেন জেলে খাবারটা দেখলেন মধুরবাবু। কয়েকটা রুটি—'কুকুরের কান' তাঁর ভাষায়। একটু তরকারি। ছুঁলেন না। তাকে এক গেলাস দুধ আছে। দুধটা তাঁর নিজের পয়সার। মাসকাবারে দিয়ে যায় নকড়ি গোয়ালা। নমু ঠাকুর সেটার জিম্মাদার। গরম করে তেমনি যত্নে রেখে দেয়। বেড়ালের উৎপাতে মাঝে মাঝে দুধটা ভোগে লাগে না। কিন্তু কপালটাই যার পোড়া, সে করবেটা কী? তবে গাঁজার ভোগ হল গিয়ে দুধ। দুধের জোরেই এখনও টিঁকে আছে শরীরটা।

গুপ্তস্থান থেকে কল্কে ও ছোবড়ার গুটি বের করে গাঁজাটা আচ্ছারকম ডলে বিছানায় বসে মধুরবাবু মনে মনে বললেন, 'ব্যোম ব্যোম শংকর! জয় বাবা ভোলানাথ! বড় সুন্দর এই রাতটা পৃথিবীতে ছেড়েছে বাবা!'

বেলাপর্যন্ত ঘুমোন মধুরকৃষ্ণ। কিন্তু তার আগেই দরজা লাথির চোটে খিল ভেঙে দড়াম করে খুলে গেল। রাঙা চোখে ধুড়মুড় করে উঠে বসতেই কমলাক্ষর রূপো বাঁধানো ছড়িটা এসে পড়ল কপালে। তারপর কাঁধে।...'স্কাউণ্ড্রেল! শুওরের বাচ্চা! চোর! আজ তোমায় শেষ করে ফেলব!' কমলাক্ষের গর্জনে ঠাকুরদালান গমগম করে উঠল। বাইরে পউষে বাদলা আগের দিনের মতো ঝরছে ঝির ঝির করে। হাওয়া বইছে উদ্দাম। কপাল, ঠোঁটের কাছটা কেটে রক্ত ঝরছে মধুরকৃষ্ণের। চুপ করে বসে আছেন মরা মানুষের মতো। কেউ আটকাচ্ছে না কমলাক্ষকে।

দেয়ালে লেগে ছড়িটা মট করে ভেঙে গেল। তখন চুল খামচে ধরে হিঁচড়ে নামালেন। লাথি-খেয়ে মধুরবাবু কঁক শব্দ করে পড়ে গেলেন।

কমলাক্ষ ভাঙা গলায় গর্জালেন, 'কোথায় কাকে বেচলি হারামজাদা? বল্, কাকে বেচেছিস?' তারপর আবার কাঁধে একটা লাথি। 'গাজাখোরটাকে আজ শেষ করে ফেলব!'

কমলাক্ষের বয়স হয়েছে। থরথর করে কাঁপছেন। এতক্ষণে ওপর থেকে বড় ছেলে সুহাস এসে তাঁকে ধরল। এবয়সে এতটা বাড়াবাড়ি হার্ট সইবে না। টানতে টানতে নিয়ে গেল বাবাকে। সুহাস স্থানীয় কলেজের লেকচারার। বাবার মতে আদর্শ ছেলে। তাই সে ছাড়া কমলাক্ষকে নিবৃত্ত করা আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আপাতত বাবাকে সে হলঘরে নিয়ে গেল। তার কথা শোনা যাচ্ছিল—'নিজেও হার্টফেল করে মারা পড়বেন, আবার ওই গাঁজাখোরটাকে খুনখারাপি করে বাড়ির সবাইকে বিপদে ফেলবেন। এ এক জ্বালা!'

মধুরকৃষ্ণের মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। হাতের আঙুলে রক্তটা দেখে অবাক হয়ে গেছেন যেন। নিজের রক্তের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাঁধে আর উরুর কাছে প্রচণ্ড ব্যথা। মুখের ক্ষতগুলো রক্ত ঝরাচ্ছে, কিন্তু টের পাচ্ছেন না কোনো যন্ত্রণা। মুখমণ্ডল—গলার ওপরের অংশটা নিঃসাড় হয়ে গেছে যেন।

বাড়ি অসম্ভব স্তব্ধ। কতক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তক্তা-পোষটা আকড়ে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন হতভাগ্য প্রৌঢ় মধুরকৃষ্ণ। কিন্তু দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন। তারপর বুকের খুব ভেতর থেকে একটা কান্নার মতো আওয়াজ টেনে কণ্ঠনালী পার করালেন—তখন সেটা একটা জান্তব হুংকারে পরিণত হল মাত্র। তাঁর আহত শরীরটা কাঁপতে থাকল শুধু।

নন্তু ঠাকুর দয়াপরবশ হয়ে উঁকি মেরে চলে গেল ঘণ্টাখানেক পরে। সে দেখে গেল, চিত হয়ে চোখ বুজে শুয়ে আছেন মধুরবাবু—সারা মুখে কালো রক্তের ছোপ। বড় ভয়ংকর দেখাচ্ছে। পা দুটো অভ্যাসমতো নাড়াচ্ছেন দেখে নন্তু ঠাকুর জেনেছে, বাবু জীবিত আছেন।

বিপাশার ঘরে রাত

কিছুকাল থেকে বিপাশা এক অদ্ভুত অসুখে ভুগছে। তার কোনো-কোনো রাতে ভাল ঘুম হয় না। ঘুম যদি বা একটুখানি আসে, কী সব স্বপ্ন এসে ঘিরে ধরে ঝাঁকে-ঝাঁকে। জলে টোপ পড়লে যেমন করে মাছের ঝাঁক এসে ঠোকরায়। নিজের কোনো কথা মুখ ফুটে কাউকে বলার অভ্যাস নেই বিপাশার। সে বুঝতে পারে, নিজের ভেতরটা যেন একবিন্দু করে ক্ষয় হচ্ছে এবং একটা গহ্বর সৃষ্টি হচ্ছে দিনে দিনে। সেই গহ্বরে মাঝে মাঝে শোঁ শোঁ করে ভুতুড়ে হাওয়ার শব্দ তালগোল পাকিয়ে যায়—সে কে, কেন এখানে

কাটাচ্ছে, কিছুক্ষণ ধরে এসব প্রশ্ন তাকে বড্ড জ্বালায়। জবাব খুঁজে পায় না। অনেক সময় বাবা বা মায়ের দিকে তাকিয়ে তার অবাক লাগে। ওঁরা কে? দূরের জন—অনাত্মীয়, কিংবা সম্পর্কহীন মানুষ বলে ভুল হতে থাকে। তখন সে বাবা অথবা মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুঁয়ে ভুল ভাঙার চেষ্টা করে। শমিতা বলেন, 'কী হল বিয়াস? শরীর খারাপ?' দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে বিপাশা ছোট্ট মেয়ের মতো বুকে মাথা গোঁজে। কৃষ্ণনাথ আড়ালে স্ত্রীকে বলেন, 'আমায় তো বড্ড ভাবিয়ে তুললে বিয়াস। পরের বাড়ি গিয়ে কাটানো ওর হয়তো প্রব্লেম হবে।' শমিতা এতকিছু না বুঝে বলেন, 'প্রব্লেম সবারই হয়। আমারও কি হয় নি! তুমি ছাড়ো তো ওসব অলক্ষুণে কথা।'

কদিন থেকে অকালবৃষ্টির উপদ্রব চলেছে। শুধু বৃষ্টি হলে কথা ছিল, ঝোড়োহাওয়া বইছে শোঁ শোঁ করে। গাঢ় হিমে আচ্ছন্ন দিনরাত্রি। এর মধ্যে শতদ্রু গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে আসছে হাইওয়েতে কতদূর। সে বলে, 'ইলিনয়ে বছরের বেশির ভাগ সময় এরকম। কোনোদিন রোদ উঠলে সাড়া পড়ে যায়। এমন ওয়েদার আমার গা-সওয়া।' আসলে শতদ্রু ভীষণ বদলে গেছে। একমুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকতে পারছেনা। ছুটোছুটি করে বেড়াতে চায়।

দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঘরটা বিপাশার। এখন রাত প্রায় এগোরোটা। আজ সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ বন্ধ। দুর্যোগে কোথাও গণ্ডগোল ঘটেছে। এদিকে বাড়ির জেনারেটরও সময় বুঝে রসিকতা করেছে। সকাল না হলে মিস্তিরি পাওয়া যাবে না। বাড়িটা অন্ধকারে প্রকৃতির করায়ত্ত হয়ে গেছে এখন। টেবিলে শেড দেওয়া কেরোসিন বাতি জ্বলছে। বিপাশার আজ কেমন ভয় করছে। কিসের ভয় সে বুঝতে পারছে না। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে শতদ্রুর আনা টেপরেকর্ডারে সিম্ফনি অর্কেস্টার আওয়াজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে কোথাও প্লেন উড়ে চলেছে যেন। মাথার ভেতর সেই সব অলীক প্লেন উড়ে আসার উপক্রম করলেই বিপাশা ফের নব ঘুরিয়ে আওয়াজ কমাচ্ছে।

খট করে একটা শব্দ হল। মশারির ভেতর লেপের আরাম গায়ে নিয়ে শুয়ে আছে বিপাশা। পাশেই টেপরেকর্ডার চলছে ব্যাটারিতে। ভাবল টেপটা শেষ হবার শব্দ। কিন্তু না তো! সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা সমানে বেজে চলেছে। গভীর আচ্ছন্নতার মধ্যে চোখ খুলে বিপাশা দেখল কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সামান্য তফাতে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল নিজেকে সচেতন করতে। ভাবল, শতদ্রু। হয়তো কিছু ফেলে গেছে এ ঘরে। দরজাটা তাহলে বন্ধ করতে ভুল হয়েছে। এমন ভুল বিপাশার হয় মাঝে মাঝে। বিপাশা বলল, 'দাদা?'

এসময় সে শতদ্রুকে সাটলেজ নাম ধরেই ডাকত। আমেরিকা থেকে ফেরার পর নিজের অগোচরে দাদা বলতে শুরু করেছে। শেড থাকায় আলোমিশ্রিত ছায়া ওখানে। নীল স্বচ্ছ মশারির ভাঁজের ভেতর দিয়ে মূর্তিটা বাঁকাচোরা স্যুরবিয়ালিস্ট ছবির মতো দেখাচ্ছে। বিপাশা ফের বলল, 'কী হল রে দাদা ?'

'আমি অনি।'

বিপাশা চিৎকার করে উঠে বসতে চাইল। কিন্তু পারল না। মুহূর্তে তার মনে হল, ঘরে শুয়ে নেই—বাইরে ঝোড়ো বাদলার মধ্যে চলে গেছে কোন অদ্ভুত উপায়ে। শুয়ে আছে ভেজা ঘাসের ওপর। সে অসহায় হাঁটতে না শেখা শিশুর মতো ছটফট করতে থাকল।

অনি একটু এগিয়ে এসে বলল, 'বিয়াস কি ভয় পাচ্ছ ? ওঠ, আমি অনি। বিয়াস ! বিয়াস !' অনির কণ্ঠস্বর কেন অমন বাতাসের মতো শনশন করে উঠছে, বুঝতে পারল না বিপাশা। এই সময় তার মনে পড়ে গেল, ক'বছর আগে সন্ধ্যায় ছাদে একা পায়চারি করার পর হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। তারপর আলোগুলোও নিভে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে নেমে আসার সময় চিলেকোঠার সিঁড়িতে অনি এমনি করে সাড়া দিয়ে বলেছিল, 'আমি অনি। কথা আছে শোনো।' অনি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বিপাশা চিৎকার করে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় অজ্ঞান অবস্থায় সিঁড়ির ওপর। পরে খুব অবাক হয়েছিল বিপাশা। অনির কথাটা যদিও কাউকে বলেনি, কিন্তু অনি কেমন করে চিলেকোঠার সিঁড়িতে আসতে পারল, সে বুঝতে পারে নি। বাড়ির সবার নজর এড়িয়ে কারুর পক্ষে ছাদে ওঠা সম্ভব নয়। তবে অনির মতো ছেলের পক্ষেও কিছু অসম্ভব হয়তো নয়। ও সব পারে। পাইপ বেয়ে ওপরে উঠেছিল সম্ভবত।

বিপাশা অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, 'কা ?'

'ওঠ, আমি কথা বলব। আমার অনেক কথা আছে। ওঠ বিয়াস।'

'না।'

'তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমাকে ?'

'হ্যাঁ। তুমি চলে যাও।'

'বিয়াস, আমি বলতে এসেছি তুমি কথা রাখো নি।'

'কিসের কথা অনি ? আমি তোমাকে কোনো কথা দিই নি।'

'দিয়েছিলে। তুমি আমার সঙ্গে চলে যাবে বলেছিলে।'...

'মিথ্যা কথা। আমি তোমাকে ঘৃণা করতুম। এখনও করি, অনি।'

'কেন বিয়াস?'

'তুমি চলে যাও। নৈলে এখনই সবাইকে ডাকব। তুমি খুনী ডাকাত! তুমি ফেরারী আসামী।'

অনি হাসতে লাগল। তার হাসির শব্দে ঘরের ভেতর অদ্ভুত শন শন শব্দ ঘুরপাক খেতে থাকল। সে বলল, 'কেন ঘৃণা কর আমি জানি। তোমার কুমারীত্ব ভেঙেছিলুম বলে। বিয়াস, তোমাকে ভালবাসতুম। এখনও বাসি। ভালবাসা দিয়ে তোমাকে পূর্ণ নারীত্বে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলুম। কেন তুমি বোঝ না?'

'চুপ করো। এ আমার লজ্জা, এ তোমার পাপ।' বিপাশা ফুঁপিয়ে উঠল।

'তোমার লজ্জা, আমার পুণ্য। তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।'

'কী বললে?'

'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।'

বিপাশা কাঁদতে থাকল হু হু করে।

'ওঠ বিয়াস! এস আমার সঙ্গে।' অনি হাত বাড়াল। আবছা কালো একটা হাত মশারি ছুঁল। মশারি থর থর করে কেঁপে উঠল।

বিপাশা বালিশ আঁকড়ে ধরে উপুড় হল। সিম্ফনি অর্কেস্ট্রায় আবার দূরের সমুদ্রের একটা বিশাল ঢেউ এসে তটে আছড়ে পড়ার মতো, কিংবা শত প্লেনের দিগন্ত জোড়া চাপা গর্জনের মতো সুর বাজতে থাকল। বিপাশা কাঁদতে থাকল।

'বিয়াস। আমার বিয়াস!'

অনি কি তাকে ছুঁল? অনি যেন তাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে ঘরের বাইরে হিম হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে। বিপাশা অবচেতনার অন্ধকার তলদেশে মাটি আঁকড়ে ধরে নিজেকে লুকোতে চাইল।

সকালে ঘুম ভেঙে সে দেখল ওপাশে জানলার একটা পাট খোলা। উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে ঘরে। সে উঠে বসল আস্তে আস্তে। মাথার ভেতরটা শূন্য লাগছে।

মশারি তুলে দিয়ে সে পা বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ দেখল, মসৃণ মোজেকের চিত্রিত মেঝেয় কয়েক টুকরো শুকনো কাদা ঘাস আর ছেঁড়াপাতার কুচি।

সঙ্গে সঙ্গে সে চমক খেল। রাতের ঘটনা মনে পড়ে গেল। দ্রুত দরজার দিকে তাকাল। কিন্তু দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ!

থর থর করে কেঁপে উঠল বিপাশা। যদি স্বপ্ন হয়, তাহলে কাদা ঘাস ছেঁড়াপাতা এল কীভাবে? সে কম্পিত হাতে সেগুলো কুড়িয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিল।

রাতে অনির উচ্চারিত বাক্যটা কবিতার লাইন হয়ে ঘরের ভেতর জেগে উঠল আবার। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য···তোমার সঙ্গে পাপ করেছি···তোমার সঙ্গে পাপ করেছি···'

বিপাশা চঞ্চল হয়ে ঘরের ভেতর চোখ বুলোতে থাকল। মাথার কাছে টেবিলে একটা বই খুলে কখন সে উপুড় করে রেখেছিল মনে পড়ছে না। বইটা তুলতেই লাইনটা চোখে পড়ল, 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি··· ।' কিন্তু···

ফুল-ফলের সংসারে

শীতের শুকনো বাতাসে মিইয়েপড়া উদ্ভিদের বিবর্ণতা কদিনের অকালবৃষ্টিতে ঘুচে গেছে। আবার পড়েছে সজীবতার উজ্জ্বল প্রলেপ শিম-লাউ শশার মাচানে, পেয়ারা গাছে, জবাফুলের ঝাড়ে। কুড়ানি ঠাকরুনের মনেও ওইরকম এক বর্ণাঢ্য চঞ্চলতা। বৃদ্ধা দিনমান নড়বড় করে ক্রাচ খটখটিয়ে উঠোনে ঘোরেন। আর মাঝে মাঝে দোরে গিয়ে দাঁড়ান। কখন গোঁসাইবাবু আসবেন। গোঁসাইবাবু রেলের লোক ছিলেন। পৃথিবীর কোন ঠাঁই তাঁর অচেনা আছে? রঞ্জনা অবাক হয় ঠাকুমার এই চাঞ্চল্য দেখে। সে দুষ্টুমি করে বলে, 'আর এসেছেন গাঁজাবাবু। তোমার টাকাটা গচ্চা গেল ঠাকুমা!' বৃদ্ধা বলেন, 'আসবেন, আসবেন। না এসে পারেন নাকি? বুঝি ঠাণ্ডায় জ্বর-জ্বারি বাধিয়ে ফেলেছেন। ও রনি, একবার খোঁজ নে গা ভাই!'

রঞ্জনা ও-বাড়ি একসময় যেত। এখন যায় না। বাড়ির লোকগুলো কেমন দৃষ্টে তাকাত তার দিকে। চোখে যেন অশ্লীল প্রশ্নের পোকা কিলবিল করত। তবে কমলাক্ষবাবু লোকটা রঞ্জনার মতে খুব ভাল। কত বই ওঁর ঘরে। দোষের মধ্যে এক, বই চাইলেই রেগে যেতেন। তারপর মধুরবাবুর কাছে ওঁর চুরি করা বই গোপনে কেনার পর থেকে রঞ্জনা আর ও-বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ায় না। বড্ড ভয় করে তার, যদি সব জানাজানি হয়ে থাকে। বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা

সে ঠাকুর্দার সিন্দুকে পুরনো কাপড়চোপড়ের তলায় লুকিয়ে রেখেছে। অপরূপাকেও জানায় নি কিছু। অপরূপা বেরুলে লুকিয়ে পাতা ওল্টায়। কিন্তু কান বাইরের দিকে। মধুবাবুর জন্যে কুড়ানি ঠাকরুন বাড়ির দরজা প্রায় খুলেই রেখেছেন। তবে ভাগিস রঙ্গনাদের বাড়ি সচরাচর কেউ আসে না। পারতপক্ষে আসতেও চায় না। হঠাৎ যাদের দরকার হয় কুড়ানি ঠাকরুনের ফুলফল কিনতে তারাই আসে। এলে বাইরে থেকে ডাকে ঠাকরুনকে।

এদিকে অপরূপা চাকরির জন্য পাগল হয়ে উঠেছে দিনের অধিকাংশ সময় সে বাইরে থাকছে। তার ফলে রঙ্গনার পাড়াবেড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুমাকে একা রেখে যেতে ভয় পায় বয়স হয়ে গেছে ঠাকুমার, হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায়। আসলে মৃত্যুকে বড় ভয় পায় রঙ্গনা মায়ের কথা মনে নেই, কিন্তু চোখের সামনে বাবাকে মরতে দেখেছে। মৃত্যু বড় কষ্টদায়ক। মৃত্যু বড় ভয়ংকর। একটা মৃত্যু একটা সংসারকে কীভাবে তছনছ করে দেয়, কী বিশ্রি দারিদ্র্য দিয়ে যায়, রঙ্গন হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। দিদির ওপর তার এতটুকু ভরসা নেই, যেমন ছিল না দাদার প্রতি অপরূপা নিজেকে নিয়েই থাকে। স্বার্থপর ধরণের মেয়ে। আর অনিবাণ তো ছিল বাউণ্ডুলে, নষ্ট ছেলে। আজ সাতবছর তার কোনো পাত্তা নেই। তাই বলে তার জন্য কারুর মাথাব্যথাও নেই। অপরূপার তো নেই-ই সে বলে, 'মরেছে। আপদ গেছে।' রঙ্গনা প্রথম-প্রথম একটু বিচলিত বোধ করত। এখন যেন সয়ে গেছে। সেও ধরে নিয়েছে, দাদা কোথাও মার পড়েছে জেলে-টেলে থাকলে নিশ্চয় কোনোভাবে খবর পাওয়া যেত। বাঁচা গেছে বাবা। আর এ বাড়ি রাতবিরেতে পুলিশ এসে জ্বালাতন করে না।

অনির জন্য এবাড়িতে শুধু একজনই মাঝে মাঝে চোখের জল ফেলেন। কুড়ানি ঠাকরুন একবার অনি তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। একবার নিষ্ঠুরের মতো দড়ি বেঁধে মেঝেয় ফেলে রেখে ও'র পয়সাকড়ি ছিনতাই করে পালিয়েছিল। তবু বৃদ্ধা কান পেতে থাকেন তার জন্য রাতবিরেতে। কোনো শব্দ কানে এলেই চঞ্চল হয়ে ওঠেন—'অই! অই! এল নাকি?'

এসব সময় অপরূপা ঠাকুমার ওপর অনেকদিনের রাগটা প্রচণ্ড ঝেড়ে দেয়। ছোটলোকের মতো ফুলফল-তরকারি বেচেন কুড়ানি ঠাকরুন, এতে প্রচণ্ড লজ্জা অপরূপার। তার সামনে কেউ খদ্দের এলে সে ভাগিয়ে দেবেই দেবে। রঙ্গনা অতটা পারে না। তবে তারও ভারি লজ্জা হয় এতে। এমন ভাব দেখায় যেন ওসব ঠাকুমার ব্যাপার। ও পয়সা তাঁরই নিজের কাজে লাগে। যেন

তাদের খাওয়া-পরা জোটে অন্য উপায়ে, যেভাবে আরও পাঁচটা ভদ্র পরিবারের জোটে। হুঁ, বাবা বুঝি টাকাকড়ি রেখে যাননি কিছু? পোস্টাপিসে, ব্যাংকে বাবার টাকা আছে জমানো। সেজন্যই না দিদি অথবা তাকে পোস্টাপিসে যেতে হয়। ব্যাঙ্কে যেতে হয়। কোন ব্যাংক? না—শহরের ব্যাংকে। বসন্তপুরের ব্যাংকে টাকা রাখে নাকি মানুষে?

রঙ্গনার এসব কথা কানে এলে কুড়ান ঠাকরুন মনে মনে হাসেন। একটু পরেই তো অপরূপা রঙ্গনাকে পাঠাবে পয়সা চাইতে। 'ঠাকুমা, পাঁচটা টাকা হবে গো?' দিদি বলল, খুব দরকার।' চাল ডাল নুন তেল কম পড়লে সে দায়ও কুড়ানি ঠাকরুনের। নাতনিরা না খেয়ে থাকবে, সেও ভাল। পাশের বাড়ির দোরে গিয়ে ঠাকরুন তখন ডাকলেন, 'অ ছোটবউ! ছোটবউরে! একবার পেনীকে পাঠিয়ে দে না মা!' ছোটবউ মানে মধু ছুতোরের বউ। পেনী তার মেয়ে। বছর দশেক বয়স। দুটো ফলমূলের লোভে কুড়ানিঠাকরুনের বাজারটা করতে তার আপত্তি নেই। মেয়েটি বড় চৌকস। ওজন বোঝে। হিসেব বোঝে। আর ঠাকরুন বোঝেন পেনা পয়সা মারে। তা মারুক। ধিঙ্গি মেয়ে দুটো যে না খেয়ে থাকবে।

গোসাইবাবুর প্রত্যাশায় কুড়ানি ঠাকরুনের অস্থির কয়েকটা দিন কাটল। তারপর এক বিকেলে টিনের কপাটে মৃদু টোকার শব্দ হল। বৃদ্ধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অই! অই!

রঙ্গনা বেরিয়ে এসে বলল, 'কী?'

'দোর খুলে দে' দিদি। ওই বুঝি গোসাইবাবু এল। বৃদ্ধার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে 'হু:' বলে দরজা খুলতে গেল।

শতদ্রু এবং রঙ্গনা

শতদ্রুকে দেখে রঙ্গনা ভীষণ অপ্রস্তুত বোধ করছিল। সে ভাবতে পারে নি, শতদ্রু তাদের বাড়ি এসে হাজির হবে। রঙ্গনার পরনের শাড়িটা যথেষ্ট ভদ্র নয়। ছেঁড়া ফাটা এবং মলিন। ব্লাউসটাও বেরঙা। যত কম দামের হোক, সোয়েটারটা চাপালেও পারত। বেশ তো শীত করছিল।

আর খালি পা এখন। শীতে প্রচণ্ড পা ফাটে রঙ্গনার। তাছাড়া রোজ

স্নানের অভ্যাসও নেই তার। এ শীতে তো সপ্তায় দুদিনের বেশি স্নান তার পক্ষে অসম্ভব। চুলগুলো রুক্ষু, এলোমেলো। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে একাকার। ক্রিম ফুরিয়ে গেছে। যেটুকু ছিল চেঁছেমুছে নিয়ে গেছে অপরূপা। তাকে বাইরে ঘুরতে হচ্ছে।

শতদ্রু মিষ্টি হেসে বলল, 'কী হল? ট্রেসপাস করলুম বুঝি?'

মুখ নামিয়ে রঙ্গনা আস্তে বলল, 'না না। আসুন।'

'অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?'

রঙ্গনা অগত্যা হাসল। 'না। ঘুমোচ্ছিলুম।'

দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে এসে সে দেখল শতদ্রু উঠোনে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখছে। বারান্দায় টেরচা হয়ে পশ্চিমের যেটুকু রোদ পড়েছে, তাই গায়ে নিয়ে একটুকরো চটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছেন কুড়ানি ঠাকরুন। পাশে দাঁড় করানো ক্রাচটা। কেমন বিভ্রান্ত চাউনি—নিষ্পলক। শতদ্রু বলল, 'বুড়িমা ভাল আছেন তো?' বৃদ্ধা নির্বিকার। জবাব দিলেন না।

অভদ্রতা হচ্ছে দেখে রঙ্গনা বলল, 'ঠাকুমা চিনতে পারছ না? সেদিন যাঁর গাড়িতে এসেছিলে করালীর থান থেকে।'

কুড়ানি ঠাকরুন এবার অস্ফুটস্বরে শুধু বললেন, 'ভাল তো?'

শতদ্রু বলল, 'আপনাদের বাড়িটা তো ভারি সুন্দর।'

রঙ্গনা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করছিল। বলল, 'বিয়াসদি কেমন আছে? ওর কাছে যাওয়া হয় না।'

শতদ্রু বলল, 'ইস! কত সব গাছ! ওগুলো বুঝি শশা? জানেন, আমেরিকায় ঠিক একইরকম শশা পাওয়া যায়। তবে সাইজে একটু বড়ো। আর··'

রঙ্গনা ঘর থেকে একটা জীর্ণ কম্বল সাবধানে ভাঁজ করে এনে ঠাকুমার সামান্য তফাতে পেতে দিল, যাতে শতদ্রু পা ঝুলিয়ে বসতে পারে। বলল, 'এখানেই বসুন।'

শতদ্রুর হাতে একটা ইংরিজি বই। এতক্ষণে চোখে পড়ল রঙ্গনার। শতদ্রু বইটা দিয়ে বলল, 'থ্রিলার পড়তে আপনার কেমন লাগে? স্টেট্সে থাকতে আমার অবশ্য সময় হয় না। সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়তে হয়। ওভার ডিউটি করি ল্যাবরেটরিতে রাত আটটা অব্দি। টেরিফিক লাইফ!'

আড়ষ্ট হাতে বইটা ধরে রইল রঙ্গনা। কী বলবে, খুঁজে পায় না কথা।

শতদ্রু বলল, 'আপনার দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল সকালে। বাবার কাছে গিয়েছিলেন।'

'দিদি এখনও ফেরে নি।'

'একেবারে নেচারের মধ্যিখানে' থাকেন দেখছি।' শতদ্রু আবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল। তারপর তাকাল রঙ্গনার দিকে। রঙ্গনা চোখ নামাল। 'উইদাউট এ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে পড়লুম বলে রাগ করেন নি তো? ওদেশে কিন্তু এ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে কারুর বাড়ি যাওয়া যায় না। এমন কী প্রেমিকও প্রেমিকার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তবে যায়।'

ঠাকুমার দিকে আড়চোখে চেয়ে রঙ্গনা বিব্রত বোধ করল। তার এখন ভাবনা, কতক্ষণে আপদ বিদেয় হবে। এ সময় কেউ লাউশাক কিনতে এলেই সমস্যা হবে।

শতদ্রু বলল, 'আমার অবস্থা বড় করুণ। বুঝলেন? ওদেশে থাকতে এদেশের জন্য মন কেমন করত। আবার এখন ওদেশের জন্য অস্থির হয়ে উঠেছি। কী ভয়াবহ অবস্থা এখানে! আমার ক্রমশ অসহ্য লাগছে। ভেবেছিলুম মাস দুই থাকব। মনে হচ্ছে, সেটা অসম্ভব। একেকটা দিন আর রাত্রি কীভাবে যে যাচ্ছে বোঝাতে পারব না। মনোটনি এ্যাণ্ড মনোটনি! ওঃ!'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন? এ তো আপনার জন্মভূমি।'

শতদ্রু হাসল। 'ওসব সেন্টিমেন্ট যেভাবেই হোক, হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমি টোটালি এ্যালিয়েনেটেড—উন্মূল অবস্থা যাকে বলে। তবু তো ওদেশে লাইফ আছে। কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার স্কোপ আছে। ফিরে এসে আমার খালি অবাক লাগছে, কীভাবে জীবনের অতগুলো বছর আমি নষ্ট করেছিলুম।'

রঙ্গনার মনে হল, বসন্তপুরে কিছু ভাল লাগছেনা—একথাটা জানাতেই বুঝি শতদ্রু এসেছে। সে একটু হেসে বলল, 'বসন্তপুরে আপনার ভাল না লাগারই কথা। কলকাতায় হলে ··'

কথা কাড়ল শতদ্রু। জোরে মাথা নেড়ে বলল, 'সে তো আরও টেরিফিক। কলকাতায় যাই নি বুঝি? কী দেখে গেছি আর কী হয়েছে! একেবারে জঘন্য নোংরা কদর্য। আমার এটাই ভীষণ অবাক লেগেছে, তবু লোকেরা বিনাপ্রতিবাদে দিব্যি কাটাচ্ছে ওখানে। ওয়েস্টের লোকেরা হলে কী করত ভাবুন।'

শতদ্রু অনর্গল এইসব কথা বলতে থাকল। রঙ্গনা অস্থির। কুড়ানি ঠাকরুন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেষ্টাসঙ্গির ছেলের দিকে। মনে আকাশপাতাল চিন্তা। বিলেত-ফেরত ছেলেটা এবাড়ি এসে রঙ্গনার সঙ্গে কথা বলছে, মন্দ না। ভালই লাগে এসব। কায়েতের মেয়েকে লুঠ করে এনে বউ করেছিল বামুনের ছেলে। তাতে যদি দোষ হয়ে থাকে, তো কায়েতের ছেলে এই বামুনের মেয়েকে নিয়ে

গেলে শোধবোধ। মন্দ কি ? বৃদ্ধার ঠোঁটে আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল। তারপর বললেন, 'অ রনি, এট্টুকুন চায়ের যোগাড় কল্লে পাত্তিস ভাই। ছেলেটার গলা যে শুকিয়ে গেল।'

কুড়ানি ঠাকরুন খুক খুক করে হেসেও ফেললেন রসিকতার দরুন। শতদ্রু বলল, 'না—প্লীজ! আমি বহুকাল আগে চা-খাওয়া ছেড়েছি। তবে কফি খাই—উইদাউট মিল্ক। আমেরিকানরা, জানেন ? পট-পট কফি খায়। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবসময় আগে কয়েক কাপ খেয়ে নেবে। তারপর অন্য কিছু।'

রঙ্গনা কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'কফি তো নেই। আমরা একটু চা খাই। কফি...'

'কফি পেলেও এখন খেতুম না। মেজাজ ভাল নেই।' শতদ্রু বলল। 'বাই দা বাই, যে জরুরী কথাটা বলতে এসেছিলুম—ফ্র্যাংকলি বলি। অন্যভাবে নেবেন না প্লীজ।'

রঙ্গনা দুরুদুরু বুকে বলল, 'বলুন।'

'বহু বছর আগে, মনে পড়ছে না ঠিক—আপনি তখন জাস্ট টিন-এজার...'

রঙ্গনা দ্রুত বলল, 'এখনও আমি টিন-এজার। নাইনটিন।' বলেই সে লজ্জায় পড়ে গেল। কেন বলতে গেল বয়সের কথা। ঠিক হল না।

শতদ্রু লাফিয়ে উঠল, 'ইজ ইট ? তাই সম্ভব। ক্ষমা চাইছি।' সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টে রঙ্গনার দিকে তাকাল। সুন্দর চোখ শতদ্রুর। ফের বলল, 'আমি টোয়েন্টি সেভেন। সামনে মার্চে আমার বার্থডে পড়বে। জানিনা ততদিন থাকব কিনা এখানে।'

'কী যেন বলছিলেন ?' রঙ্গনা মনে করিয়ে দিল।

'স্কুলে একটা ফাংশান হয়েছিল। স্টেজের পেছনে একটা চেয়ারে বসে আপনি বই পড়ছিলেন। পরনে লাল ছিটের ফ্রক। চুলগুলো ছাঁটা ছিল। আমার কী দারুণ ভাল লাগছিল।'

রঙ্গনা বলল, 'মনে নেই।'

'আমার মনে আছে। এতবছর পরে সেদিন সন্ধ্যায় বিয়াসের ঘরে আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম।' শতদ্রু একটু আবেগ মেশাল গলায়। 'আমার কিন্তু যখন-তখন মনে পড়ত দৃশ্যটা—ভীষণ সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠতুম।... আপনি কিছু মনে করছেন না তো ?'

'নাঃ। মনে করার কী আছে!'

'কোনো-কোনো দৃশ্য কীভাবে যে মনে থাকে। একবার ডেনভারে ডন হ্যাস

পার্কের রেলিঙে ভর দিয়ে ঠিক ওইরকম টিন-এজার—বয়স ধরুন হাউ্লি চোদ্দ, একটি মেয়েকে বই পড়তে দেখে গাড়ি থামিয়ে ছিলুম। চমকে গিয়েছিলুম একেবারে। এ কেমন করে হয়?'

'আমি তো কালো—বিশ্রি চেহারা।' রঙ্গনা একটু হাসল।

'কী বলেন!' শতদ্রু মুগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বলল। 'আপনি অসাধারণ সুন্দর। অন্তত আমার চোখে।'

রঙ্গনা ফের আড়চোখে কুড়ানি ঠাকরুনের দিকে তাকাল। ঠাকরুন তেমনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন শতদ্রুর দিকে—তবে ঠোঁটের কোনায় কেমন হাসি লেগে রয়েছে।

শতদ্রু বলল, 'মেমসায়েবদের রঙ কিন্তু আমার অপছন্দ। তবে আপান ডার্ক নন, উজ্জ্বল ব্রাউন। এদেশে আপনাকে ফর্সাই বলবে সবাই। বলে না?'

রঙ্গনা ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ ঘোরাল অন্যদিকে। রোদটা কখন সরে গেছে। শীতের হিম গাঢ় হয়েছে। বাড়ির ওপর শেষবেলার ছায়া ঘন হচ্ছে। শতদ্রু উঠবে কখন?

সে আবার আমেরিকা এনে ফেলল। তারপর বাইরের দরজায় কেউ কড়া নাড়ল। রঙ্গনা ভারি পায়ে এগিয়ে দরজা খুলে দেখল, অপরূপা।

অপরূপা শতদ্রুকে দেখেই চমকে উঠেছিল। তারপর সারা মুখ হাসিতে ভরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরে! সাটলেজদা! কতক্ষণ?'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'দারুণ! ওই নামে কেউ না ডাকলে খুব আনইজি ফিল করি। করছিলুম এতক্ষণ।'

অপরূপা চোখ কটমটিয়ে রঙ্গনাকে বলল, 'এই হিমের মধ্যে ওকে বাইরে বসিয়ে রেখেছিস? কী আক্কেল তোর! আমার ঘরটা খুলে দিস নি কেন?'

সে হন্তদন্ত গিয়ে ঘর খুলল ও ঘরটা কোনরকমে ভদ্রতারক্ষার মতো সাজানো আছে। পুরনো একটা জীর্ণ পালংকও আছে। তার গদীতে একশো বছরের ধুলো আর পোকামাকড়। কিন্তু রঙীন বেডকভারে ঢাকা। তার বয়সও অনেক হল। দেয়ালে ঝোলানো গোল মাঝারি আয়তনের একটা আয়না আছে। আলনা নেই—কাপড় চোপড় দড়িতে টাঙানো। তবে একটা টেবিল আছে, চেয়ার না থাক। টেবিলটা এমনভাবে রাখা, যাতে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে পড়াশোনা করা যায়।

লণ্ঠন জেলে বিছানা ঠিকঠাক করে অপরূপা ডাকল, 'রনি! সাটলেজদাকে নিয়ে আয়।'

শতদ্রু বলল, 'থাক। আজ চলি বরং। আবার আসব খন।'

অপরূপা মাথা দুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, 'উঁহু। কী ভাগ্যে এসেছেন, এত শিগগির যেতে দিচ্ছি না। আসুন। বাইরে হিম পড়ছে।'

শতদ্রু বলল, 'প্লীজ।'

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, 'গরীব মানুষ আমরা আটকানোর ক্ষমতা নেই। কী বলব?'

'আপনি রান্না করছেন। আচ্ছা, চলুন—একটু বসে যাই। বঙ্গনা, এস।'

অপরূপা জিভ কেটে বলল, 'এরাম! রীহকেও আপনি আমাকে কক্ষণো আপনি বলবেন না। ভীষণ রাগ করব কিন্তু।'

'বলব। রঙ্গনা, বসুন।' শতদ্রু সরে বসল।

অপরূপা জিভ কেটে বলল, 'এরাম! রনিকেও আপনি বলছেন সাটলেজদা! ওকে তুই বলুন।'

'বলব।'

রঙ্গনা বলল, 'আসছি। ঠাকুমার ঘরে আলো জেলে আসি।' সে বেরিয়ে গেল। কুড়ানি ঠাকরুণ তেমনি বসে ছিলেন। রান্না ঘর থেকে লম্ফ জেলে এনে রঙ্গনা ঠাকুমাকে উঠতে সাহায্য করল। একটু পরে পাশের ঘর থেকে তার কানে এল, অপরূপা বলছে, 'আচ্ছা সাটলেজদা, একটা রিকোয়েস্ট করব? আমি তো আর্টস গ্র্যাজুয়েট—আমার ফরেনে কোনো কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন না? আপনার নিশ্চয় কত জানা শুনা ওখানে। পারেন না সাটলেজদা?'

শতদ্রু কী বলল, শুনতে পল না। কিন্তু রঙ্গনা নিঃশব্দ হাসিতে ভেঙে পড়ল। কী বলছে দিদি! ওর কি মাথাখারাপ হয়ে গেছে? কুড়ানি ঠাকরুণ সস্নেহে একটা থাপ্পড় মেরে চুপ করাতে চাইলেন রঙ্গনাকে। অত হাসতে আছে আইবুড়ো মেয়ের?

শতদ্রু ডাকছিল রঙ্গনাকে কয়েকবার ডাকলেও রঙ্গনা গেল না। কিছুক্ষণ পরে ওরা বেরুল। অপরূপা বলল, 'একটু মিষ্টিমুখ করাতে চাইলুম করলেন না। একদিন কিন্তু খেতে হবে আমাদের বাড়ি।'

শতদ্রু ডাকল, 'রঙ্গনা! যাচ্ছি।'

রঙ্গনা বেরিয়ে বলল, 'আচ্ছা। আবার আসবেন।'

অপরূপা এগিয়ে দিতে গেল শতদ্রুকে। গেল তো গেলই। রঙ্গনা বলল, 'ও ঠাকুমা! দিদি কেলেংকারি না করে ছাড়বে না। কোনো মানে হয়? বিশ্বাসদির কানে গেলে কী বলবে? ছিঃ।'

অপরূপা ফিরল যখন, তখন বেশ অন্ধকার। রঙ্গনা বাঁকা মুখে বলল, 'বাড়ি অব্দি এগিয়ে দিয়ে এলি নাকি রে?'

অপরূপা আনমনে বলল, 'হুঁ।' তারপর নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

রঙ্গনা লম্পের আলোয় শতদ্রুর দেওয়া বইটা খুলেই বন্ধ করল। বলল, 'ঠাকুমা! তোমার মথুরচন্দ্র গোঁসাই তো এলেন না। টাকাটা গচ্চা। তার বদলে আমাকে নিয়ে চলো, কোথায় যাবে।'

কুড়ানি ঠাকরুন দুঃখের হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'তোর বরের সঙ্গে যাব, ভাই। তুই মেয়ে, তুই কি বাঁকা-ছিরামপুরের হদিস কত্তে পারবি? পারবি না। তোর বর নিয়ে যাবে আমায়।'

রঙ্গনা চুপ করে আছে দেখে কুড়ানি ঠাকরুন ফের বললেন, 'ছেলেটি ভালই। দয়াধম্ম আছে মনে হল। তোকে পছন্দও হয়েছে। বাড়ির আপত্তি হলে বলব, বামুনের মেয়ে নিয়ে জাতে উঠবে—আবার অত কথা কিসের বাপু?'

রঙ্গনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কী, হচ্ছে কী ঠাকুমা? গাঁট্টা খাবে বলে দিচ্ছি।'···

মথুরবাবুর সাধুসঙ্গ

রতুডাক্তার ডিসপেন্সারির দরজা খোলেন সাতটা নাগাদ। কম্পাউণ্ডার কানাই কোনো কোনো দিন আগে চলে আসে। তাই বলে তাকে ডিসপেন্সারির চাবি দেবার পাত্র নন রতিকান্ত। বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যদি দেখতে পান কানাই বারান্দার সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছে, ডেকে বলেন, 'আয় কানাই। দাদাভাই মিলে বাজারটা সেরে আসি।' বাজারে লোভনীয় কিছু কিনতে দেখলেও কানাই আশা করে না যে ডাক্তারবাবু তাকে এবেলা খেতে বলবেন।

আগের কম্পাউণ্ডার হরেন চুরি করে ওষুধ বেচত। সেই থেকে বিশ্বাস ঘুচে গেছে। তবে কানাই ছেলেটির স্বভাবচরিত্র ভালই মনে হয়। রতিকান্ত রায় সে আমলের এল এম এফ। কালক্রমে পসার কিছুটা কমে গেছে। বসন্তপুরে এখন দুজন এম বি বি এস প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে দেদার কামাচ্ছেন। ওদিকে সরকারী হাসপাতাল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-কাম-মাতৃসদনেও অনেক কজন ডাক্তার।

তবু রোগীর সংখ্যাও দিনে দিনে বেজায় বেড়ে চলেছে। তাই রতিকান্তের ডিসপেন্সারি একবারে ফাঁকা পড়ে থাকে না, পয়সাওলা রোগী না আসুক।

এদিন বাজার সেরে এসে চা-কা খেয়ে ডিসপেন্সারির দরজা খুলে রতুডাক্তার কানাইয়ের বদলে মধুরবাবুকে দেখে অবাক হলেন। দরজা থেকে উঁকি মেরে বললেন, 'কে হে? মধুরকেষ্ট নাকি? ও কি খাচ্ছ ওখানে বসে?'

মধুরবাবু লাজুক মুখভংগি করে বললেন, 'এই একটু ব্রেকফাস্ট করছি আর কী।'

হা হা করে হাসলেন রতুডাক্তার। 'ব্রেকফাস্ট করছ? ওইখানে বসে? রাধেমাধব! ওখানে রাজ্যের রুগী এসে বসে থাকে। তোমার আর কাণ্ডজ্ঞানের বালাই নেই।'

মধুরবাবুর কপালে আর ঠোঁটের নিচে কালো ছোপ। ঘা শুকিয়ে গেছে প্রায়। কোয়ার্টার পাউণ্ড শক্ত ইট পাঁউরুটি চিবুচ্ছেন আর হাতে ছোট্ট প্ল্যাস্টিকের মগে খানিকটা চা। বললেন, 'ভারর দোকানে ভীষণ ভিড়। বসার জায়গা পেলুম না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তো খাওয়া যায় না। তাই এখানে এসে বসলুম। আর ডাক্তার, রুগীর কথা বলছ? রেসিস্ট্যান্স পাওয়ার আমার বরাবর ভেরি ভেরি স্ট্রং।'

অকারণ একবার জিভ চুক চুক করে মাথা নাড়লেন রতুডাক্তার। বারান্দায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে কানাইকে খুঁজলেন। এখানে-ওখানে চায়ের আড্ডা চলেছে শীতের সকালে। নামেই সকাল, এখনও রোদ্দুরকে কুয়াসা থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। হাইওয়ে এখানে খুব চওড়া হয়ে বসন্তপুরে ঢুকেছে। রাস্তায় গাড়ির ভিড় নেই। এখন শীতকাতুরে লোকেরা একটু কুঁজো হয়ে হাঁটছে। মুখ দিয়ে ভাপ বেরুচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। কিছুটা দূরে বাজারের দিকটায় ভিড় জমতে শুরু করেছে। চাপা গুঞ্জন কানে আসে।

রতুডাক্তার বললেন, 'কানাইটার কাণ্ড দেখছ?'

মধুরবাবু বললেন, 'উঁ?'

'হ্যাঁ হে মধুরকেষ্ট!' রতিকান্ত ঘুরালেন ওঁর দিকে। তারপর আরও অবাক হয়ে বললেন, 'ও কিসের ওপর বসে আছ? কী ওটা?'

মধুরবাবু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'বেডিং।'

'বেডিং!'

'হ্যাঁ। আমার আজকাল ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। তাই সঙ্গে নিয়েই ঘুরি।'

'সে কী! কমলাক্ষের বাড়িতে আর থাকো না তুমি?'

মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী জোরে মাথা নাড়লেন। 'নাঃ! কী দরকার ভাই পরের দোরে থেকে? ওতে লিবার্টি থাকে না। এশপ্‌স্ ফেবলস পড়েছ তো? ঘরের কুকুর আর রাস্তার কুকুরে দেখা হল—ঘরের কুকুরের গলায় চেনের দাগ।' মধুরবাবু পাউরুটির শেষ ডেলাটা মুখে পুরে প্ল্যাস্টিকের মগে চুমুক দিলেন। গলার নলী কাঁপতে থাকল।

রতিকান্ত ততক্ষণে একটু সতর্ক হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে গায়ে পড়ে খবরা-খবর না নেওয়াই ভাল। উদাস দৃষ্টে কানাইকে খুঁজতে থাকলেন রাজপথে। কানাই এসে ঝাড়ু দেবে মেঝেয়। জীবাণুনাশক ওষুধ-মেশানো জল ছড়াবে। ধূপ-ধুনো দেবে। প্রেসক্রিপশানের কাগজ কেটে সুতোয় গাঁথবে। এখন কত কী খুচরো কাজ। শীতকাল বলে রুগী আসতে একটু দেরি হবে। ততক্ষণে তৈরি হওয়া দরকার।

মধুরবাবু চা খেয়ে ঢোলা কোটের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বের করে বললেন, 'চলবে নাকি ডাক্তার?'

রতিকান্ত গুম হয়ে বললেন, 'থাক। পরে।'

'রাত্তিতে আজ মন্দিরতলায় ছিলুম। চারদিক ঘেরা জায়গা।' মধুরবাবু বললেন। 'ভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গ পেয়েছিলুম, বুঝলে ডাক্তার? গঙ্গাসাগর থেকে পায়ে হেঁটে আসছে। সেই হিমালয়ে ফিরবে। বোঝো অবস্থা! ভোরবেলা চলে গেল লোটাকম্বল গুটিয়ে। আমায় জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন বেরিয়ে পড়লুম।'

রতিকান্ত হাসলেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'তাহলে রাত্তিরে শিবের প্রসাদ ভালই জুটেছিল?'

'হ্যাঁ।' খুশি মুখে জবাব দিলেম মধুরবাবু। 'দবিমচ্ছব যাকে বলে। এখনও চোখের অবস্থা দেখছ!'

'মারা পড়বে মধুরকেষ্ট!' রতুডাক্তার শাসনের স্বরে বললেন। 'তোমার লাংসের অবস্থা তো তুমি টের পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি।'

'তা তো পাবেই। তুমি ডাক্তার।' গলগল করে ধোঁয়া ছাড়লেন মধুরবাবু।

'তোমার ব্রেন পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে সাবধান। এরপর হাঁফানি ধরবে। তারপর বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'হোক না।' খিকখিক করে হাসতে লাগলেন মধুরবাবু। 'উন্মাদের বড় সুখ। যাকে খুশি ঢিল মারব। আমায় পায় কে?'

রতিকান্ত ভেতরে ঢুকলেন। কানাইয়ের জন্য অপেক্ষা করা আর

উচিত নয়। ঝিকে গিয়ে বলতে হবে। গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'রানু। ও রানু!'

রানু রতুডাক্তারের মেয়ে। তিন বোনের ছোটটি। বড় দুটিকে পার করেছেন। ছোটটি এখনও ফ্রকের বয়স পেরোয় নি। ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে রতিকান্ত ঝিকে পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর ঠিক সেই সময় কানাই হাজির। কানাই কাঁচুমাচু হেসে বলল, 'পথে একজায়গায় একটু দেরি করে ফেললুম ডাক্তারবাবু। মন্দিরতলার ওখানে গণ্ডগোল দেখে...'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বললেন, 'এখনও ছেলেমি তোমার যায়নি বাপু। কী গণ্ডগোল?'

'তিনচারজন সাধু এসেছে। রাত্তিরে কে ওদের কাছে শুয়েছিল। সাধুরা লোক জড়ো করেছে—সেই লোকটা নাকি টাকাকড়ি চুরি করে পালিয়েছে।'

রতিকান্ত দরজার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে মধুরবাবুকে বিঁধলেন। 'পুলিশে যাক না। অত কথা কিসের? যতঃ সব! নাও, নিজের কাজ করো।'

মধুরবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'শালারা তাই বলছে বুঝি? রাস্কেল কাঁহাকা! রোস, গিয়ে মজাটা দেখাচ্ছি! ইস! সাধু হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছে।'

বুদ্ধিমান কানাই টের পেয়েই মুচকি হেসে বলল, 'যান না! পুলিশে খবর চলে গেছে।'

মধুরবাবু বোঁচকা আর মগ নিয়ে একলাফে নিচে নামলেন। তারপর ডাক্তারের উদ্দেশে বললেন, 'এ কি বিশ্বাসযোগ্য কথা হল? তুই ব্যাটারা সংসারত্যাগী পুরুষ। তোদের আবার টাকাকড়ি? কৈ সে গুখেকোর ব্যাটারা? একটা-একটা করে চুলদাড়ি উপড়ে বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেব।'

বলেই তিড়িং বিড়িং করে হাটতে লাগলেন মধুরকৃষ্ণ। কানাই হাসতে হাসতে বলল, 'গেলে বিপদ বাধবে ওনার। ঠাকুরঘরে কে রে, আমি তো কলা খাইনি—সেইরকম হল। তাই না ডাক্তারবাবু?'

রতুডাক্তার বললেন, 'নিজের চরকায় তেল দাও। যাও, নিজের চরকায় তেল দাও।'...

ঘণ্টা দুই পরে রোগীর ভিড় ঠেলে কমলাক্ষের কনিষ্ঠপুত্র অরণি হাজির। 'ডাক্তারকা, মধুরদা আসেনি আপনার এখানে? শুনলুম সকালে...'

ডাক্তার দ্রুত বললেন, 'হ্যাঁ। তারপর তো মন্দিরতলায় যাচ্ছি বলে গেল। কী হয়েছে?'

অরণি ক্রুদ্ধভাবে বলল, 'পুলিশ গিয়েছিল আমাদের বাড়ি ওর খোঁজে। সাধুবাবাদের টাকা চুরি করেছে নাকি। ছ্যা ছ্যা, লোকটার জন্ম আর মানসম্মান রইল না আবাদের।'

রতিকান্ত নির্বিকার মুখে প্রেসক্রিপশান লিখতে লিখতে রুগীর পেট খামচে ধরে বললেন, 'ব্যথা ?'···

যার প্রতীক্ষায় কুড়ানি ঠাকরুন এতদিন অস্থির, সেই মানুষটি সাতসকালে এসে হাজির। একেবারে সেজেগুজে তৈরি হয়েই। ঢোলা কোট, পায়ে জুতোমোজা, মাথায় হনুমান-টুপি এবং বগলে কম্বলপত্র। বৃদ্ধার শীত চলে গেছে। মুখে অনর্গল বাঁকা-ছিরামপুরের কথা।

মধুরকৃষ্ণ একেবারে ঘরের ভেতর ঢুকে বসে আছেন। বলেছেন, 'কমলমামারা কেউ জানলে বাগড়া দেবে। যেতেই দেবে না। বড্ড ভালবাসে কি না। তাই বলছি, রনি মা আর অপু মা, যেন কাউকে বলো না আমার কথা। কেমন ?'

অপরূপার চায়ের নেশা আছে। বাজারে ডেয়ারির একটা খুচরো দোকান হয়েছে। সেখান থেকে দুধ এনে উঠোনের রোদে বসে চা খাচ্ছিল। কুড়ানি ঠাকরুনও একটু খান কদাচিৎ। রঙ্গনা পিঠে রোদ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল একটা ইংরেজি পত্রিকার ওপর। হাতে চায়ের গেলাস। আগের পত্রিকাটা ফেরত দিয়ে বিপাশার কাছে আরেকটা এনেছে। ভাগ্যিস, শতদ্রু কলকাতা গেছে। কদিন থাকবে সেখানে। সিঙ্গিবাড়ি অনেক দোনামনা করেই ঢুকেছিল রঙ্গনা। পত্রিকাটা তো ফেরত দিতেই হত। তবে শতদ্রুর তাদের বাড়ি যাওয়ার কথা বলেনি বিয়াসদিকে। গিয়েই বুঝেছিল, শতদ্রুও কথাটা বলেনি বোনকে।

মধুরকৃষ্ণ খিড়কির দোর দিয়ে চুপিচুপি ঢুকছিলেন। এরা হতচকিত একেবারে ···।

রাতের ট্রেনে নিমতিতে রওনা হবেন ঠাকরুনকে নিয়ে। দিনসবরে গেলে মামাবাড়ির লোকের চোখে পড়ে যাবেন যে। রঙ্গনা আপত্তি করে বলল, 'এই শীতের রাতে ? ঠাকুমা! তোমার মাথা খারাপ ?'

মধুরবাবু বললেন, 'কিছু অসুবিধে হবে না রে পাগলী মেয়ে। আমি রেলের লোক ছিলুম না বুঝি ? বুড়িমা গিয়েই দেখবেন। ট্রেনে টিকিট পর্যন্ত কাটতে হবে না। নিমতিতেয় নেমে বাকি রাত্তিরটা থাকবা অগস্ত্যিবাবুর কোয়ার্টারে।'

রঙ্গনা সন্দিগ্ধ স্বরে বলল, 'কে সে ?'

'স্টেশনমাস্টার। আবার কে ? আমার বুজম ফ্রেণ্ড। ভাবিস নে! কোনো

কষ্ট হবে না তোর ঠাকুমার।' মধুরবাবু সহাস্যে বললেন। 'ওঠা-নামায় রেলের লোকের সাহায্য পাব। আর আমি তো আছিই।'

অপরূপার ভাল লাগছিল না ব্যাপারটা। বলল, 'ঠাকুমার সবটাই মিস্‌ট্রিয়াস। না জেনে শুনে আন্দাজে কোথায় গিয়ে হন্যে হবে—বুঝবে ঠ্যালা। সেখানে এবয়সে আর না গেলেই নয়? এ্যাদ্দিন যেতে কী হয়েছিল?'

বৃদ্ধা এককথায় বললেন, 'আমি যাব।'

রঙ্গনা বলল, 'মধুরকাকা। ঠাকুমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যে যাচ্ছেন, পৌঁছে দেবে কে?'

মধুরবাবু এবার চিন্তিত-হয়ে বললেন, 'বাপের বাড়ি এতকাল পরে যখন যাচ্ছেন, বাবা না থাক, আত্মীয়স্বজন বংশধর সবাই আছে। তারা তো সহজে ছাড়বে না মা। কদিন থাকতে বলবে। এখন, আমি হচ্ছি গে আউটসাইডার। আমি কোন মুখে থাকব সেখানে—সেটাই প্রব্লেম।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'যাব, আর তক্ষুণি চলে আসব।'

রঙ্গনা বলল, 'সে কী! তাহলে যাওয়া কেন?'

'একবার চোখের দেখা দেখব।'

'ভ্যাট!' রঙ্গনা বিরক্ত হল। 'কাকে দেখবে শুনি? কে আছে তাও তো জানো না।'

বৃদ্ধা আস্তে বললেন, 'ভিটেটুকুন দেখব। তাতেই পুণ্যি ভাই।'

অগত্যা রঙ্গনা বলল, 'মধুরকাকা, তাহলে কিন্তু আপনার সব দায়িত্ব। নিয়ে যাবেন, আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। কেমন?'

মধুরবাবু বললেন, 'তাহলে আর কথা কী? প্রব্লেম ইজ সল্‌ভ্‌ড্‌।'

রঙ্গনা বলল, 'লাউশাকে মটরডাল রাঁধব। অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও আনবি। ঠাকুমাকে ভাল করে খাইয়ে দাইয়ে ব্রাইট করে বাপের বাড়ি পাঠাই। কী বলিস? আজ ঠাকুমাকে আমরাই রেঁধেবেড়ে খাওয়াই।'

অপরূপা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'কবেই বা থাকে।' রঙ্গনা রেগে গেল। 'টিউশনি করিস যে বড়। কী হয় সেগুলো?'

অপরূপা বলল, 'বাঃ! আমার খরচা নেই? কত জায়গা ছোটাছুটি করতে হয় না আমাকে?'

'বেশ। আমিই টিউশনি ধরব এবার।'

'ধরিস না কেন? তোকে কেউ মানা করেছে? এ্যাদ্দিন ধরা-উচিত ছিল।'

'তুই বকবি ভেবে ধরিনি।'

অপরূপা রেগে বলল, 'আমি বকব ? আমার বকার ধার ধরিস খুব! দিনরাত তো এপাড়া-ওপাড়া টোটো করে ঘুরে বেড়াস।'

বোনে-বোনে মাঝে মাঝে বেধে যায়। কুড়ানি ঠাকরুন হাসতে হাসতে ক্রাচ তুলে বললেন, 'অ লা মুখপুড়ীরা! এবার থাম দিকিনি। এক ভদ্দরলোক ঘরে বসে রয়েছে, খ্যাল নেইক তোদের ?'

ভদ্রলোকটি শুনছিলেন। বেরিয়ে এসে বললেন, 'বাজার করা নিয়ে ঝগড়া। আমার যে উপায় নেই, নৈলে যেতুম। বাজারে আজ প্রচুর মাছের আমদানি দেখে এসেছি। তবে যাই বলো, এ শীতের সময়টা ভেজেটিবেলসের স্বাদ অমৃত। পালংশাকে বড়ি, লাউশাকে মটরডাল—ইস! অবশ্য ফুলকপির সঙ্গে কইমাছও জমে ভাল। শীতের কই চর্বিতে জবজব করছে।'

রঙ্গনা গুম হয়ে গিয়েছিল। এবার বলল, 'ঠাকুমা আমি যাচ্ছি। পয়সা দেবে ?'

কুড়ানি ঠাকরুন পেটের ভেতর থেকে একটা পাঁচটাকার নোট বের করে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সব খচ্চা করিস নে যেন। দূরের পথ। আমার কাছে বেশি পয়সাকড়ি নেই।'

অপরূপা ভুরু কুঁচকে দেখছিল। বলল, 'রেখে দাও। আমার কাছে আছে।' সে তার ঘরে গিয়ে একটা পাঁচটাকা এনে রঙ্গনার হাতে গুঁজে দিল।

রঙ্গনা টাকাটা হাতে ধরে বলল, 'আমি পারি ওসব ? করেছি কোনোদিন ?'

'তুমি কিছুই পারো না।' অপরূপা টাকাটা কেড়ে নিয়ে থলে আনতে গেল। গজ গজ করে বলল ফের, 'পারো শুধু ইয়ে করতে।'

রঙ্গনা আহত দৃষ্টে তাকিয়ে রইল। দিদি কী বলতে চাইছে তার মাথায় ঢুকল না। মধুরবাবু ডেকে বললেন, 'অপুমা! যাচ্ছিস যখন, এক প্যাকেট সিগারেট আনবি। কেমন ? আহা, পয়সা আমি দিচ্ছি। এই নে।'

মধুরবাবুর তুই-তোকারি শুনতে রাজি ছিল না অপরূপা। ভাল করে চেনেও না ভদ্রলোককে। শুধু জানে কমলাক্ষবাবুদের বাড়িতে থাকেন। মাঝে মাঝে বই বেচতে আসেন রঙ্গনাকে।

কিন্তু এ মুহূর্তে তার মনে অন্য ভাব। ঠাকুমার জন্যে মনটা কেমন করছে। এতদিন সে তো ঠাকুমাকে এভাবে ভাবে নি। ভাবে নি ঠাকুমারও বাপের বাড়ি বলে কিছু থাকতে পারে—কতকাল সেখানে যাওয়া হয়নি ঠাকুমার।

ঝোঁকের মাথায় অপরূপা আরও কয়েকটা টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরুল।

অনেক—অনেকদিন পরে এই সচ্ছলতা সংসারে। এতরকম তরকারি, সত্যি সত্যি ফুলকপির সঙ্গে কই মাছ, কাটা রুই। কুড়ানি ঠাকরুন কবে হবিষ্যি এবং পালন-টালন করতেন, সবাই ভুলে গেছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাঁর জন্যে আলাদা করে নিরিমিষ রান্নার প্রশ্নই ওঠে না। গৌরবাবু যতকাল বেঁচে ছিলেন, সে একরকম গেছে—কালক্রমে অন্য একরকম অবস্থা সংসারে। নিয়ম মানা কঠিন। তবে তার মধ্যে যতটুকু পারা যায়। মাছ বাদ দিয়ে একটুকরো ফুলকপি মুখে করতেই হল। নাতনিরা নাছোড়বান্দা আজ। ঠেসে খাওয়াবার তালে ছিল। মুখে আর রোচে না কিছু, দাঁত অবশ্য আছে। প্রকৃতি একটা পায়ে ঘা মেরেছেন, কিন্তু অন্যদিকে যেন পুষিয়ে দিয়েছেন। এবয়সে চিবিয়ে খেতেও পারেন।

মধুরবাবুর খাওয়ার বহর দেখতে হয়। খেয়ে সটান অপরূপার খাটে গিয়ে গড়িয়ে পড়লেন। নিজের কম্বলটি চড়াতে ভুললেন না। একটু পরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলেন। রাতে ঘুমটা ভাল হয়নি—শিবের প্রসাদেও।

দুই নাতনি বৃদ্ধাকে এবেলা পিদিমের মতো ঘিরে রেখেছে। কুড়ানি ঠাকরুনের চোখে জল এসে গেল। এত ভালবাসা তো টের পাননি এতকাল। তাঁরই পয়সায় সংসার চলেছে। অথচ উল্টে তাঁকেই পাঁচকথা শুনিয়ে ছেড়েছে অনেক সময়।

শীতের বেলা পড়ে এল হু হু করে। রাত আটটা পাঁচের আগে চাপতে হবে। পাছা ঘষটে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করে বেড়ালেন কুড়ানি ঠাকরুন। পুরনো কাঠের সিন্দুকে কতবার হাত ভরে কত কী বের করলেন। আবার রেখে দিলেন। দুই বোন ঠাকুমার কাণ্ড দেখে হেসে খুন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রিকশো ডেকে আনল অপরূপা। কাচা থান পরে গায়ে গুটি সুটি একটা প্রাচীন কাশ্মীরী আলোয়ান জড়িয়ে কুড়ানি ঠাকরুন তৈরি। তাঁর মুখখানা লণ্ঠনের ম্লান আলোয় আজ ঝকমক করছিল। যৌবনে দারুণ সুন্দরী ছিলেন তাহলে—নাতনিরা অবাক হয়ে ভাবছিল।

রিকশোয় মধুরবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলেন। শুধু নাকটুকু জেগে রইল। ওঠার সময় হঠাৎ কুড়ানি ঠাকরুন দুহাতে দুই নাতনিকে জড়িয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। ক্রাচ পড়ে গেল। রঙ্গনা না ধরলে আছাড়ই খেতেন।

রঙ্গনার হাতে একটা ন্যাকড়ায় বাঁধা কিছু টাকাপয়সা গুঁজে দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, 'যাব—আর আসব। বুদ্ধি করে চালিয়ে নিও। গাছপালাগুলান দেখো। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরিও না। আর অপু, রনিকে একলা রেখে

কোথাও যেওনা। পই পই করে বলে যাচ্ছি। দুবোনে একত্তর থাকবে। একত্তর শোবে। আর অনি যদি আসে, তাকে আটকে রাখবে। আমার দিব্যি দেবে।'

রঞ্জনা ভিজে চোখে বলল, 'আমি যাই বরং স্টেশনে।'

মধুরবাবু দ্রুত বললেন, 'কী দরকার? রিকশোয় জায়গা হবে না।'

বৃদ্ধা বললেন, 'অপু একলা থাকবে।'

অপরূপা বলল, 'মধুরকাকা, প্লীজ লক্ষ্য রাখবেন।'

মধুরবাবু বললেন, 'কিচ্ছু বলতে হবে না। কিচ্ছু বলতে হবে না। রেসপনসিবিলিটি আমার।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'ভোরবেলা ছকু পাণ্ডা পুজোর ফুল নিতে আসবে। নিজে হাতে পেড়ে দিও। ওকে গাছে হাত দিতে দেবে না। তছনছ করবে। পয়সা চেও না। মাসকাবারি দিয়ে যায়। আর কেউ লাউটা শশাটা কিনতে এলে বুদ্ধি করে বেচো। না পারলে বলো, ঠাকুমা আসুক।'

দুইবোনে একসঙ্গে বলল, 'ছাড়ো তো ওসব কথা! দুর্গা দুর্গা দুর্গা!'

রিকশো অন্ধকারে মিশে গেল ঘন্টি বাজাতে বাজাতে। দুইবোন তবু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে।

শতদ্রুর পাত্রী দর্শন

বাবাকে শতদ্রু কোনোদিন তত আমল দেয় নি। এখনও তাই। কিন্তু মামাকে বড় সমীহ করে চলে। মামা ব্রজেন্দ্র দেখতে রাশভারি মানুষ হলেও অমায়িক প্রকৃতির। বি এন বোস এণ্টারপ্রাইজের মালিক তিনি। এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের দালালী, সরকারী এবং বেসকারী কোম্পানিতে অর্ডার সাপ্লাই, কখনও মাঝারি ধরনের কনসট্রাকশানের কাজে জীবন কাটিয়ে এখন অবসর নেবার তালে আছেন। তিন ছেলে চুটিয়ে বাবার কোম্পানি চালাচ্ছে। এখন দেশে ও বিদেশে নানা জায়গায় ব্রাঞ্চ খুলেছে। সদর অফিস চৌরঙ্গীতে এক বহুতল প্রাসাদের নবম তলায়। পাঁচবছর পরে শতদ্রু এতটা উন্নতি দেখে অবাক হয়েছে। তার মনে হয়েছে, এদেশে কিছু-কিছু লোক যেন এককেটি লাফে পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছে

এবং বাকি লোকেরা সমতলে জল-কাদায় পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। এ এক উদ্ভট অবস্থা।

ব্রজেন্দ্র আসলে ভাগ্নেকে ডেকেছিলেন কনে দেখতে। শতদ্রুর প্রকৃত গার্জেন তিনিই। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার করে মার্কিনমুলুকে পাঠানো পর্যন্ত সবেতেই তাঁর হাত আছে। এবার একখানা উৎকৃষ্ট স্ত্রীরত্ন ভাগ্নেকে জুটিয়ে দিলেই তাঁর দায়িত্ব শেষ।

ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চবিত্ত অত্যাধুনিক পরিবারের কনভেন্টেপড়া পাত্রীর সন্ধান। ব্রজেন্দ্র নিজের ছেলেদের বেলায় একাই করেছেন। কিন্তু তারপরই তিনি মত বদলেছিলেন। পরিবারের কর্তাহিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা তত সুখের হয় নি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁর অবচেতনায় যে আদর্শ ছিল, তার সঙ্গে মেলেনি বলে মনে মনে ক্ষুব্ধ ছিলেন। ঝোঁকের বশে বা পূর্বঅভ্যাসে ভাগ্নের বেলায় তাই করতে গিয়ে সামলে নিয়েছেন দ্রুত। সনাতন ভারতীয় আদর্শটি অবচেতন থেকে এই কয়েকটা দিনে চেতনে ফুটে বেরিয়েছে। তখন বিজ্ঞাপনের জবাবে যত চিঠিপত্তর এসেছিল, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ছুড়ে ফেলেছেন। একালে শুধু উচ্চবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত পরিবারেও যে এত ইংরেজি মাধ্যমে পড়া পশ্চিমী এটিকেট-দুরস্ত মেয়ে আছে, তলিয়ে ভাবেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ।

বিশ্বস্ত লোকজনের সূত্রে তিনটি পাত্রীর সন্ধান এসেছে। একটা ভাটপাড়ায়, একটা চুঁচড়ো অন্যটা বারাসতে। বনেদী রাঢ়ী কায়স্থ পরিবার সবাই। মোটামুটি পয়সাকড়ি আছে। পাত্রীরাও অসাধারণ সুন্দরী। দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা। রন্ধনপটিয়সী, গৃহকর্মনিপুণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রারম্ভিক যোগাযোগের পর শতদ্রুকে ট্রাংককল করেছিলেন ব্রজেন্দ্র। বসন্তপুরে বছর দুই হল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ হয়েছে।

শতদ্রু আসার পর ব্রজেন্দ্র ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন। 'দেখ বাপু, স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা এসব কথা মুখে যতই বলি, তত্ত্বহিসেবে শুনতে যতই ভাল লাগুক, মানুষের বাস্তব জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। প্রকৃতি এমন অসম করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ নাচার। স্ত্রীলোকের শিক্ষা বলো, স্বাধীনতা বলো, তার রীতিটা পুরুষের নকল হবে কোন যুক্তিতে? পুরুষের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ পুরুষ হওয়া আর মেয়েদের শিক্ষার লক্ষ্য হবে আদর্শ মেয়ে হওয়া। তেমনি উভয়ের স্বাধীনতাও থাকবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে। পুরুষ মদ্যপান করে রাস্তায় মাতলামি করতে পারে, মেয়েদের তা সাজে না। পুরুষ প্রয়োজনে মানুষ খুন করতে পারে। মেয়েরা তা করবে কোন মুখে? তাছাড়া একেকজনের শারীরিক শক্তি সামর্থ্য একেক ক্ষেত্রে

প্রকাশ পায়। মেয়েদের পুরুষ হয়ে ওঠাটা বড় বিপত্তিকর। জীবনে দুঃখকষ্ট আসে ওতে।...'

বক্তৃতাটি অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ হল। শতদ্রু মামার মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার সায় ছিল। ফাঁক পেয়ে সে বলল, 'আমি সম্পূর্ণ একমত মামাবাবু। এতদিন ধরে চোখের সামনে ওয়েস্টের লাইফ তো দেখলুম। ট্র্যাজিক! এখন ওরা—মানে পুরুষরা দুঃখ করে বলছে, এটা ঠিক হয়নি। কিন্তু সমাজের গতি তো উল্টোদিকে ঘোরানো যাবে না। ওদের পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন একেবারে দেউলিয় হয়ে গেছে।"

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীবুদ্ধিকে ভয়ংকরী বলা হয়েছে।' বলেই গলার স্বর চাপলেন। শতদ্রুর মামী সবিতা অদূরে বসে বাসি কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছেন। এক নাতনি পিঠে সেটে দুহাতে গলা জড়িয়ে রয়েছে। ব্রজেন্দ্র বললেন, 'এখানেও ওয়েস্টের বায়ু প্রবল। মফস্বলে এখনও সেটা কম। গ্রামে তো নেই-ই। তবে তোমার সঙ্গে মানসিক আদানপ্রদানের ক্ষমতাটা দেখতে হবে। একেবারে গ্রাম্য হলেও চলবে না, আবার

শতদ্রু ঝটপট বলল, 'গ্রামেও আছে। মানে থাকতে পারে আজকাল তো আর সেরকম গ্রাম নেই। আমাদের বসন্তপুরের কথাই ভাবুন না।'

মামা-ভাগ্নেয় এ নিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্তা চলতে থাকল সে-বেলা।

পরদিন থেকে পাত্রীদর্শন শুরু হল শতদ্রুর। প্রথমে ভাটপাড়া, তারপর বারাসত, শেষে চুঁচুড়া। ব্রজেন্দ্রর এক হিতৈষী বন্ধু, এক বেয়াই এবং তাঁর কোম্পানির যে কর্মচারী-ভদ্রলোক এসব সন্ধান দিয়েছেন, তিনি—এই তিনসঙ্গী এবং স্বয়ং পাত্র শতদ্রু।

গার্জেনরা তাড়া দিলেও কোনো পাত্রীকে কোনো প্রশ্নই করল না শতদ্রু। সে মিটিমিটি হাসছিল শুধু। চুঁচুড়া থেকে শেষ দেখার পর রাত্রে ব্রজেন্দ্র ভাগ্নেকে মতামত জানতে চাইলেন। মামীর সামনে সংকোচ হতে পারে ভেবে ব্রজেন্দ্র শতদ্রুকে একান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শতদ্রু হেসে বলল, 'আচ্ছা। ভেবে দেখি।'

'দেরি কোরো না।' ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তোমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তার আগে শুভকাজ শেষ করা চাই। বউমা না হয় পরে যাবে। সব ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দেব'খন। নিউইয়র্কে আমাদের নতুন অফিস হচ্ছে শিগগির। সেখানে লোক যাবে। ছোটকুও যেতে পারে। তার সঙ্গে বউমা যাবে। অসুবিধে কিসের?'

শতদ্রু শুধু হাসল।

ব্রজেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এ হাসিতামাশা নয় বাপু। এ লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ কোশ্চেন। নাকি কোনোটাই পছন্দ হল না? তাও বলো খুলে। আবার খোঁজখবর নেব বরং।'

এবার শতদ্রু আস্তে বলল, 'ধরুন, যদি গ্রামেই পছন্দমতো মেয়ে থাকে, আপনি কি আপত্তি করবেন?'

ব্রজেন্দ্র ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'গ্রামে। কোন গ্রামে? কোথায়?'

'বসন্তপুরে।' বলে শতদ্রু চোখ নামাল নিজের হাঁটুর দিকে।

ব্রজেন্দ্র চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন। 'তোমাদের বসন্তপুরে? সে কী! কোন বাড়ির মেয়ে? কেমন অবস্থা?'

শতদ্রু সংকোচে হাসল। 'অবস্থা ভাল না। ভীষণ গরীব।'

ব্রজেন্দ্র হো হো করে হেসে উঠলেন। 'তা ভাল। গরীবের কন্যাদায় উদ্ধারে আপত্তি নেই। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা?

'শুনেছি কলেজে বছরখানেক পড়েছে।'

'হুঁ। তোমার সঙ্গে শিক্ষাগত ব্যবধান বড্ড বেশি হয়ে গেল না?'

'না।' শতদ্রু তার স্মার্টনেস ফিরে পেল। মুখ তুলে ফের বলল, 'না। শি ইজ অলরাইট। ইংরেজি বইটই পড়াশোনা করে। মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল।'

'তোমাদের ফ্যামিলির দিক থেকে অসুবিধে হবে না তো? শুনেছি গ্রামাঞ্চলে বড় দলাদলি। তোমার বাবার আপত্তি না থাকলেই হল।'

শতদ্রু গলার ভেতর হেসে বলল, 'ভীষণ হবে। তাছাড়া...'

'তাছাড়া?' ব্রজেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ভাগ্নেকে দেখতে থাকলেন।

'ওরা কুলীন ব্রাহ্মণ। মুখার্জি।' শতদ্রু শুকনো হাসল। 'আমরাও তো কুলীন কায়স্থ।'

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'কলকাতা মেট্রপলিটন সিটি। এখানে আজকাল এসব জলচল। কিন্তু বসন্তপুর তো আদতে গ্রাম। মেয়ের গার্জেন কে?'

'গার্জেন তেমন কেউ নেই। এক বৃদ্ধা ঠাকুরমা আছেন। ভদ্রমহিলার একটা ডিফেক্ট আছে। ক্রাচে চলাফেরা করেন। তবে তাঁর আপত্তি হবে বলে মনে হয় না।'

'দেখ বাপু! গ্রামসমাজ সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। জানাশোনা যেটুকু, তা কতকটা ইনডিরেক্টলি। কতকটা তোমাদের বাড়ির লোকের কাছে।' ব্রজেন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন। 'তোমাদের বসন্তপুরে আমি,

যদ্দুর মনে পড়ে, সর্বসাকুল্যে বারতিনেক গিয়ে থাকতে পারি। তার বেশি নয়। এখন ধরো, তোমায় মেয়ে দিয়ে ওদের ফ্যামিলি বিপদে পড়লেন। তখন? তুমি তো বাইরে সাতসমুদ্দুর তেরনদীর পারে রইলে। ধরো, বৃদ্ধা ওই ঠাকুরমা মারা গেলেন। তখন?'

শতদ্রু আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'হ্যাঁ—সেসব কথাও ভেবে দেখেছি। আরও একটু খুলে বলি আপনাকে। মেয়ের দিদি আছে—সে গ্রাজুয়েট। এখনও বিয়ে হয় নি।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তাহলে তো আরও প্রব্লেম। তার বিয়েতে অসুবিধে হতে পারে।'

'সে আমি দেখব। স্টেটসে আমার জানাশোনা অনেক বাঙালী ছেলে আছে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'কে জানে বাপু। আমার তো ভাল ঠেকছে না। পাত্রীর বয়স কী রকম?'

'নাইনটিন।'

'হুঁ।' ব্রজেন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আমার দিক থেকে বাধা নেই। থাকা উচিত না। বাধা যদি আসে তো দেখবে তোমার বাবার দিক থেকে। তোমরা একসময়কার জমিদার ফ্যামিলি। তোমার বাবার যথেষ্ট মানমর্যাদা আছে ওই অঞ্চলে। তুমি তাঁর একমাত্র ছেলে। হাইলি কোয়ালিফায়েড। তোমার সম্পর্কে কেষ্টদা আর শমুর একটা বড়রকমের এ্যামবিশান থাকা স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তুমি ওখানে বিয়ে করে বসলে...'

কথা কেড়ে শতদ্রু বলল, 'প্লীজ মামাবাবু। আপনি বাবা-মাকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনার কথা ওঁদের অস্বীকার করা একেবারেই অসম্ভব। আপনি তো জানেন সেটা।'

ব্রজেন্দ্র বারবার গোঁফে হাত বুলোতে থাকলেন।

শতদ্রু বলল, 'মামাবাবু!'

ব্রজেন্দ্র একটু হাসলেন। 'রোসো! দেখি কী করা যায়।'

শতদ্রু উঠে পড়ল। তখন ব্রজেন্দ্র তাকে ডাকলেন। 'তুমি কি পাত্রী কিংবা তার ঠাকুমা কিংবা তার দিদি—কাউকে কিছু বলেছ ইতিমধ্যে? কোনো কথা দিয়েছ কি?'

শতদ্রু বলল, 'না।'

ব্রজেন্দ্রও উঠলেন। 'এসব কথা বললেও পারতে আমাকে। খামোকা

অত ছুটোছুটি করলুম। ওঁদের মনে আশা জাগালুম। তুমি বাপু এখনও আদৌ স্মার্ট হতে পারো নি। শহরে কাটালে ছেলেবেলা থেকে। তারপর সায়েবদের দেশে এতগুলো বছর থাকলে। তবু গেঁয়ো রয়ে গেলে মনে মনে। তুমি ভারি অদ্ভুত ছেলে সাটলেজ।'...

মামার প্রতি বরাবর আস্থা আছে শতদ্রুর। মামাকে সে সুবিবেচক এবং স্নেহশীল বলে জানে। এও লক্ষ্য করেছে, নিজের ছেলেদের তুলনায় তার প্রতি ব্রজেন্দ্রের ঈষৎ পক্ষপাত আছে যেন। তাই সে ধরেই নিল, ব্রজেন্দ্র মুখে যাই বলুন, তার ইচ্ছাপূরণে পিছপা হবেন না শেষ পর্যন্ত। যা বলবেন, তা মেনে নিতে দেরি করবেন না।

বিকেলে ব্রজেন্দ্রর কনিষ্ঠ পুত্র অপূর্ব ফোন করল শতদ্রুকে।.. 'সাটু, কী করছিস এখন?'

শতদ্রুর সমবয়সী এবং সহপাঠী সে। চার্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট। মামাতো ভাই হলেও যে বন্ধুত্ব হবে না এবং পরস্পর ফষ্টিনষ্টি, এমন কী অশ্লীল রসিকতাও চলবে না পরস্পর, তার মানে নেই। দুজনেই ছাত্রজীবনে পরস্পরকে জানিয়ে একটু-আধটু প্রেমের ভান করেছে কিছু-কিছু বোকা ও আবেগ সর্বস্ব মেয়ের সঙ্গে। শতদ্রু অবশ্য অপূর্বের মতো চৌকস ছিল না। ঘাবড়ে যেত এবং পিছিয়ে আসত। অপূর্ব ছিল বেপরোয়া।

শতদ্রু বলল, 'কিচ্ছু না। ভাবছি, কী করব।'

'কাছাকাছি পিতৃদেব আছেন নাকি?'

'না। কেন?'

'কতগুলো মাল দেখলি বে?'

'এই! কী মাস্তানি করছিস! চেম্বারে তোর পি এ মহিলাটি নেই বুঝি?'

'আছে। শুনছে এবং হাসছে।'

'ইনডিয়ানরা যথেষ্ট এগিয়েছে বোঝা যাচ্ছে।'

'শোন্। আর একটু এগোনো যেতে পারে। এক্ষুনি চলে আয়।'

'কী ব্যাপার?'

'তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাব। দারুণ জমবে।'

'কোথায় রে?'

'তোর জন্য মা—সরি, মেয়ে দেখতে।'

'কী যাতা বলছিস!'

'বাবার কেলোর কীর্তি তো দেখলি। এবার আমার পেঁচোর কীর্তি দেখে নে। আয় শিগগির!'

'আঃ, খুলে বল্ না বাবা!'

'একটা ককটেল পার্টিতে যাব। সঙ্গীসহ নেমন্তন্ন। কাজেই তোর…'

'তোর পি এ-কে নিয়ে যা।'

'বুদ্ধু কাঁহেকা! চলে আয় বলছি। গাড়ি যাচ্ছে, রেডি হ।' অপূর্ব ফোন রেখে দিল।

মিনিট কুড়ি পরে শতদ্রু অপূর্বর চেম্বারে পৌছুল। পাঁচটা বেজে গেছে। অফিস প্রায় ফাঁকা। অপূর্ব চেম্বারে বসে আরাম করে কান চুলকোচ্ছিল। সুন্দরী পি এ-কে দেখতে পেলনা শতদ্রু।

অপূর্ব ঘড়ি দেখে বলল, 'আর মিনিট কুড়ি পরে বেরুব। বস্। কফি খা।'

শতদ্রু বলল, 'আমাকে খামোকা কোথায় নিয়ে যাবি? তুই বরাবর বড্ড মিসট্রিয়াস অপু।'

অপূর্ব মুচকি হেসে বলল, 'তোর মাইরি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোকে ওইভাবে বাঁদর নাচিয়ে বেড়ালেন বাবা, আর তুইও দিব্যি নাচলি। কোনো মানে হয়?'

'ছাড়্ ওসব কথা।'

অপূর্ব বলল, 'এই সিসটেমটাই যাচ্ছেতাই অড। ভেরি ক্রুড অলসো। সেজেগুজে একটা মেয়ে এসে বসে থাকবে। তাকে চারদিক থেকে একদল ওল্ড হ্যাগার্ড খামচাবে। কাতুকুতু দেবে। আর তুই ভ্যাবলার মতো তাকাবি। পুরো ব্যাপারটা তোর ইনহিউম্যান মনে হয় নি?'

'হয়েছে তো।' শতদ্রু একটু হাসল। 'তাই মামাবাবুকে জানিয়েও দিয়েছি, চলবে না।'

'পেরেছিস? অসম্ভব।'

'বিশ্বাস কর।'

অপূর্ব হাত বাড়িয়ে বলল, 'হাতে হাত দে। তুই তাহলে নমস্য!' অপূর্ব হো হো করে হাসতে লাগল।

শতদ্রু বলল, 'কে পার্টি দিচ্ছে রে? কোথায়?'

'পার্টি আসলে আমরা দিচ্ছি—বেনামে। গ্যাঞ্জেস এডভারটাইজিংয়ের নামে। সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রির এক বড় চাঁইকে কিঞ্চিৎ পিচ্ছিল করার চেষ্টা আর কী—যাতে সময়মতো ব্যাম্বুটি প্রদান করা যায়।'

অপূর্বর কথাবার্তার ধরণই এরকম। শতদ্রুর মনে হল, অপূর্ব আরও ধূর্ত হয়েছে। চোখে-মুখে ধার চকচক করছে। বড় ভাইয়ের তুলনায় এবয়সেই দারুণ মুটিয়েও গেছে সে। সেই সঙ্গে নিজের স্ত্রী রুমাকেও খানিকটা গোলগাল করে ফেলেছে যেন। আমেরিকা থেকে কলকাতা পৌঁছেই মামার বাড়ি উঠেছিল শতদ্রু। তখন দেখেছে। এবার এসে দেখল রুমা নেই। গোয়া বেড়াতে গেছে সকন্যা কোন আত্মীয় বাড়ি। অপূর্ব দ্রুত মেয়ের বাপ হয়েছে দেখে শতদ্রুর অবাক লেগেছিল।

কাছাকাছি একটা বড় হোটেলে ককটেল পার্টি। শতদ্রু হতাশ হল পার্টির হালচাল দেখে। মহিলার সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়। বেশির ভাগই মধ্য-যৌবনা। মৃদু অর্কেস্ট্রার শব্দ। কেউ নাচে না। হাতে গ্লাস আছে, হাসিও আছে—কিন্তু সবমিলিয়ে থমথমে গুরুগম্ভীর পরিবেশ। শতদ্রুর দিকে সবারই চোখ পড়ছে অবশ্য। অপূর্ব আলাপ করিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু শতদ্রুর কথা বলতে ভাল লাগছে না। বরং তার হাস্যকরই লাগছে। পশ্চিমের এই নকলিয়ানা তার পক্ষে সহনীয় ও আনন্দদায়ক হতে পারে, যার জীবনে আসলটা দেখার' সুযোগ হয় নি। মনে পড়ছিল, আরবানায় এক মার্কিন বুড়ো তাকে হাসতে হাসতে বলছিল, 'ইওর গ্র্যাণ্ড হোটেল ইজ নট সো গ্র্যাণ্ড।'

ককটেল পার্টি মানেই উদ্দাম নাচ, বাজনা, হাসি। অবাধ চাঞ্চল্য। প্রচুর স্বাধীনতা। রাত যত বাড়বে, তত উদ্দীপনা বাড়বে। সদ্যচেনা যুবতীর গণ্ডদেশে আচমকা চুম্বনে ছড়িয়ে পড়বে ঘরভরা হাসির স্ফুলিঙ্গ। কেউ কার্পেটে পা ছড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় হাত রাখবে কোনো মহিলার উরুদেশে। তাই বলে কেউ মাতলামি করবে না। মাতলামির জন্য কেউ পার্টিতে যায় না। পার্টিতে কিছু-কিছু শিষ্টাচার আছে। সবাই তা মেনে চলবে। কিন্তু এ সব কী?

শতদ্রুর মদ্যপানের অভ্যাস নেই। তবে একটু-আধটু খেতে আপত্তি করে না। লাইম দেওয়া জিন নিয়েছিল। একটু পরেই মাথা ধরেছে মনে হল। অপূর্ব চরকির মতো এখান থেকে সেখানে ঘুরছে। শতদ্রু এককোনায় গিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে, তখন সে এক যুবতীর কাঁধে হাত রেখে তাকে নিয়ে এল। 'এর কথা তোকে বলেছিলুম—সোমা সিন্‌হা। কথক নৃত্যে এখন ইণ্টারন্যাশানাল ফেম—মাইণ্ড ছ্যাট, এ বয়সেই।' অপূর্ব ঈষৎ মাতাল হয়েছে।

এর কথা অপূর্ব তাকে আদৌ বলেনি। তবু শতদ্রু বাধা দিল না। সোমা তাকে মার্কিন ঢঙে 'হাই' সম্ভাষণ করল। শতদ্রুও বলল, 'হাই!'

অপূর্ব বলল, 'শতদ্রু সিনহা। আমার পিসতুতো ভাই। কিন্তু ছাত্রজীবনে আমরা একসঙ্গে প্রেম করতুম।'

সোমা বলল, 'প্রেমিকা নিশ্চয় একজনই ছিল?'

অপূর্ব বলল, 'তা আর বলতে?'

শতদ্রু লক্ষ্য করল সোমা অদ্ভুত উচ্চারণে বাংলা বলছে ঠোঁটের ডগায়। এটাই এদেশে রীতি অবশ্য—সে জানে। অপূর্ব তক্ষুনি অন্য কোণে দৌড়ে গেল। তখন শতদ্রু বলল, 'দেন ইউ আর এ ড্যান্সার!' সে ইচ্ছে করেই মারকিন ঢঙে ইংরেজি বলতে থাকল। পান্ট্ কে প্যান্ট, কিংবা ফাস্ট্‌কে ফ্যাস্ট্।

সোমা ইংরেজি বলতে পেরে যেন স্বস্তি অনুভব করল। অপূর্ব তাকে শতদ্রুর পরিচয় আগেই দিয়েছে। সে জানাল, আমেরিকার কোথায়-কোথায় নেচেছে। আরবানার কাছে চিকাগোতে গত সেপ্টেম্বরে নেচেছে শুনে শতদ্রু খুশি হল। আসলে সে আমেরিকার প্রেমে পড়ে গেছে। সেখানকার কথা পেলে জমে ওঠে।

রাত আটটায় ছাড়াছাড়ি হল অপূর্বের পুনরাবির্ভাবে। পার্টি শেষ হয়েছে। সোমা বলল, 'খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে কথা বলে। আবার দেখা হতে পারে—ইফ ইউ উড লাইক ইট। অপূর্বদা, শিগগির ওকে নিয়ে আসুন না আমাদের বাড়ি। ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক পর্যন্ত আই্‌ এ্যাম ফ্রি। তারপর যাচ্ছি জ্যাপ্যান।'

শতদ্রুর মনে পড়ল, তার জাপানী বন্ধু মিনাকোর সামনে যতবার জ্যাপ্যান বলেছে, ততবার মিনাকো হেসে ঘুসি পাকিয়ে বলেছে, 'আই মাস্ট কিল ইউ। নট জ্যাপ্যান, বাট জা-পা-ন।'

ফেরার পথে গাড়িতে অপূর্ব বলল, 'কী? পছন্দ হল?'

শতদ্রু তাকাল ওর দিকে। 'কাকে? কিসের পছন্দ?'

'বুদ্ধু! সোমাকে।'

শতদ্রু হাসতে লাগল। 'বেশ স্মার্ট আর কী। স্লিম গড়নের মেয়ে আমাদের দেশে খুব কম চোখে পড়ে। রঙটাও মন্দ না। গায়ের রঙের ব্যাপারে আমি কিন্তু মেমসায়েবদের বেজায় অপছন্দ করি।'

অপূর্ব চোখ নাচিয়ে বলল, 'নাচের জন্য ওকে ফিগার ঠিক রাখতে হয়। তবে কী জানিস? নাচিয়েদের নিচের দিকটা সবসময় একটু মোটা হয়ে যায়—বিশেষ করে কথক জাতীয় নাচ যারা নাচে। ওপরকার সব মাংস যেন ঝাঁকুনির চোটে নিচে এসে জড়ো হয়।'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'যা বলেছিস। গুড অবজার্ভেশন!'

'যাই হোক, ছুঁড়িটাকে নিবি?'

'মাতলামি করিস না অপু।'

অপূর্ব বলতে থাকল, 'বনেদী বংশ। তোদের মতোই। ও কে জানিস তো? বলেনি সোমা? গ্যানজেস এডভার্টাইজিংয়ের মালিক মাখনলাল সিনহার মেয়ে। ওর মাও এসেছিল—লক্ষ্য রাখলে চিনতে পারতিস। শুনেছি ওই ভদ্রমহিলাই এ কনসার্নের উন্নতির মূলে। সোসাইটি লেডি বলতে যা বোঝায় আর কী।'

শতদ্রু চুপ করে থাকল।

অপূর্ব বলল, 'বাবা তো বাইরের ব্যাপার নিয়ে থাকে। মা মেয়ের জন্য চিন্তিত। দেশে-দেশে ধেই ধেই করে মেয়ের নেচে বেড়ানো পছন্দ নয়।'

শতদ্রু বলল, 'মায়ের কথায় নাচ ছাড়বে বলে মনে হল না।'

'না। নাচুক না।' অপূর্ব সিরিয়াস ভংগিতে বলল। 'নাচুক। কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধা থাক।'

'বাঁদর নাচ।' শতদ্রু বিরক্ত হল। 'সোমা তা চাইবে কেন?'

অপূর্ব বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'আরে ভাই, কত সোমা দেখা হয়ে গেল। মিসেস সিনহার সঙ্গে সামান্য কথা হয়েছে আমার। আভাস পেয়ে উনি লাফিয়ে উঠেছেন। বেশ তো! সোমা স্টেটসে থাকার সুযোগ পেলে ওখানে একটা অরগ্যানাইজেশন গড়ে তুলবে। কত স্কোপ পাবে। তারপর বুঝলি? মিসেস তোর সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন। তুই তখন সোমার সঙ্গে জমে আছিস। বললেন, এখন ওদের ডিসটার্ব করব না। পরে একদিন বাড়ি নিয়ে এস ছেলেটিকে।'

শতদ্রু নড়ে বসল। 'মাই গুডনেস! তাহলে সেই পেন্টেড মহিলা! আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছিলেন।'

'কী বললি? পেন্টেড মহিলা!' অপূর্ব খিকখিক করে হাসতে লাগল। 'দারুণ বলেছিস সাটু! অ্যামেরিকা গিয়ে তোর ব্রেন শার্প হয়েছে। বাঃ।'...

সে-রাতে ভাগ্নেকে নিয়ে খেতে বসলেন ব্রজেন্দ্র। অপূর্বও বসল। ব্রজেন্দ্রের খাওয়া সবার শেষে। এতবড় সংসারের খাওয়া-দাওয়া হতে সময় লাগে। সুপ্রশস্ত ডাইনিং হলে দুটো প্রকাণ্ড টেবিল, বারোটা সুদৃশ্য চেয়ার। বাণীব্রত এবং সুকুমার—অপূর্বর বড়দা ও মেজদা সস্ত্রীক এবং পুত্রকন্যাদের নিয়ে খাওয়া-দাওয়া আগেই সেরেছেন। রাতে এইরকম জমাট আসর বসে। দিনে এ সুযোগ হয় না। তাঁদের মা সবিতা নিরামিষ খান বলে আলাদা ব্যবস্থা। নিজের ঘরে বসেই খান। একটু একা থাকতে ভালবাসেন ইদানিং।

খেতে খেতে অপূর্ব শতদ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'বাপী, একটা কথা ছিল। বলতে পারি ?'

ব্রজেন্দ্র সহাস্যে বললেন, 'আপত্তি কিসের ?'

'সাটু তোমাকে বলেছে কি ওর কোনো পাত্রী পছন্দ হয় নি ?'

ব্রজেন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে আনমনে বললেন, 'হুঁ।'

'গ্যানজেসের মিসেস সিনহার মেয়েকে আশা করি তুমি চেনো।'

ব্রজেন্দ্র তাকালেন কনিষ্ঠপুত্রের দিকে।

অপূর্ব বলল, 'শতদ্রুর তাকে পছন্দ। ক্যান আই প্রসিড টু···'

শতদ্রু কী বলতে যাচ্ছিল, ব্রজেন্দ্রর কথায় থেমে গেল। 'সেই নাচুনী!'

অপূর্ব হাসতে লাগল 'বাপী, প্লীজ! অমন করে বলো না! শি ইজ চার্মিং!'

ব্রজেন্দ্র ঘাড় বাঁকা করে পাশে শতদ্রুর দিকে ঘুরে বললেন, 'কী হে? অপু কী বলছে ?'

অপূর্ব কড়ামুখে বলল, 'সাটলেজ! মুখ খুলবিনে। ঘুঁসি মারব। লেট মি ফেস বাপী।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তোমাদের জেনারেশনকে, সত্যি বলছি, আমি বুঝতে পারিনে। তোমরা কী ভাবো, কী করো, কী চাও—হোপলেস। আমাকে জিগ্যেস করার কী দরকার তাহলে ?'

'বাপী! বাপী! প্লীজ। ইউ আর ডিসটার্বড!'

ব্রজেন্দ্র কনিষ্ঠপুত্রের কথার ভংগিতে হেসে ফেললেন। 'আই অ্যাম অলরাইট। দেখ বাপু,' ভাগ্নের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যা করার ঝটপট করে ফেলো তাহলে। মাখন সিঙ্গির পয়সা আছে। আমার চেয়ে তালেবর লোক। কেষ্ট সিঙ্গিও কম যায় না। সব দিকেই উত্তম জুটি। কিন্তু মাইণ্ড ছাট, শি ইজ নাচুনী।'

"আর্টিস্ট বাপী, আর্টিস্ট! সোমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কোরো না। ইণ্টারন্যাশনালি রেপুটেড···'

অপূর্বর কথা কেড়ে শতদ্রু বলল, 'আমায় কিছু বলতে দিবি অপু ?'

'শাট আপ! যার বিয়ে, তার কিছু বলার নেই। দিস ইজ আওয়ার ইণ্ডিয়ান ফর্মালিটি। না বাপী ?'

ব্রজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বললেন, 'হুম!'

শতদ্রু বলল, 'কাল আমি বসন্তপুর যাচ্ছি, মামাবাবু।'

ব্রজেন্দ্র বললেন, 'সে কী!'

'আপনাকে যা বলার বলেছি। আর কিছু বলার নেই। এখন সবকিছু আপনার হাতে।'

ব্রজেন্দ্র কিছু বললেন না—কারণ, কথাটা বুঝলেন। অপূব রাগ করে বলল, 'ইডিয়ট! পন্তাবি।'...

অপমানিতার অভিমানে

অপরূপাকে বাইরে না গেলে চলে না। রঙ্গনা একা থাকবে এই নিরিবিলি বাড়িতে—তাই মধু ছুতোরের বউকে বলে যায়। ছুতোর বউয়ের কাজের শেষ নেই। সে পেনাকে পাঠিয়ে দিয়ে বলে, 'হ্যা গো বাবুদিদিরা! ওকে একটুখানি ন্যাকাপড়া শিখিও না বাপু। ওর মতন কত মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে আজকাল।'

রঙ্গনা একা থাকতে ভয় পায়। কিন্তু পেনীকে পড়ানোর ইচ্ছে এতটুকু নেই। পেনীরও নেই। রঙ্গনা নিজের পড়া নিয়েই ব্যস্ত। পেনা বারান্দার মেঝেয় কাঠি-কাঠি দুই পা ছড়িয়ে অ-আ ক-খ খুলে বসে থাকে শুধু। ওর মা এসে উঁকি মেরে দেখে যায়। ওই দেখেই সে খুশি। কুড়ানি ঠাকরুন তাড়াহুড়ো যাবার সময় তাকে কিছু বলে না গেলেও সে জানে তাকে কী করতে হবে। দু'বোনের খোঁজখবর নিয়ে যায় খিড়কির পথে। ঠাকরুনের মতো দর করে লাউ বেচে দেয়।

কিন্তু সাত-সাতটা দিন চলে গেল। কুড়ানি ঠাকরুনের খবর নেই। রঙ্গনা উদ্বেগে কাঁদো-কাঁদো মুখে বলে, 'কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কী হতে পারে বল তো দিদি?'

অপরূপা রাগ করে বলে, কী হবে? বাপের বাড়ি এনজয় করছে। আর আমরা ভেবে সারা হই না কেন?'

'একটা চিঠি দিলেও তো পারত।'

'লেখাপড়া জানলে তো? বাঁকা-শ্রীরামপুর নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, গোমুখ্যু ইডিয়টদের দেশ।'

'ও দিদি, মধুরবাবু?'

'কী হল মধুরবাবুর?'

'সে তো ফিরে আসবে। তার পাত্তা নেই কেন রে?'

অপরূপা খাপ্পা হয়ে বলে, 'আমি কেমন করে জানাব গাঁজাখোর কোথায় গাঁজা খেয়ে পড়ে আছে।'

দিনে কিছু বোঝা যায় না অতটা। রাত এলেই এই পুরনো এতকালের চেনা বাড়িটার চেহারা যেন বদলে যায়। বড় গা ছমছম করে দু'বোনের। উঠোনের দিকে তাকাতে পর্যন্ত ভয় করে দুবোনের। তারপর সারাটা রাত বারবার ঘুম ভেঙে যায়। একটু শব্দ হলেই এ ওকে ডাকে। অত যে কাঠ হয়ে এঘরে একা ঘুমোত অপরূপা, তার অবস্থা শোচনীয়। রঞ্জনা ঘুমজড়ানো গলায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'নিজেও ঘুমোবে না—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না।'

'কী একটা শব্দ হচ্ছে।' অপরূপা কান পেতে বলে।

রঞ্জনা ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে।

এক বাহাত্তুরে বুড়ি— যার একটা পা থেকেও নেই, সেই ছিল এবাড়ির শক্তি আর সাহসের উৎস। আশ্চর্য লাগে অপরূপার, এই ঘরে এ খাটে সে একা শুয়েছে এতকাল। এখন রাতবিরেতে এ ঘরের সব জীর্ণ ও তুচ্ছ আসবাব যেন জ্যান্ত হয়ে দাঁত কটমট করে। আয়নার দিকে তাকালে মনে হয়, আরও কাউকে দেখতে পাবে। আর সারা রাত খাটটার তলায় ঘুণপোকার কুট কুট খর খর অদ্ভুত সব শব্দ। মাথার ভেতর ঢুকে যেতে থাকে শব্দগুলো।

ঠাকুমা থাকার সময় কোথায় ছিল এসব শব্দ আর স্পন্দন, এত নড়াচড়া, উপদ্রব! বৃদ্ধা যেন সব অলৌকিক অনিষ্টকারীকে শাসনে রাখতেন। আমড়া গাছটায় পেঁচা এসে ডাকলেই ক্রাচ ঠুকে চেঁচাতেন, 'যাঃ যাঃ! দূর! দূর!' শরৎকালে পেয়ারা ডাগর হলে বাদুড়ের উৎপাত হত খুব। কুড়ানিঠাকরুনের কী বুদ্ধি! একটা ভাঙা টিনের ভেতর একটুকরো ইট পেনডুলামের মতো ঝুলিয়ে গাছের ডালে লটকে দিয়েছিলেন। তা, সঙ্গে লম্বা একটা দড়ি। দড়ির ডগাটা চৌকাঠের কোনার ফুটো দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালিতে বেঁধে শুতেন। বাদুড়ের শব্দ পেলেই পা নাড়তেন। ঢং ঢং করে শব্দ হত পেয়ারা গাছে। একেবারে নাকের ডগায় ওই বিচ্ছিরি আওয়াজে ভড়কে যেত বাদুড়গুলো। তক্ষুনি ডানা শনশন করে পালিয়ে যেত। শীতের সময়টা বাদুড়ের উপদ্রব আর নেই।

কিন্তু রাতের কিছু-কিছু শব্দ অলীক নয়, কোনো-কোনোদিন তা বোঝা যাচ্ছে। চোর এসে সেরা লাউটিকে মুচড়িয়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এক কাঁদি কলাও কে কেটে নিয়ে গেছে খিড়কির ঘাট থেকে। মধুর বউ এসে পস্তায়। গলা তুলে

শাসায় চোরকে।…'কার বাড়ি তা জানো না খালভরারা? তোমাদের এত সাওস যে কালু মুখুয্যের ভিটেয় পা ফেলো?'

সে অদূরে লোকজন দেখলে শুনিয়ে শুনিয়ে আকাশচেরা গলায় বলে, 'জানিনে বুঝি কোন নামুনের কাজ? সব জানি। ঠাকরুনদি নেই—ফিরুক। তা'পরে অনিবাবু ফিরুক। তখন বুঝবে। ছি ছি ছি, এই করে মানুষে?'

তারপর একই সুরে রঙ্গনার উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে, 'অনিবাবুর আজকালই ফেরার কথা না গো? হ্যাঁ—অপু তো বলছিল, আজ নয় তো কা'ল দাদা এসে পড়বে। কলকেতায় আছে।'…

দু'বোনই বিরক্ত হয়। আবার মজাও পায়। তারপর দুজনেরই মনে হয়, ঠাকুমা যখন আসবে আসুক, দাদা যদি হঠাৎ এসে পড়ে, কী ভাল না হবে! অনি থাকতে আর কিছু না হোক, সাহস ছিল প্রচণ্ড। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কোনো ছেলে ভুলেও ফচকেমির সাহস পেত না। এখন পেছনে শিস দেয়। কখনও টিপ্পনি। অপরূপার বেলায় যতটা না, রঙ্গনার বেলায় বেশি। রঙ্গনা মুখ নামিয়ে হন হন করে হেঁটে যায়। কান পাতে না।…

সেদিন বিকেলে অপরূপা বাড়ি ফিরে দেখল, পেনীকে নিয়ে রঙ্গনা খিড়কির ডোবা থেকে জল এনে গাছ-গাছালিতে সেচ দিচ্ছে। কোমরে আঁচল জড়ানো। পায়ে কাদা। উঠোনও ভিজিয়ে প্রায় কাদা করে ফেলেছে। সারা উঠোন কবে একসময় লাইমকংক্রিটে পোক্ত ছিল। কালক্রমে চাবড়া উঠে মাটি বেরিয়ে পড়েছিল। খঞ্জ মানুষ—আছাড় খেতেন কুড়ানি ঠাকরুন। তাই মুনিশ ডেকে দুরমুস করা হয়েছিল। তার ফলে উঁচু-নীচু গড়ানে হয়ে আছে অনেক জায়গা। বর্ষায় আর জল জমে না একটুও।

অপরূপা তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রঙ্গনা হাসল।…'কী রে? কী দেখছিস?'

'তোর কীর্তি। এই অবেলায় জল ঘেঁটে জর বাধালে দেখার সময় পাব না বলে দিচ্ছি।'

'সব শুকিয়ে চিমসে হয়ে গিয়েছিল যে!' রঙ্গনা আঙুল তুলে শিমের মাচান দেখাল। 'দেখছিস না, কেমন মিইয়ে গেছে। হরগৌরীর গাছটা পর্যন্ত নেতিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুমা এলে কী বলবে বল্ তো দিদি?'

অপরূপা হঠাৎ নড়ে উঠল। এই রনি! বলতে ভুলে গেছি।' সে চোখ বড় করে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল। 'জানিস? হরেনদা বলল মধুরবাবুকে নাকি কাল সন্ধ্যায় দেখেছে।'

রঙ্গনা বালতি হাতে থমকে দাঁড়াল। 'মধুরবাবু ফিরেছে ?'

'তাইতো বলল হরেনদা।' অপরূপা করুণমুখে বলল। 'কিন্তু আমার অবাক লাগছে, ভদ্রলোক এসে বলে যাবেন তো।'

রঙ্গনা ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'ইমপসিবল। হরেনদাটা গুলবাজ জানিসনে ? ফক্কুরি করেছে।'

'না রে। সিরিয়াসলি বলল। ঘেঁাতনের দোকানে চা খাচ্ছিল মধুরবাবু। হরেনদা দেখেছে।'

রঙ্গনা এবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তুই ভাল করে জিগ্যেস-টিগ্যেস করলিনে কেন হরেনদাকে ?'

'করলুম। একই কথা বলল।' অপরূপা নাক খুঁটতে থাকল।

রঙ্গনা বালতি রেখে বলল, 'আমি একবার যাই দিদি। হরেনদাকে ভাল করে জিগ্যেস করে ঘেঁাতনের কাছে খোঁজ নিই গে।

অপরূপা আস্তে বলল, 'থাক গে। সন্ধ্যের মুখে আর বেরুস নে।'

পেনীর ফ্রকে জলকাদা লেগেছে প্রচুর। সে নিষ্ঠার সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে মাচানের তলায় ঢুকে জল ঢেলেছে। অপরূপা হঠাৎ বলল, 'পেনী, তোর পিঠে ওটা কী রে ? কাছে আয় তো।' পেনী কাছে এলে সে একটা কাঠি কুড়িয়ে পেনীর পিঠ থেকে পোকা ফেলে দিল। পোকাটা দেখতে দেখতে বলল, 'রনি! এটা শুয়োপোকা নাকি দেখ তো!

রঙ্গনা একবার দেখেই বলল, 'নাঃ।'

পেনী পোকাটাকে পায়ের বুড়ো আঙুলে ঘষটে মেরে ফেলল। পেনী পোকা মারতে পেলে আর কিছু চায় না। এবাড়ি এলেই সে পোকা খুঁজে বেড়ায় গাছপালা লতাপাতায়। কুড়ানি-ঠাকরুনের সেটা অপছন্দ। তাড়া করে বলেন, 'অই! অই! আবার ওই নষ্ট স্বভাব ?' পেনী যদি বলে, 'ও ঠাকরুন, পাতা খাচ্ছে যে,' ঠাকরুন বলেন, 'খাবে না ? তুই খাসনে না ? খাক্।' এ কয়েকটা দিন কুড়ানি ঠাকরুণ না থাকায় পেনীর খুব আনন্দ। পোকামাকড় খুঁজে বের করে মনের সুখে মেরেছে। ঘাসফড়িং গাঙফড়িংকেও রেহাই দেয় নি।

রঙ্গনা মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। চুল আঁচড়াল।

একটু ক্রিম ঘষবে ভেবে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখল অপরূপা দাঁড়িয়ে আছে। একটু হাসল অপ্রস্তুত হয়ে। অপরূপা বলল, 'হরেনদাকে কি এখন পাবি ? নতুন কথাই বা আর কী শুনবি ভাবছিস ?'

রঙ্গনা সেই অপ্রস্তুত হাসি মুখে রেখেই বলল, 'বিয়াসদির কাছ হয়ে আসব। প ত্রকাগুলো পড়া হয়ে গেছে। বইটাও দিয়ে আসব রে দিদি।'

অপরূপা ওর আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বলল, 'এ বাম! তুই কি এই কাপড়েই বেরুবি নাকি?'

'ভ্যাট্!' রঙ্গনা বলল। 'কাপড় বদলাব তো! তুই যেন কা।'

শাড়ি বদলে মোটামুটি ভদ্র হয়ে রঙ্গনা পেনীকে নিয়ে বেরুল। অপরূপা পই পই করে বলে দিল যেন শিগগির ফিরে আসে। দরজায় গিয়ে ফের চেঁচিয়ে বলল, 'বিয়াসের ওখানে কখনো আড্ডা দিবি নে।' রঙ্গনা জানে, দিদি একা থাকতে ভয় পাচ্ছে আসলে।

হবেন জয়কালী ট্রান্সপোর্টের অফিসে কাজ করে। সেখানে গিয়ে রঙ্গনা শুনল, এইমাত্র কোথায় বেরিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ বলতে পারল না। অগত্যা কিছুক্ষণ পথ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল রঙ্গনা। তারপর টের পেল, ওপাশে পেট্রল পাম্পের সামনে নিচু দেয়ালে বসে কয়েকটি ছেলে তাকে লক্ষ্য করে কী বলছে আর হাসছে।

রঙ্গনা হন হন করে হাঁটতে থাকল। পেনী বলল, 'ও দিদি! আবার কোথা যাচ্ছ?'

রঙ্গনা ধমকাল। 'তুই থাম্ তো। চুপচাপ সঙ্গে আয়।'

অনেকটা হেঁটে ঘোঁতনের চায়ের দোকান। দোকান শুধু নামেই। একটা প্রকাণ্ড শিরিস গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে কাঠের টব। তার ওপর চায়ের সরঞ্জাম। পাশে কয়লার উনুন। সামনে ও একপাশে দুটো কাঠের বেঞ্চ। মাঝে মাঝে বোড়ের দফতরের লোকেরা এসে এ দোকান হটিয়ে দেয়। অধ্যবসায়ী ঘোঁতন ফের সাজিয়ে বসে। গুঁড়িতে অনেকগুলি টিনের টুকরো পেরেক দিয়ে আঁটা তাতে নানারকম বিজ্ঞাপন।

ভিড় দেখে রঙ্গনা একটু তফাতে দাঁড়াল। পেনীকে বলল, 'ঘোঁতনকে জিগ্যেস করে আয় তো পেনী, মধুরবাবুকে দেখেছে নাকি। শোন, দেখেছে বললে জিগ্যেস করবি, কখন দেখেছে।'

পেনী চলে গেল। রঙ্গনা দেখল, পেনী ঘোঁতনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘোঁতন তার দিকে ঘুরেও তাকাচ্ছে না। অনেক চেষ্টার পর পেনী তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তখন ঘোঁতন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু বলল। পেনী দৌড়ে চলে এল।

রঙ্গনা রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কী বলল রে?'

'বলল, আমি কি জানি নাকি ?' অপমানিতা পেনী করুন মুখে বলল।

'তুই বললিনে কেন, আমি জিগ্যেস করতে পাঠিয়েছি ?'

'কথা কানেই নিচ্ছে না থালভরা।'

মায়ের গালটা বেশ রপ্ত করেছে মেয়েটা। রঙ্গনা একটু ইতস্তত করে এদিকে তাকাল। পা বাড়াতে গিয়ে বলল, 'তোকে বলল জানে না ? মানে মধুববাবুকে দেখে নি ?'

পেনী বলল, 'ত' জানি না। বলল, আমি কি জানি নাকি ?'

রঙ্গনা বলল, 'বলেছিলুম না হরেনদাটা গুলবাজ। ঘোঁতনের কাছে চা খেলে বলবেনা কেন ? আয় পেনী, আমরা একটু সিঙ্গিদের বাড়ি যাই। তুই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি যাব আর আসব। কক্ষনো চলে যাবিনে যেন।'

আরও কিছুটা এগিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে আগাছার ভেতর একটা ভাঙা মোটর গাড়ি পড়ে আছে। তার ওপাশটা সাফ করে একদল ছেলে ব্যাডমিণ্টন খেলছে। ঘন ঘন করে পাক কাটিয়ে ছোট একটা রাস্তায় পৌঁছল ওরা। তারপর সিঙ্গিবাড়ির উঁচু পাঁচিল একটানা রাস্তার সমান্তরালে চলেছে।

বুগানভিলিয়ার ঝালরে ঢাকা সুন্দর লোহার রেলিং দেওয়া গেট। একটু ফাঁক হয়ে আছে। পাশে টুলে বসে আছে ওদের দারোয়ান বাহাদুর। রঙ্গনাকে দেখলে সে হেসে বলে, 'এস এস দিদি।' কিন্তু আজ কেমন নির্বিকারভাবে তাকাল। রঙ্গনা হাসিমুখে বলল, 'বিয়াসদি নেই ?'

বাহাদুর উঠে এসে বলল, 'নেই। কলকাতা গেছে। কিছু দরকার থাকে তো বলো।'

'এই বই কাগজগুলো দিতে এসেছিলুম।'

বাহাদুর হাত বাড়িয়ে বলল, 'তো দেও। আমি দিয়ে দেব।'

রঙ্গনা বই আর পত্রিকাগুলো দিয়ে প্রাঙ্গণের দিকে অন্যমনে তাকাল একবার। নুড়ি-বিছানো লনের দুধারে ফলবাগান। ডাইনে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় টেনিসকোর্ট করা হয়েছে। শতদ্রু বোনের সঙ্গে টেনিস খেলে। রঙ্গনা খেলাটা দেখেনি, শুনেছিল বিয়াসের কাছে। আর ওধারে বাড়ির পেছন দিকটায় একটা চারকোনা সুইমিং পুলের মতো জলাশয়। বাঁধানো ঘাট। ভারি সুন্দর পরিবেশ।

রঙ্গনা চমকে উঠল। দূরে ঘাটের ওপর বিপাশা এদিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে হেসে উঠল, 'বাহাদুরদা ! তুমি কেন মিথ্যে বললে গো ? ওই তো বিয়াসদি !'

বাহাদুর ঘুরে দেখে গুম হয়ে গেল। তারপর ভারি গলায় বলল, 'বিয়াসদিদির শরীর আচ্ছা নেই, বুখার হয়েছে। তাই মাইজী মানা করেছে, কারও সঙ্গে দেখা হবে না।'

'ভ্যাট। ডাকো না তুমি। নৈলে আমি ডাকছি।' রঙ্গনা পা বাড়াল।

বাহাদুর গেটের ফাঁকে পথ আটকে বলল, 'নেই দিদি। মানা আছে। তুমি এখন এস।'

রঙ্গনার দুই চোখ জ্বলে উঠল। 'আমারও যাওয়া মানা?'

'হাঁ। ওহি বাত।'

'আমার?' রঙ্গনার গলা শুকিয়ে গেল শরীর ভারি মনে হল।

বাহাদুর কথা বাড়াল না। গেট টেনে বন্ধ করে দিল। তারপর টুলে গিয়ে বসল।...

কিছুটা চলার পর পেনী অস্ফুটস্বরে গাল দিল, 'খালভরা!'

পেনীও বুঝেছে—অতটুকু মেয়ে। রঙ্গনা অনেক কষ্টে আত্মসম্বরণ করল। রাগে দুঃখে অপমানে তার মাথা ঘুরছিল। এমনটি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে নি। তার বারবার মনে হল, বিয়াসদি জানলে এভাবে তাকে অপমানিত হতে হত না। বিয়াসদি কিচ্ছু জানে না হয় তো।

কিন্তু কেন বিয়াসদির সঙ্গে দেখা করা বারণ, কিছুতেই রঙ্গনার মাথায় ঢুকল না। কিছুদূর যাওয়ার পর সে অনেকটা ধাতস্থ হল। শতদ্রু যদি তাদের বাড়ি আসে, ঠিক এমনি অপমান করবে। শতদ্রু কারণ জানতে চাইলে তখন মুখের ওপর জবাব দেবে। তবে বিপাশা তাদের বাড়ি কখনও যায় নি। তাকে অপমান করার সুযোগ হয়তো পাবে না। পথে দেখা হলে অন্য কথা। কিন্তু বিপাশা পথে ঘাটে বেরোয় খুব কদাচিৎ। যখন বেরোয়, বেশির ভাগ সময় গাড়ি করে যায়। গাড়ি থামিয়ে কথা শোনাবে রঙ্গনা—সে সহজ মেয়ে নয়।

কল্পনায় একবার শতদ্রু একবার বিপাশার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করতে করতে রঙ্গনা বাড়ি পৌঁছুল। পেনী একদৌড়ে সঙ্গছাড়া হল।

অপরূপা শেষবেলার ধূসর উঠোনে বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিল। সে বলল, 'কী রে?'

রঙ্গনা সঙ্গে সঙ্গে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর দৌড়ে অপরূপার ঘরে ঢুকে খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। তার শরীরের অর্ধাংশ ঝুলে রইল।

অপরূপা ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝল, তাহলে ঠাকুমারই কিছু দুঃসংবাদ আছে। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'রনি! ঠাকুমার কিছু হয়েছে?'

রঙ্গনা উঠে দাঁড়াল। তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত। হিস হিস করে বলল, 'ওই ছোটলোক সিঙ্গিরা দারোয়ানকে বলেছে আমাকে ঢুকতে দেবে না। এবার যদি শুনি, তুই ওদের ছায়া মাড়িয়েছিস দিদি, দেখবি তোর কী হয়!'

রঙ্গনা হাঁফাচ্ছিল। অপরূপা স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'তোকে ঢুকতে দিল না?'

'না।' রঙ্গনা চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই! তুই তো গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গিয়েছিলি লোকটার সঙ্গে!'

'রনি!' অপরূপা ধমক দিল। 'কী বাজে বলছিস!'

রঙ্গনা ভেংচি কেটে বলল, 'আমায় আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা করে দিন না শাটলেজদা, না কাটলেটদা! কে পটাচ্ছিল? আমি, না তুই?'

অপরূপা ওর গালে চড় মারল। 'অসভ্য! ইতর মেয়ে কোথাকার!'

রঙ্গনা চুপ করে গেল।

অপরূপা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'ফের যদি আজেবাজে একটা কথা বলেছিস, তোকে শেষ করে ফেলব। আমি পটাচ্ছিলুম, না তুই? কার কাছে এসেছিল? হতচ্ছাড়ী বাঁদর মেয়ে কোথাকার!'

রঙ্গনা বেরিয়ে গিয়ে বারান্দার পলেস্তারা ওঠা থামটা আঁকড়ে দাঁড়াল। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা ফুটে রয়েছে। চারপাশে গাছ-গাছালিতে পাখিরা তুমুল চেঁচামেচি করছে। দিন শেষ হয়ে গেল। হিম ঘনিয়ে আসছে। অপরূপা বেরিয়ে রান্নাঘরে গেল হেরিকেন জ্বালতে।

হেরিকেনটা বারান্দায় রেখে নিজের ঘরে লম্পটা নিয়ে গেল। তারপর ফিরে এসে শান্তভাবে বলল, 'বড়লোকের সঙ্গে এজন্যেই তো ভাব করতে নেই। বিয়াসের সঙ্গে কি আমি কখনও ভাব করেছি? দেখেছিস আমায় ভাব করতে? গায়ে পড়ে কথা বলত বলে আমিও বলতুম। ঠিক আছে। কাকে অপমান করেছে, এখন তো টের পাচ্ছে না। পাবে, দাদা যখন ফিরে আসবে। কালু মুখুয্যের নাতনিকে অপমান করার শাস্তি কী, তখন জানবে।'

বিপাশা ও অনি

শতদ্রুর সঙ্গে বিপাশার সম্পর্ক বরাবর একটু ছাড়া-ছাড়া। স্বাভাবিকভাবে শতদ্রুর সঙ্গ সে ছোটবেলা থেকে খুব কম পেয়েছে। শতদ্রু অতকাল বিদেশে ছিল, তাতেও বিপাশার কিছু যায়-আসে নি। বিপাশার স্বভাব হল একলা থাকার। শতদ্রু বিদেশ থেকে ফিরলে সে কিছুদিন হইচই করতে চেয়েছে দাদাকে নিয়ে। তারপর আবার যেমন ছিল তেমনি।

কেন যেন রাগ করেই শতদ্রু আবার কলকাতা চলে গেল। এই তো ক'দিন আগে গিয়েছিল, ফিরে এল হাসি মুখে। রাত্তিরটা আর সকালটা থাকল। আবার চলে গেল। বিপাশার মনে হয়েছিল, ওর বসন্তপুরে থাকতে ভাল লাগে না। একেবারে মন টেঁকে না বলেই বারবার কলকাতা পালায়।

কিন্তু বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে, বিপাশা পরে আঁচ করল। এমনিতে এতবড় বাড়িটা ভুতুড়ে লাগে। ওপরে-নিচে এতগুলো ঘর। বাস করার মানুষ নেই। মাঝে মাঝে আত্মীয়স্বজন এলে যা একটু ভিড়, হইচই তারপর আবার সব নিঃঝুম। চওড়া কাঠের সিঁড়িতে পুরনো আমলের কার্পেট পাতা আছে। দেয়ালে ঝুলছে বড় বড় বিলিতি পেন্টিং। অনেক রাতে বিপাশার মনে হয়, সেই সিঁড়িতে ছবির লোকেরা হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে হলঘরে, হলঘর থেকে আবার ওপরে। তারপর খালি ঘরগুলোর ভেতর কেমন চাপা শব্দ। রাতে হাওয়া দিলে বাড়িটার ভেতর অদ্ভুত শব্দ হতে থাকে। বিপাশা বারবার চমকে ওঠে। তবু প্রাণ গেলেও বলবে না সে ভয় পাচ্ছে।

শতদ্রু ফের কলকাতা গেলে বাড়ির গুমোট ভাবটা আরও ঘন হল যেন। বাবার মুখ গম্ভীর। একটুতেই চাকর নাকর লোকজনকে তিরিক্ষি মেজাজে হেঁড়ে যাচ্ছেন। মায়ের চালচলনও তেমনি হঠাৎ বদলে গেছে। মুখে হাসি নেই। কথা বলছেন কম। বিপাশার চোখে পড়ল একটু করে ভাবল মাকে জিগ্যেস করবে কী হয়েছে। কিন্তু পরে মনে হল, কী দরকার কোথায় কী ঘটেছে, তার সঙ্গে বিপাশার সম্পর্ক কিসের?

রাতে বিপাশা শুনেছিল কলকাতা থেকে মামাবাবু ফোনে বাবার সঙ্গে কথা বলছেন। বাবাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছিল। বিপাশা বিরক্ত হয়ে টেপ-রেকর্ডারের আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে শমিতা ডাকছিলেন, 'বিয়াস! ঘুমোলি নাকি?'

বিপাশা সাড়া দেয় নি।

মাঝে মাঝে মা বাবা, সংসারের সব মানুষজনের বিরুদ্ধে বিপাশার একটা তীব্র ক্রোধ জেগে ওঠে। কী বিরক্তিকর ওঁদের আচরণ! কী একঘেয়ে জীবনযাপন! খাওয়া দাওয়া ঘুম টাকা—বড় উদ্ভট এই জীবনধারণ। কাকেও খ্যা খ্যা করে হাসতে দেখলেই বিপাশার পিত্তি জ্বলে যায়। কখনও মনে হয়, বিশ্ব-সুদ্ধ লোক যেন তাকে ইশারা করেই কিছু বলছে—অথবা কিছু করার তালে আছে। প্রতিটি মুখে ষড়যন্ত্রের ভ্রূকুটি। চারদিকে চক্রান্ত।

চক্রান্ত।

মা ও বাবা চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন। বিপাশাকে দেখে থেমে গেলেন। কৃষ্ণনাথ বললেন, 'বাইরে বেরুচ্ছিস নাকি? ঠাণ্ডা লাগবে যে। গায়ে কিছু জড়িয়ে নে।'

মা বললেন, 'মালাকে খবর দিলে এসে খেলত। টেনিসকোর্ট করা হল অত যত্ন করে, খালি পড়ে আছে।'

বিপাশা চুপচাপ নেমে গেল।

চারকোনা পুকুরটাকে কেন মা সুইমিং পুল বলে, বিপাশার রাগ হয়। আগের আমলে নাকি কলকাতা থেকে ঠাকুর্দার সায়েব বন্ধুরা বেড়াতে এসে সাঁতার কাটত। পুকুরে এখন ঘন দাম, শালুক আর পদ্মও ফোটে। জলটা ভারি স্বচ্ছ। ঘাট আছে। কিন্তু কারুর ও জলে নামা বারণ। একবার রান্নার ঠাকুর মাধবের ভাইপো মনের সুখে সাঁতার কাটতে নেমেছিল। শেষে মাধবের চাকরি যাবার দাখিল। ওর ভাইপো ওড়িশার ছেলে। বড়বাড়ির রীতিনীতি জানে না। দারোয়ানের তাড়া খেয়ে প্রায় কাপড়েচোপড়ে হয়ে গিয়েছিল বেচারার।

পুকুরঘাটে বিকেলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বা বসে সময় কাটায় বিপাশা। শীত তীব্র হলে চলে আসে। দিনে দিনে শীত কমে যাচ্ছে ক্রমশ। এবেলা সে সিঁড়িতে বসে জলের দিকে তাকিয়ে এলোমেলো নানা কথা ভাবতে লাগল।

একটু পরে তার যেন মনে হল, পেছনে কে এসে দাঁড়িয়েছে! ঘুরে দেখল, কেউ নেই। অথচ তার দৃঢ় ধারণা কেউ এসেছিল। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল। সিঁড়িটা উঁচু করে বাঁধানো। গোলাকার বেঞ্চ আছে। দুধারে দুটো লাইমকংক্রিটের পরীমূর্তি। শ্যাওলায় কালো হয়ে গেছে। সে উঠে পড়ল। পেছনে গুঁড়ি মেরে বসে আছে কি কেউ?

কেউ না। বিপাশার একটু গা-ছমছম করল। বাগানের গাছে-গাছে নীলচে কুয়াসার স্তর ভাসছে। দূরে গেটের ওদিকে সূর্য ডুবে গেছে। চারপাশে কোনো

লোক নেই। বিশাল বাড়িটা কালো হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বিপাশা একটু শক্ত হল। জেদ করে আবার বসে পড়ল। একটা অলীক ভয় তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াচ্ছে যেন। এই ভয়কে জয় না করতে পারলে তাঁর বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে হয়তো। এই গোপন ভয় তাকে বেঁচে থাকার আনন্দ ছুঁতে দিচ্ছে না। অথচ মরে যাওয়ার কথাও ভাবা যায় না। বিপাশার খালি মনে হয়, একটা কিছু জরুরী উদ্দেশ্য তার জীবনে আছে এবং তাই তাকে বেঁচে থাকতেই হবে। সে বুঝতে পারে না কী সেই উদ্দেশ্য, খালি মনে হয়—একটা কিছু ঘটবে—গোপন অথচ বিরাট কিছু, যা তার জীবনকে ভয়হীন ও সুন্দর করে তুলবে।

আর এই কথাটা যখনই ভাবে, অনির কথা মনে পড়ে যায়। নিজের বেঁচে থাকার সেই রহস্যময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনি কী ভাবে জড়িয়ে গেছে, বিপাশা বোঝে না।

অনি বড় দুরন্ত ছেলে ছিল। তখন বসন্তপুর স্কুলে কো-এডুকেশন ছিল। অনি তার দু ক্লাস ওপরে পড়ত। ক্লাস নাইনে হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দেয় অনি। অনি বরাবর বলত, 'ধুৎ! পড়ে কি আমার দুটো মাথা গজাবে?' অনিকে ভাল লাগত বিপাশার। গরীব পরিবারের ছেলে। কিন্তু তার দাপটটা ছিল বড়লোকের ছেলের মতোই। বড় অহংকারী আর দুর্দান্ত প্রকৃতিব ছিল অনি। রুক্ষ চেহারা, কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন, শক্ত গড়ন। ফুটবল খেলাতে কত ছেলেকে সে জখম করত তার সংখ্যা নেই। মারকুটে স্বভাবের জন্য কেউ তার সঙ্গে মিশতে চাইত না। বসন্তপুরে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না।

অপরূপার সঙ্গে বিপাশার খানিকটা বন্ধুত্ব ছিল। তাই বলে বিপাশা ওদেব বাড়ি যেত না। অপরূপাই আসত তাদের 'সিংহভবনে।' অপরূপার দাদা বলে অনিকে একটু খাতির কবে চলত বিপাশা। কিন্তু অনিব সবতাতেই বাড়াবাড়ি। দূর থেকে দেখেই অনি চেঁচাত, 'বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!' খুব বিব্রত বোধ করত বিপাশা।

কৃষ্ণনাথের কেন যেন পছন্দ ছিল অনিকে। সে পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কৃষ্ণনাথ তাকে ডেকে নিজের কন্ট্রাকটারির কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। অনির এই স্বভাব—যেটা পছন্দ হবে, সেটা নিয়ে একেবারে পাগলের মতো লেগে থাকবে। তারপর খেয়াল ভেঙেও যেত রাতারাতি। যত্নে গড়া ধুলোর ঘর যেমন করে লাথি মেরে বালকেরা ভেঙে দেয়, অনি সব ভাঙত। এলাকার রাস্তাঘাট, সরকারী প্রকল্প অনুসারে ঘরবাড়ি তৈরি—কৃষ্ণনাথ সবকিছুই করতেন। অনি সেই সূত্রে

বিপাশাদের বাড়ি আসত সবসময়। বাড়ির একজন হয়ে উঠেছিল সে। বিরক্ত হলেও সবাই তাকে পাত্তা দিত। বিপাশার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে এসে মিশত সুযোগ পেলে। বিপাশাও যেন তাকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিল। বিপাশার তাকে ভাল লাগতে শুরু করেছিল। তখন কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকাল বিপাশার। অনি তাকে পেয়ে বসেছিল। অনেকসময় নিজেরই খারাপ লাগত, একটা আজেবাজে ছেলের দিকে কেন এত টান তার? কিন্তু অনি যেন ভূতের মতো বিপাশার আত্মায় ঢুকে পড়েছিল।

তারপর অতর্কিত একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল।

কৃষ্ণনাথ সেদিন কলকাতা গেছেন। তাঁর কাজের দায়িত্ব নিবারণ দত্তের ওপর। নিবারণবাবু একসময় সরকারী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কোথায় রাস্তার ওপর ব্রিজ তৈরি হচ্ছিল। কী একটা কথায় অনির স.ঙ্গ দত্তবাবুর ঝগড়া বেধে যায়। দত্তবাবু এ ছোকরাকে সইতে পারতে‹ না। অনি তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয়। তখন দত্তবাবুর হুকুমে মজুররা ঝাঁপিয়ে পড়ে অনির ওপর। অনিরও মাথা ফাটে।

অনি কৃষ্ণনাথকে বলতে এসেছিল, চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু কৃষ্ণনাথ নেই। শমিতাও তাঁর সঙ্গে গেছেন। অনি চিৎকার করছিল হলঘরে। বিপাশাকে সিঁড়ির ওপর দেখে সে দৌড়ে গিয়েছিল। বিপাশা ভয় পেয়েছিল তার মূর্তি দেখে।

কিন্তু বিপাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়েই অনি হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ফিক করে হেসে বলেছিল, 'একটু ডেটল লাগিয়ে দাও তো!'

বিপাশা চুপচাপ ডেটল এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। কোনো প্রশ্ন করে নি। তারপর তুলো আর একটুকরো কাপড় দিয়ে ব্যাণ্ডেজও বেঁধে দিয়েছিল। অনি বলেছিল, 'কী হয়েছে জিগ্যেস করছ না দি.াস?'

বিপাশা একটু হেসে বলেছিল, 'জিগ্যেস করার কী আছে? কোথাও মারা-মারি করেছ।'

'এক গ্লাস জল দাও। না—ঠাকুরচাকরের হাতে নয়, তোমার হাতে খাব।'

বিপাশা জল এনে দিলে খাওয়ার পর অ.নি বলেছিল, 'এবার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

বিপাশা চা বলে এসে দেখে, অনি তার ঘরে বসে রয়েছে। একটু বিব্রত বোধ করেছিল বিপাশা। বাবা-মার কানে তুললে বকবেন। কিন্তু অনিকে ঘর থেকে নড়ানো তার পক্ষে কঠিন।

নাক' ওর বাবা-মা নেই জেনেই সেদিন অনি অমন সাহসী হয়ে উঠেছিল ? চা দিয়ে গিয়েছিল ভুলো নামে একজন বয়স্ক লোক। সে এবাড়িতে বংশপরম্পরা কাজ করে। একটু ঠোঁটকাটা স্বভাবের লোক। বলেছিল, 'দিদিমণির ঘরে ঝামেলা কচ্ছ কেন বাপু ? চা খাবে তো বসার ঘরে বসেই চা খেলে কি দোষ হত ?'

অনি বলেছিল, 'আরে যাও, যাও! কালু মুখুয্যের নাতি সিঙ্গিবাড়িতে পা রেখেছে, এতেই ধন্য হয়ে গেছে বাড়ি। কী বলো বিয়াস ?'

'ভুলোদা, তুমি যাও তো এখন।' বিপাশা রাগ করে বলেছিল। লোকটা ফোপরদালালী করতে পেলে ছাড়ে না। আসলে বিপাশা অনির অপমানে ভয় পাচ্ছিল সেদিন। অনিকে ভয় পেত সে। বোশেখ মাসের বিকেল। তারপর কখন আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছিল। প্রচণ্ড ঝড় এসেছিল। সারা বাড়িটা কাঁপছিল। জানলাগুলো ঝটপট বন্ধ না করে উপায় ছিল না। একটু পরেই বাজ পড়ার শব্দ, তারপর বৃষ্টি, সেই সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করেছিল। অনি খুব খুশি হয়ে বলছিল, 'দারুণ! জমে গেছে!' তারপর সে লাফিয়ে উঠেছিল, 'বিয়াস! শিল কুড়োবে ? দারুণ লাগে ঝড়বৃষ্টিতে শিল কুড়োতে। ওই শোনো, ছাদে দড়বড় করে শিল পড়েছে! চলো না ছাদে যাই।'

বিপাশা বলেছিল, 'না!'

'ধুৎ! সব তাতেই না। এসে দেখ না মজাটা!'

'তুমি যাও।'

'ছাদে ওঠার সিঁড়ি কোথায় ?'

'চলো দেখাচ্ছি।'

বিপাশা চিলেকোঠায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অনির কাণ্ড দেখছিল। ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু সিঁড়িতে আলো নেই। একরাশ শিল কুড়িয়ে অনি দৌড়ে এসে বলেছিল, 'ধরো ধরো!'

বিপাশা হাত বাড়িয়েছিল। হয়তো সেটাই বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টি বজ্র শিলাপাতের সন্ধ্যায় বুঝি তারও কী টান বেজেছিল মনে। তারপর হঠাৎ অনি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলেছিল, 'বিয়াস! আমার বিয়াস!'

সিঁড়ির মাথায় পড়ে গিয়েছিল বিপাশা। বাধা দেবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল—কিংবা একটা কিছু ঘটেছিল তার মধ্যে, আজও বুঝতে পারে না। এখনও কোনো নির্জন মুহূর্তে সেই চাপা কণ্ঠস্বর তার কানের কাছে এসে পড়ে—

বিয়াস! আমার বিয়াস!' বিপাশার মনে হয়, কোথাও লুকিয়ে পড়ার মতো জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। কেন সে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে নি—কেনই বা অমন অবশ হয়ে গিয়েছিল সেদিন?

তারপর কতদিন অনির মুখোমুখি হয় নি সে। অনি এ বাড়ি আসা ছেড়ে দিয়েছিল। একদিন গেটের কাছে সে কৃষ্ণনাথের উদ্দেশে চেঁচামেচি করে বলেছিল, 'দিও না শালা! হজম হবে না। এ বাবা কালু মুখুয্যের নাতি। হার্টে হাত ভরে পাওনাকড়ি বের করে নেবে।'

বাহাদুর বলেছিল, 'ঝামেলা করো না বাবু। চলে যাও। বহুৎ মুশকিলে পড়ে যাবে।'

অনি বলেছিল, 'তা তো বলবি রে! তুই ছত্রী রাজপুত—আর কেষ্ট সিঙ্গিও ছত্রী রাজপুত। কে জানে না, জাত ভাঁড়িয়ে ওর ঠাকুর্দার বাপ কায়েত হয়েছিল! নর্থবিহারে পাহাড়ের কোলে মোষ চরাত। বসন্তপুরে এসে জমিদারি পেয়ে কায়েত বনে গেল!'

বাহাদুর কুকরি বের করেছিল। কৃষ্ণনাথের হুকুমে সুরে আসে। অনিও কেটে পড়ে।

কলেজ যেতে ভয় পেত বিপাশা। ছলছুতো করে গাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ধুয়ো তুলেছিল। কিন্তু অনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে অনি তার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসত। গাড়ি থেকে বিপাশা দেখত, অনি দূরে সরে গেছে—অন্যদিকে মুখ। হয়তো সেও অনির এক খেয়াল। পরে যেন ভুলে গিয়েছিল বিপাশাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে বিপাশার স্বপ্নে বারবার আসে। ভদ্র সুশিক্ষিত মানুষের কণ্ঠস্বরে কথা বলে। বিপাশা বুঝতে পারে, এ অনি এক অলীক অনি। সত্যিকার অনির সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল ফারাক। কিংবা সত্যিকার অনি যা হতে পারত, যা তার হওয়া উচিত ছিল, বিপাশার স্বপ্নের অনি সেই ছেলেটি সুন্দর একটি সম্ভাবনার পরিণত ফসল। এ ফসল বিপাশার অবচেতনার ক্ষেতে যেন অনেক শ্রমে সাধে ফলানো। অনেক ইচ্ছায় রাঙানো।

অথচ বিপাশা কিছুতেই ভুলতে পারে না সেই কালবোশেখীর সন্ধ্যায় ছাদের ওপর বিদ্যুতের আলোয় ঝলসে ওঠা এক দুর্দান্ত তরুণ মানুষকে—বৃষ্টি ও শিলপড়ার মধ্যে যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার করে কী বলছে। তার ক্ষতস্থানের ব্যাণ্ডেজ ভিজে যাচ্ছে। ধুয়ে যাচ্ছে ডেটল ও রক্ত। সে ঝড়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছে, 'বিয়াস! আমার বিয়াস!'

তখন আঠারো বছর বয়স বিপাশার। ঝড়ের সন্ধ্যায় সেই সাংঘাতিক এবং সুন্দর অভিজ্ঞতা তাকে বয়স বাড়িয়ে দিয়েছিল যেন। এবং ভালবাসার একাকার একটা আবেগ হঠকারিতায় তার অচেনা এক গ্রহে ঠেলে দিয়েছিল তাকে। সেই থেকে বিপাশা অন্য এক গ্রহের প্রাণী হয়ে গেছে। সেখানে সে ভীষণ একা।

তারপর অনি একদিন বেপাত্তা হয়ে গেল বসন্তপুর থেকে। অপরূপা বা রঞ্জনাকে তাদের দাদার কোনো ব্যাপারে দায়ী করা হত না বলে তারা এ বাড়ি মাঝেমধ্যে আসতে পারত। দাদার কথা তুলে নিজেরাই নিন্দে করত। কেউ নিন্দে করলে তাতে সায় দিত। তারাই বলেছিল, 'কে জানে কোথায় চলে গেছে! আপদ গেছে বাবা।' কৃষ্ণনাথ বলতেন, 'কোথায়-কোথায় খুন-খারাপি আর চুরি ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিল বদমাসটা এখন গাঢাকা দিয়েছে। ধরা পড়লে যাবজ্জীবন জেল কিংবা ফাঁসি।'...

বিপাশার মনে হয়, হঠাৎ অনি এসে তার সামনে দাঁড়াবে। রাতে যতক্ষণ ঘুম না আসে, সে ভয়ে ও ভালবাসায় ভাবে, হঠাৎ কোনো অদ্ভুত উপায়ে অনি যদি তার ঘরে আসে! যদি ফিস-ফিস করে ডেকে ওঠে, 'বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!'

বিপাশা চমকে উঠল আবার। পুকুরের জলের ওপর, বাগানে কুয়াসা ঘনিয়েছে। আবছা আঁধারে কুয়াসার রঙ এখন গাঢ় নীল। কুয়াসাব ভেতর শুকনো পাতায় কার শব্দ শুনল কি? ঘুরে-ঘুরে চারপাশ দেখে নিল সে। বাড়িতে আলো জ্বলেছে। বাড়ির পেছনদিকে খিড়কির দরজার মাথায় যে বাল্বটা জ্বলছে, তার আলো এতদুর পৌঁছয় নি। পুকুরের পর কয়েকটা লিচু আর আমের গাছ। একটা বর্মী বাঁশের ঝাড়। কুয়াসা মেশানো আঁধারে সব অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। হিমে তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপাশা উঠে দাঁড়াবে ভাবল, পারল না। কেউ তাকে খুঁজতে আসছে না কেন? সে এখানে বসে আছে—কেউ কি তাকে দেখতে পাচ্ছে না? বিপাশার মনে অভিমান হল। তাকে কেউ চায় না—কেউ পছন্দ করে না। বাবা না—কেউ না।

'বিয়াস! বিয়াস! বিয়াস!'

বিপাশা তাকাল। তার সামনে কি অস্পষ্ট একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে? বিপাশা অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'কে?'

'বিয়াস! আমি অনি।'

বিপাশা চুপ করে থাকল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে রইল।

'কথা বলছ না কেন বিয়াস? আমি অনি।'

বিপাশা তবু কথা বলল না। অনি তার দিকে ঝুঁকে আসতেই সে আক্রান্ত জন্তুর মতো ছিটকে সরে গেল। তারপর বোবাধরা গলায় চিৎকার করে দৌড়ুল। গাঢ় নীল কুয়াসা অথবা আঁধারে বিভ্রান্ত বিপাশার মনে হচ্ছিল অনি তাকে তাড়া করেছে। সে বাড়ি খুঁজে পেল না। কোথাও আলো চোখে পড়ল না। গাছপালার ভেতর দিয়ে বারবার আছাড় খেতে-খেতে বিপাশা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকল। যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই পেছন থেকে অনি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলছে, 'বিয়াস। আমার বিয়াস।' বিপাশা বর্মী বাঁশের ঝোপের ভেতর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

তখন বাড়ির ভেতর যে-যার কাজে ব্যস্ত। কলকাতা থেকে ব্রজেন্দ্র ফোনে আবার কথা বলছেন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে। শমিতা পাশে দাঁড়িয়ে জবাব যুগিয়ে দিচ্ছেন। শতদ্রু এমন ঝামেলা বাধাবে, কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। ফোন ছেড়ে কৃষ্ণনাথ ক্রুদ্ধভাবে বললেন, 'ব্রজেনদাই ওর মাথাটি কবে খেয়ে আছে। আমি এখন যাই কী করে বলো তো? জরুরী মিটিং রয়েছে। মিনিস্টার আসছেন। বরং এক কাজ করো। তুমি যাও। হতচ্ছাড়াকে আগাগোড়া মুখুয্যেদের হিসট্রি বুঝিয়ে দিয়ে এস। কাল সকালের ট্রেনেই যাও—নাকি গাড়ি করে যাবে? আড়াইশো কিলোমিটার এমন কিছু লং জার্নি নয়।'

শমিতা গুম হয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'আচ্ছা! বিয়াসকে তো ফিরতে দেখলুম না। এই ঠাণ্ডায় অন্ধকারে এখনও কি সুইমিং পুলে বসে আছে নাকি? ও ভুলো? একবার দেখতো বাবা!'

ভুলো টর্চ নিয়ে বেরুল। পুকুরের দিকটা অন্ধকার হয়ে আছে।

অবেলায় কিছু পুঁটিমাছ

সকালে টিউশনি করে ফেরার পথে শতদ্রুর একটা চিঠি পেয়ে ভারি অবাক হল অপরূপা। একটা মরা সোঁতার ওপর কাঠের সাঁকো। ওপারে ব্লক বাবুদের কোয়ার্টার। ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে সাহেব সাধুদের মতো একজঙ্গল ইউ-ক্যালিপ্টস গাছ। ফুল আর সবুজ বীথিতে ওদিকটা চকরা-বকরা। তার মধ্যে হলুদ-হলুদ বাসাঘর। বড় লোভে অপরূপা ওখানে টিউশনি করতে যায়। ফেরার পথে সাঁকোর রেলিঙে হেলান দিয়ে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিল।

শতদ্রু তাকে আমেরিকায় পৌঁছে দেবেই দেবে, প্রথম পাতায় এগুলো পড়তে পড়তে আবেগে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। ভালবাসা না হলে কি এমন কথা ওঠে? কিন্তু পরের পাতায় গিয়ে দারুণ চমকাল। তারপর রাগে দুঃখে অপমানে সে লাল হয়ে গেল। রঙ্গনাকে তার চাই। অপরূপা নয়, রঙ্গনা। রঙ্গনাকে লুকিয়ে বিয়ে করার ইচ্ছা। তার দিদির সাহায্য চাই। নির্লজ্জ ছোটলোক কোথাকার! বসন্তপুরে থাকতে লেখার সাহস পায় নি। দূরে কলকাতা গিয়ে এই সাহস হয়েছে।

চিঠিটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে মিচে ফেলেছিল অপরূপা। তার মাথার ভেতর সন্দেহ ঘুরপাক খেতে থাকল। তাহলে কি কবে থেকে শতদ্রু ও রঙ্গনা লুকিয়ে প্রেম করছে—সে একটুও টের পায় নি? রঙ্গনার পেটে-পেটে এতসব আছে, তার দিদি জানতনা কিছুই। আশ্চর্য এবং আশ্চর্য। রঙ্গনাকে সে এতকাল সরল ভেবে এসেছে।

অপরূপা ভেবে পেল না তাকে পছন্দ না হয়ে শতদ্রুর রঙ্গনাকে পছন্দ হল কোন গুণে? ইংরেজি বই পড়ার চঙ করে বলেই কি? সবাই জানে এবং এ তো চন্দ্রসূর্যের মতো সত্য যে অপরূপা তার বোনের চেয়ে সুন্দর। অপরূপার মাথায় অনেক বেশি চুল। গায়ের রঙও অনেক ফর্সা। নাকমুখের গড়ন চমৎকার। সেজেগুজে থাকলে তার ওপর চোখ না পড়ে পারে না। তার শরীরটাও রঙ্গনার মতো কাঠি কাঠি নয়, মেদে নিটোল। তার গাল অনেক বেশি ভরাট। তার বুকের সৌন্দর্য সুডৌল স্ফীতিতে—রমণীর যৌবনকে যা প্রগলভতায় পুরুষের কাম্য করে তোলে। অথচ রঙ্গনার মধ্যে এখনও নিবোধ বালিকার আদল। রোগা পাকাটি নিষ্প্রভ।

শেষে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে একটু ধাতস্থ হল অপরূপা। তাহলে শতদ্রু বাবা-মাকেও নির্লজ্জের মতো ব্যাপারটা জানিয়েছিল। বাবা-মা চটেন আর না-চটেন। বোঝা যাচ্ছে, সেজন্যেই সিঙ্গিবাড়ি রঙ্গনাকে ঢুকতে দেয়নি সেদিন।

আবার আশ্চর্য লাগল অপরূপার। সে ভেবেই পেল না, রঙ্গনার মতো মেয়েকে নিয়ে শতদ্রু বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বসল। কী পেয়েছে সে রঙ্গনার মধ্যে?

বাড়ি ঢুকেই রঙ্গনাকে বলল, 'চিঠি পেয়েছিস?'

রঙ্গনা এনামেলের বাটিতে মুড়ি খাচ্ছিল। সামনে বাঁধানো 'প্রবাসী' পত্রিকা—মধুরবাবু যেটা দিয়ে গেছে বৃষ্টির রাতে। হাঁ করে তাকাল। 'চিঠি? কার চিঠি রে?'

অপরূপা ভেংচি কেটে বলল, 'ন্যাকা। শত্তুরর চিঠি।'

রঞ্জনা হাসল। 'যাঃ! কী বলছিস। আমাকে সে চিঠি লিখবে কেন?'

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলল, 'লুকোস নে রনি। এটা তোর বাঁচা-মরার প্রশ্ন। ওই লম্পট বদমাসটার সঙ্গে এ্যাদ্দিন নিশ্চয় তুই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিলি। পাপ কখনও চাপা থাকে না, জেনে রাখিস।'

রঞ্জনা নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল ওর মুখের দিকে। ক্রমে তার হাসি মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঠোঁটের কোনায় মৃদু ভাঁজ পড়ছিল। শান্তভাবে বলল, 'দিদি। তোকে কে বলেছে রে মিছিমিছি?'

অপরূপা শক্ত গলায় বলল, 'কেউ কিছু বলে নি। আমি জানি। আমার গায়ে হাত রেখে বল্, বিয়াসের দাদা তোকে কলকাতা থেকে চিঠি লেখে নি?'

রঞ্জনা উঠে এসে তার গায়ে হাত রেখে বলল, 'বিশ্বাস কর দিদি, আমাকে ও কোনো চিঠি লেখে নি। সত্যি বলছি, তোকে তাহলে লুকোতুম আমি?' রঞ্জনা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। 'আমি তো ওর সঙ্গে কখনও মিশিনি, তুই জানিস দিদি!'

অপরূপা ওর হাতটা ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমার অসাক্ষাতে কী হয়েছে, আমি কি দেখেছি? তুই কতদিন ওদের বাড়ি গেছিস।'

রঞ্জনা বাচ্চা মেয়ের মতো কান্নার সুরে বলল, 'সে কি নতুন যাচ্ছি? বিয়াসদির দাদা যখন বাইরে ছিল, যেতুম না বুঝি? তুই খালি মিছিমিছি আমার নামে স্ক্যাণ্ডাল করছিস!'

'থাম্! আর ন্যাকাকান্না কাঁদে না। আমি সব জানি।' বলে অপরূপা তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রঞ্জনা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই আকস্মিক আক্রমণের কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না সে। কিছুদিন থেকে অপরূপা কেমন যেন হয়ে উঠেছে। একটুতেই খাপ্পা মেজাজ। ঠাকুমা যাবার পর কয়েকটা দিন খুব আদর দিচ্ছিল তাকে। তারপর কী হল, সে বদলাতে থাকল যেন। সংসারে টানাটানিটা নিশ্চয় ভীষণ বেড়ে গেছে। ঠাকুমা কোত্থেকে পয়সাকড়ি পেতেন আর চালিয়ে নিতেন কোনরকমে। কালই তো দুই বোনে ঘর সংসার তন্ন তন্ন হাতড়ে ঠাকুমার লুকোনো টাকাকড়ি খুঁজে হন্যে হয়েছে। কোনো পাত্তা পায় নি। অপরূপা বলেছে, কোথাও নিশ্চয় আছে। ঠাকুর্দার নাকি অনেক টাকাকড়ি লুকোনো ছিল। মায়ের কাছে শুনেছি। ঠাকুমাই তার খোঁজ রাখেন।

এদিনটা রঞ্জনার এত দুঃখ হল যে সে দুপুরে ভাল করে খেতেই পারল না। অপরূপাও পীড়াপীড়ি করল না তাকে। বিকেলে মধুর বউ এল গল্প করতে। 'একবার খোঁজখবর নিলেও পাত্তে গো বাবুদিদিরা। পেনীর বাবা বলছিল, তাকে সঙ্গে করে বরঞ্চ কেউ যদি যেত। কমলবাবুর ভাগ্নেবাবু তো লোক ভাল না। ফিরে যে এল, খবরটা তো দেবে। তা নয়, গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। আমার বাপু কুড়ানি ঠাকরুনের জন্য ভাবনা হচ্ছে।'.

শুনে-শুনে বিরক্ত লাগে এখন। অপরূপা মুখ খুলতে চায় না। রঞ্জনা তাকে সায় দেয়। আজ কিন্তু অপরূপা মধুর বউয়ের সঙ্গে জমিয়ে গল্প জুড়েছে। গল্প মানে বসন্তপুরের কুৎসা। রঞ্জনা বলল, 'আমি আসছি।'

অপরূপা গ্রাহ্য করল না। মধুর বউ বলল, 'পেনীকে সঙ্গে নেবে নাকি দিদি? ডাকব?'

'থাক গে। বলে রঞ্জনা বেরিয়ে গেল। অপরূপ একবার তাকিয়ে দেখে ঠোঁট ওল্টাল শুধু।

রঞ্জনার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। ছোটবেলা থেকেই তো পাড়া-বেড়ানী স্বভাব। সে আনমনে এদিক থেকে সেদিক কিছুক্ষণ হেঁটে হাইওয়েতে গেল। তারপর আচায্যি-পাড়ায়।

রমেন মোক্তারের মেয়ে ছন্দা রাস্তা থেকে তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। 'কী হয়েছে রে রনি? অনেকদিন তোর পাত্তা নেই যে? ডুবে ডুবে খুব জল খাচ্ছিস বুঝি? চেহারা দেখেই টের পাচ্ছি।'

রঞ্জনা চটে গেল। 'হুঁ, তোর মতো!'

ছন্দা হাসল। 'ইচ্ছে তো করে রে! পাচ্ছি কোথায় জল? সবাই তো তোর মতো লাকি নয় যে অ্যামেরিকা থেকে জেটপ্লেনে সটান উড়ে এসে···'

'ছন্দা!' রঞ্জনা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

ছন্দা গ্রাহ্য করল না। হাসতে হাসতে বলল, 'দ্যাখ্ রনি, আমাকে লুকোনো তোর উচিত হয় নি। সারা বসন্তপুর জেনে গেল, তখন আমি জানতে পারলুম। এটা কেমন হল বল্?'

রঞ্জনা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী জেনেছিস তুই?'

ছন্দার মা কোথায় ওত পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এই যে রনি! আর যে দেখি না বড়। থাকো কোথায় বলো তো?'

ছন্দা বলল, 'ও এখন সিঙ্গিবাড়ির বউ হতে চলেছে। আর আমাদের পাত্তা দেবে কেন?'

রঙ্গনা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবেই পেল না। কিছু একটা ঘটেছে যেন, অপরূপার কথায় সেটা আঁচ করেছিল। কিন্তু এরাও তো সেরকম কিছু বলছে। তার মুখ নীল হয়ে গেল।

ছন্দার মা বিভাবতী বললেন, 'তা ভালই তো বাপু। আজকাল ওসব কে আর মানে-টানে। বরং সিঙ্গিরা জাতে উঠবে। শুনেছি ওদের পূর্বপুরুষ নাকি বাইরের লোক। ছত্রী রাজপুত। তাই পদবী সিংহ। তাতে আর কী হয়েছে? আজকাল টাকাকড়িই আসল কথা।'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন এসব কথা আমাকে বলছেন মাসিমা? আমি তো কিছু জানি না।'

ছন্দা ওকে গুঁতিয়ে দিয়ে বলল, 'ন্যাকামি হচ্ছে ফের।'

কাঁপা-কাঁপা গলায় রঙ্গনা করুণ মুখে বলল, 'বিশ্বাস কর, আমি সত্যি কিছু জানি না।'

বিভাবতী তাব মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বাঁকা ঠোঁটে বললেন, 'ছেলে এখন সোমত্ত সাবালক। বিদেশে বড় চাকরি করে। সে যখন জেদ ধরেছে, তখন বাবা-মা কি আর আটকাতে পারবে? ওদের কথা শুনবে কেন? বিয়ে করে সোজা চলে যাবে বউ নিয়ে আপন কর্মস্থলে। সিঙ্গির তড়পানি থেমে যাবে।'

রঙ্গনা বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ছন্দা তার পেছনে-পেছন দৌড়ুল। 'কী রে! তুই রাগ করে চলে যাচ্ছিস কেন? যা বাবা! এই রনি। শোন, শোন!'

রঙ্গনা বলল, 'কেন আমাকে নিয়ে তোরা জোক করবি? কী করেছি তোদের?'

ছন্দা অবাক হয়ে বলল, 'এ রাম! তুই যে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিন ক্রিয়েট করবি কেন? আয়।'

'না। পরে আসব।'

ছন্দা দাঁড়িয়ে রইল। রঙ্গনা হন হন করে হাঁটতে থাকল। তাহলে বসন্তপুরে তাকে নিয়ে এইসব কথা রটেছে। তাই শুনেই অপরূপা সকালে তাকে চার্জ করে বসেছিল। কিন্তু বোঝাই যায়, সবটাই একতরফা। শতদ্রু বা কেউ তো এধরনের কোনো কথা বলতে তাদের বাড়ি আসে নি।

'রনি! রনি!'

রিকশোয় তপতী নামে একটা মেয়ে যেতে যেতে তাকে ডাকছিল। রঙ্গনা তাকালে সে মিষ্টি হেসে 'কনগ্রাচুলেশন রনি' বলে উঠল। রিকশোটা জোরে

বেরিয়ে গেল। তপতী বি এ পাশ করে এখন কোথায় যেন বি এড পড়ছে। প্রাইমারি সেকশানে শিক্ষিকা হয়েছে। রঞ্জনার কিছু হল না।

আবার কিছুটা এগুতেই একটা ঘরের জানলা থেকে কেউ তাকে ডাকছিল—'রনি! রনি!' রঞ্জনা ঘুরে দেখল সঙ্গীতাদি। গার্লসকলেজের বাংলার লেকচারার। কিন্তু ওঁর মুখের হাসিতে কি একই কথা লেখা নেই? রঞ্জনা ঘেমে উঠল শীতের অবেলায়। আসলে সঙ্গীতাদির বাড়িতেই সে যাচ্ছিল। কিছু বই-টইয়ের আশায়। কিন্তু এভাবে তাকে গলিরাস্তায় দেখামাত্র ডাক দেওয়ার মানে একটাই দাঁড়ায়।

রঞ্জনা মরীয়া হয়ে বলল, 'আসছি সঙ্গীতাদি! একটু পরে আসছি। একটা আরজেন্ট কাজে যাচ্ছি।'

এরপর রঞ্জনা আত্মরক্ষার তাগিদে বিপথ ভেঙে ধোপীপাড়ার মাঠ হয়ে হাইওয়েতে গিয়ে উঠল ফের। লজ্জায় অপমানে সে লুকিয়ে পড়তে চাইছিল। অপমান বৈকি। সে কি এত শস্তা মেয়ে যে যার খুশি তাকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে এবং লোকে তাই নিয়ে যা খুশি রটাবে?

এ বয়সে রঞ্জনা নিজের কোনো ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে জানে না। বড় জোর মনে ভেসে আসে একটা চাকরি-বাকরির কথা। সেও খুব স্পষ্ট নয়। তার একটা চাকরি থাকলে ভাল হত। কিন্তু দিদিরই হল না তো তার মতো ড্রপআউটের কী করে হবে? দিদির একটা জুটুক তো। তারপর তার একটা কিছু ঘটবে হয়তো।

ঝোঁকের বশে এলোমেলো হাঁটতে স্লিপারের ফিতে ছিঁড়ল। কতদিন চালাচ্ছে হিসেব নেই। ছেঁড়া স্বাভাবিক। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে কিছুটা এসে নিজেদের বাড়ির কাছাকাছি খুলে হাতে নিল। ঠিক সেই মুহূর্তে খুব জোরালোভাবে তার মনে এল কুড়ানি ঠাকরুনের কথা। বুকের ভেতরটা দুলে উঠল। দিদির কাছে পয়সা চাইবে না প্রাণ গেলেও—ছিঁড়ুক জুতো। ঘরে চুপচাপ দিন কাটাবে বরং। ঠাকুমা না ফিরে এলে বেরুবার নামও করবে না। ঠাকুমার কাছে পয়সা নেবে। মুচির কাছে যাবে। আবার মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াবে বসন্তপুরে।

ঠাকমার জন্য চোখে জল এসে গিয়েছিল রঞ্জনার। শিরিস কৃষ্ণচূড়ার এলাকা ছাড়িয়ে এখন বিশৃংখল অযত্নে বেড়ে ওঠা গাছ আর আগাছার জটলা। মধ্যে দিয়ে একফালি রাস্তা। নির্জন রাস্তায় চোখে জল নিয়ে রঞ্জনা খুব আশা করল, বাড়ি ফিরে যেন দেখে ঠাকুমা ফিরে এসেছেন। সে মনে মনে মাথা কুটছিল, যেন ফিরে আসেন ঠাকুমা। খোঁড়া মানুষ। কত কষ্টে-সিষ্টে ক্রাচটা নিয়ে হাঁটেন

একটুখানি। সেও অভ্যাসেরর হাঁটাহাটি বাইরে পর্যন্ত নয়। খিড়কির ডোবার জল শুকিয়ে আরও খানিকটা নেমে গেলে তাঁর সাধ্য থাকে না আর এমন মানুষ কোথায়। এতদিন ধরে কীভাবে কাটাচ্ছেন কে জানে। একটা চিঠিই বা কেন কাউকে দিয়ে লেখাচ্ছেন না ?

বাড়ি ফিরলে অপরূপা তাকে দেখে বলল, 'ছুতোর বউ অবেলায় পুঁটিমাছ দিয়ে গেল। বললুম, নেবনা ওসব ঝামেলা। শুনল না। কে বাছবে ওসব? আমার দ্বারা হবে না।'

রঙ্গনা দেখল কচুপাতায় গোটাকতক পুঁটিমাছ থামের কাছে রাখা আছে। মুহূর্তে তার মুখটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে গেল। বলল, 'খব টাটকা রে দিদি! কোথায় পেল এখন ?'

'জানি না' বলে অপরূপা ইঁদারাতলায় গেল।

রঙ্গনা জুতো দুটো যত্ন করে রেখে মাছগুলো নিয়ে বসল। কদিন মাছের গন্ধ নেই পাতে। দুপুরে শিম পেড়েছিল কিছু। তার সঙ্গে মার্বেলগুটির মতো ছোট্ট কয়েকটা আলু কুচিয়ে ঝোলমতো একটা তরকারি। রাগ ছিল বলে খাওয়াটা পেট পুরে হয়নি! এবেলা পুষিয়ে খাবে রঙ্গনা।—ছোট বঁটিতে মাছ বাছতে বাছতে বলল, 'দিদি। লম্ফটা জ্বেলে দিবি ?'

হাতের রেখা ঢেকে দিয়ে অন্ধকার নেমেছে সন্ধ্যায়। একটু পরে অবশ্য বাড়ির পেছনের মাঠে চাঁদ উঠবে। চাঁদের কথা ভাবলে আবার ঠাকুমার জন্য মনটা মোচড় দেয়। শীতের জ্যোৎস্নায় কতক্ষণ উঠোনে ঘুরে কুড়ানি ঠাকরুন কী সব নাড়াচাড়া করে বেড়াতেন। ক্রাচের খুট খাট শব্দ শোনা যেত। বিছানায় শুয়ে রঙ্গনা বলত, 'ও ঠাকুমা! হল তোমার? আমার ভয় করছে যে!'

অপরূপা লম্প জ্বেলে এনে পাশে রাখলে রঙ্গনা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'একটা কথা বলব ? রাগ করিস না দিদি।'

অপরূপা থামের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গলার ভেতর বলল, 'কী ?'

'আচায্যি পাড়ায় গিয়েছিলুম। সঙ্গীতাদির বাড়ি যেতুম বই আনতে। ছন্দা ধরে নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে।'

'গেলি কেন ? একবার ওর মা কী অপমান করেছিল ভুলে গেছিস ?'

'নিজে থেকে যাইনি তো।' রঙ্গনা দুঃখিত কণ্ঠস্বরে বলল। 'জোর করে নিয়ে গেল। গিয়ে অনেক কথা শোনাল। ওর মাও সায় দিয়ে বলল…'

অপরূপা বলল, 'বেশ করেছে। তোমার যেমন লজ্জা নেই।'

'আহা শোন্ না!' রঞ্জনা গলা চেপে বলল। 'কীসব আজেবাজে কথা রটেছে রে, জানিস? সতীতাদি পর্যন্ত। সিঙ্গিরা লোক ভাল না, তা কি জানি না, কিন্তু এ কী বিচ্ছিরি স্ক্যাণ্ডাল রে দিদি! আমি তো কিচ্ছু জানি না। তুই জানলেও তো বলতিস আমাকে।'

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, 'কী বলল ওরা?'

'বলল...' রঞ্জনা ঢোক গিলল। 'বলল যে...ভ্যাট্! আমার লজ্জা করছে। তুই কাল আচায্যিপাড়া গেলে শুনতে পাবি।'

'ন্যাকামি করিস নে। কী বলল ওরা তাই বল্। তারপর দেখাচ্ছি মজা।'

'না দিদি! তুই ঝগড়া করতে যাস্‌নে ওদের সঙ্গে।' রঞ্জনা ব্যস্তভাবে বলল। 'ওরা নিশ্চয় সিঙ্গিবাড়ি থেকে শুনেছে। বিয়াসদির দাদা নাকি আমাদের বাড়ি বিয়ে করতে চায়। তাই নিয়ে ওদের বাড়িতে গণ্ডগোল হয়েছে। এইসব।'

অপরূপা কী বলবে ভেবে পেল না। একটু পরে বলল, 'আমাদের বাড়ি বিয়ে করবে মানে কী? তোকে তো? সে আমি জানি।'

'তুই জানিস?' রঞ্জনা চমকে উঠল।

'জানি বৈকি। বিয়াসের দাদার তোকে তো খুবই পছন্দ।'

রঞ্জনা মুখ নামিয়ে আঁশ ছাড়াতে থাকল। অপরূপা যেন একটা জবাব শোনার আশা করে আছে। একটু পরে রঞ্জনা আস্তে বলল, 'তোকে বলেছে?'

'হুঁউ।'

'তোকে বলেছে বিয়াসদির দাদা?'

'বলেছে।' অপরূপা ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসল। 'কী? তোর আপত্তি নিশ্চয় নেই?'

'আছে।' রঞ্জনা বঁটি আর মাছগুলো কচুপাতায় মুড়ে ইঁদারাতলায় গেল। ওখানে রেখে দৌড়ে এসে লম্পটাও নিয়ে গেল। তারপর বলল, 'আমাকে একটু হেল্প করবি দিদি? জল তুলে দিবি?'

অপরূপা তেমনি বাঁকা হাসি নিয়ে ইঁদারাতলায় গেল! বালতি নামিয়ে বলল, 'কেন? সায়েবলোকের বউ হবি। প্লেনে চেপে অ্যামেরিকা যাবি। মেমসায়েব হয়ে উঠবি পুরোপুরি। আপত্তি কিসের?'

রঞ্জনা কথা বলল না। জলের বালতি সামনে এলে সে মাছ ধুতে থাকল।

অপরূপা বলল, 'ঠাকুমা ফিরে আসুক। বিয়াসের দাদা তো গোঁ ধরে কলকাতায় মামার বাড়িতে আছে। এখনও পুরো একমাসের বেশি থাকবে।

তারপর চলে যাবে অ্যামেরিকা। ঠাকুমা এলে ওকে চিঠি লিখব'খন। ঠাকুমার আপত্তি হবে না, তা বাজি রেখে বলতে পারি।'

এতটা শোনার পর রঞ্জনা ঠোঁটের ডগায় বলল, 'অ্যামেরিকায় যাবার জন্য তুই তো স্বপ্ন দেখিস। আমি দেখি? না হয় ইংরেজি বইটই একটু পড়ার চেষ্টা করি। বেশ তো। আর পড়ব না।'

অপরূপা শব্দ করে হাসল। 'কী কথায় কী। তোকেই তো ওর পছন্দ।'

রঞ্জনা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'ও একটা ক্লাউন।'

'এই। কী বলছিস। কোয়ালিফায়েড ছেলে। দেখতে কত সুন্দর। স্বাস্থ্যবান। কত পয়সা ওদের।' অপরূপা খিল খিল করে হাসতে লাগল।

'তোর যখন অত পছন্দ, তুই বিয়ে কর ওকে।' বলে রঞ্জনা বঁটি, মাছ আর অন্যহাতে লম্প নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। অপরূপা অন্ধকার ঠাণ্ডা ইঁদারাতলায় গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অথৈ সাগরে

'বাবারা। ওগো আমার বাবারা!'

লোহাগড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বেড়ায় পরনের থান শুকুতে দিয়ে কুড়ানি ঠাকরুন বোবাধরা গলায় ডাকাডাকি করছিলেন। এইমাত্র ট্রেন এসেছে। ভিড় করে লোকেরা স্টেশনঘরের গেটের দিকে চলেছে। কেউ কান করে না। একজন যেতে যেতে একটা দশ পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সামনে। বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ দৃষ্টে পয়সাটার দিকে চেয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গাল দিতে থাকলেন, 'তোদের পয়সায় আগুন লাগুক আটকুড়োরা! মিনসেরা! হতচ্ছাড়ারা! আমি কি ভিক্ষে চাইছি?'

পাশেই গোড়াবাধানো বকুলগাছ। সেখানে ক'জন লোক বসে আছে। একটু আগে তাদের কাছে কষ্ট করে পাছা ঘষড়ে গিয়ে যেই বলেছেন, 'বাবারা! ওগো বাবারা', তারা খেঁকিয়ে উঠেছিল। খেঁকানি শুনে ভয় পেয়ে সরে আবার

জলকলটার কাছে সরে গেছেন কুড়ানি ঠাকরুন। সবখানেই বাবারা বলে ডাকলে লোকেরা খ্যাঁক করে ওঠে কেন কে জানে। কাল বিকেলে লোহাগড়ায় এসেছেন। আজিমগঞ্জে একটা লোক বলেছিল, 'বাঁকাশ্রীরামপুর? সে তো শুনেছি লোহাগড়ার ওদিকে।' তারাই বৃদ্ধাকে টিকিট কেটে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছিল। ট্রেনের কামরার একজনকে বলে দিয়েছিল লোহাগড়ায় নামিয়ে দিতে। কিন্তু নামার পর আবার একই অবস্থা। জিগ্যেস করলে ভিখারিনী ভেবে কেটে পড়ে লোকেরা। কেউ যদি বা কান পাতে, বাঁকা-শ্রীরামপুর সে চেনেই না। আর রেলবাবুদের ডেকে কিছু বলতে গেলে তেড়ে বলে, 'ভাগ্! ভাগ্!' ভোরবেলা বড় শীত পড়েছিল আজ। স্টেশনঘরে উঁকি মারতে গেলে স্টেশনবাবু 'কী চাই' বলে এমন দাবড়ানি দিলেন যে বৃদ্ধার প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম।

জীবনে ছ-ছ'টা দীর্ঘ দশক কাটিয়ে এই প্রথম বাড়ির উঠোন পেরিয়ে বাইরের পৃথিবীতে আসা। সবতাতেই হকচকানি, সব কিছু দেখেই মুখে কথা সরে না। ক্যালক্যাল করে তাকান। কী বলবেন কথা খুঁজে পান না। সব তালগোল পাকিয়ে যায়। বোবাধরা গলায় জড়িয়ে-মড়িয়ে কোনরকমে উচ্চারণ করেন, বাঁকা-ছিরামপুর কেউ কিছু বোঝে না। ভিড় করে লোক গেলেই ডাকেন, 'বাবারা! ওগো আমার বাবারা!'

পরনের থান ময়লায় দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছিল। কাচটা খোয়া গেছে। অতি কষ্টে আড়াল খুঁজে জৈবকর্ম সেরে নিতে হয়েছে। অনেক সময় হাতের কাছে জলও পান নি। আজ মরিয়া হয়েছিলেন সামনে জলকল দেখে। একটা হাঘরে ছেলেকে দশটা পয়সা দিয়ে জল টিপিয়ে নিয়েছেন। থুপথুপ করে কাপড় কাচতে গিয়েও বিপদ। লোকেরা জল খেতে এসে খুব গালমন্দ করেছে।

কাপড় শুকুলে চান করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও সেই ছেলেটাকে দেখতে পেলেন না বৃদ্ধা। নিচে একটু তফাতে পুকুর আছে। পুকুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কাতর দৃষ্টে। অতদূর যাওয়ার চেয়ে ভয়ের কথা, ডুবে গেলে কী হবে? পৃথিবীটা বরাবরই হৃদয়হীন লোকে ভরা। ডুবে গেলে কি তাঁকে কেউ ওঠাবে? কেউ ওঠাবে না! দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখবে।

প্ল্যাটফর্মের ঝাড়ুদারনি এল ঝাঁটা আর বালতি হাতে। আশান্বিতা কুড়ানি ঠাকরুন করুণ হেসে বলতে চাইলেন, 'অ মা! আমার সোনার মেয়ে রে! একটুখানি জল টিপে দে না, মাথায় দি।' কিন্তু বাক্যটা গলার কাছ থেকে জিভ পর্যন্ত উঠে এসে সেঁটে গেল। ঝাড়ুদারনি চোখ কটমটিয়ে তাকাচ্ছিল। জীবনে

কখনও টিউবওয়েল টেপেন নি বৃদ্ধা। ঝাড়ুদারনি চলে গেলে নলের তলায় মাথা রেখে হাত বাড়িয়ে চাপ দিলেন হাতলে। কয়েকটা ফোঁটা জল পড়তে না পড়তে তেড়ে এল একটা লোক। 'এটা কি চান করার জায়গা? এই বুড়ি! ভাগ! পুকুরে যা।'

স্টেশনেই চায়ের দোকানে পাঁউরুটি-চা খেয়ে আজও অন্যদিনের মতো দুপুরটা গেল। কতদিন ভাত খাওয়া হয় নি! কোথায় ভাত পাওয়া যায় তাও জানেন না। পয়সাকড়ি যেটুকু আছে, খাওয়া কি আর যেত না? কলা খেতে সাধ হয়েছিল। দাম শুনে আঁতকে উঠেছিলেন, একজোড়া ওইটুকুন কলা চার আনা দাম? বসন্তপুরে খিড়কির ডোবার ধারে কী প্রকাণ্ড কলা ফলে। বস্তায় জড়িয়ে সিন্দুকে পাকাতে দিতেন। কেউ কিনতে এলে দরাদবি করতেন না। গাছের ফল নিজের হাতে লাগানো।

বাইরের পৃথিবীর কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে অবাক হতে হতে কুড়ানি ঠাকরুন এখন হতাশ হয়ে পড়েছেন। ধরে নিয়েছেন, এটাই নিয়ম। তিনিই কেবল অন্যরকম মানুষ। বাইরে যতক্ষণ আছেন, তাঁকে তাই ততক্ষণ ওইরকম হয়েই চলতে হবে। কোনো ভিখারি তাঁকে খেতে দেখে ভাগ চাইলে আর দেন না। মুখ গোমড়া করে অন্যদিকে তাকিয়ে দ্রুত চিবোতে থাকেন। ন্যাংটা হাঘরে বাচ্চাগুলো প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে তাঁর খাওয়া দেখে। আড়চোখে দেখতে দেখতে গাল দেন। মনে মনে বলেন, 'শত্তুর! শত্তুর!'

এত যে কষ্ট, অথৈ সাগর, তবু কুড়ানি ঠাকরুন হাল ছাড়েন নি। দিনে দিনে জেদটা বেড়ে গেছে। বেরিয়ে যখন পড়েছেন, তখন বাঁকাশ্রীরামপুরে না পৌঁছে ছাড়বেন না। এ গোঁ তাঁর ছোটবেলায় কি কম ছিল? বাবা রাগ করে বলতেন, 'ওই গোঁ তোর কাল হবে কনক। বলে দিচ্ছি, ওতেই তোর সর্বনাশ হবে।' কনক বুঝত না সর্বনাশ ব্যাপারটা কী। আজও কি বুঝল এ সাতাত্তর বছর বয়সে?

বিকেলে কাচা থান পরে বসে আছেন, এমন সময় একটা লোক এসে স্টেশন-ঘরের সামনে বেঞ্চটায় বসলেন। রোদ পুইয়ে ঝিমুনি ধরেছিল। থামে হেলান দিয়ে ঝিমুতে এসেছেন কুড়ানি ঠাকরুন। লোকটাকে দেখে ঝিমুনি কেটে গেল। পরনে পানজাবি-ধুতি, গায়ে শাল, হাতে একটা লাঠি। গোঁফ আছে পুরুষ্টু। মাথায় টাক। ঠিক যেন বাঁকা-শ্রীরামপুরের সেই গোমস্তামশাই। লোকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোথা যাওয়া হবে বুড়িমা?

কুড়ানি ঠাকরুন এতদিন পরে আর অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। তারপর পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিতে আসছে, তখন বৃদ্ধা জোরে হাত নেড়ে বললেন, 'পয়সা চাইনি বাবা। একটা কথা শুধোব।'

'বলো বুড়িমা।'

এরপর দুজনের মধ্যে এইসব কথাবার্তা হল।

'বাঁকা-ছিরামপুর যাব বলে বেরিয়েছিলুম বাবা। আজ কী বার?

'শনিবার।'

'গত মঙ্গলবারের আগের মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা রেলগাড়িতে চাপলুম। তাহলে কদিন হল?'

'মঙ্গল-মঙ্গল আট। আজ শনি। বুধ বেস্পতি শুক্কুর গেল এগারো। আজ নিয়ে বারো।'

'বারোদিন ঘুচ্ছি এ ইস্টেশন থেকে সে ইস্টেশনে।'

'সে কী বুড়িমা? কেন, কেন?'

'বাঁকাছিরামপুর যাব বলে। আমার কপাল বাবা।'

'কৈ, এমন জায়গার নাম তো কখনও শুনি নি।'

'গাঁয়ের পরে মাঠ। মাঠের পরে যেন আবার গাঁ ছিল। তারপর যেন ইস্টেশান।'

'কী স্টেশন?'

'সেটাই তো খ্যাল 'করি নি। তখন ছোট বয়েস। খপ্প মেয়ে। বাবা কোলে করে নিয়ে গিয়ে…'

'কী কাণ্ড। কোত্থেকে আসছ বলো তো আগে।'

'বসন্তপুর। ওইখেনে শউরমশায়ের বাড়ি। আর বাঁকাছিরামপুর আমাব বাপের বাড়ি।'

'বসন্তপুব! ওরে বাবা! সে তো অন্য লাইনে। অনেক দূর এখান থেকে। এলে কিভাবে? পায়ের অবস্থা তো এই।'

'সঙ্গে কেরাচ ছিল। আমার স্বামী এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে।'

'কী? ক্রাচ?'

'হ্যাঁ বা। তা যার সঙ্গে এলুম রেলেরই লোক ছিল। মধুর গোঁসাই নাম। মিনসে আমাকে নিমতিতে এস্টেশানে নামাল। রেতের বেলা বড্ড শীত। তখন আমার গায়ে ওর কম্বলখানা চাপিয়ে পর্যন্ত দিলে। বুঝতে পারচ বাবা, কী বুদ্ধি ওলাওঠোর? আমি ঘুমোলে ওর চুরি করে কেটে পড়ার সুবিধে হবে।'

'তারপর, তারপর ?'

'ঘুমও এসেছিল অনেককাল পরে। বুড়োবয়সে এতদিনে বাপের বাড়ি যাচ্ছি। প্রাণে বড় শান্তি। তখন মিনসে আমার পেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে পয়সা হাতড়াচ্ছে। খপ করে ধরতে গেছি। কেটে পড়ল।'

'তুমি চেঁচালেনা কেন ? লোকে তাকে ধরে পিটুনি দিত।'

'ভয় লেগেছিল বাবা। এ বয়সে পরভরসা করে বেরিয়েছি। বিদেশবিভুঁই জায়গা।'

হুঁ। তারপর ?'

'ওলাওঠো মিনসে কখন বুদ্ধি করে আগে থেকে আমার কেরাচখানা সরিয়েছিল। কেন বুঝলে তো ?'

'হুঁউ। তা আর বুঝলুম না। তুমি ওকে তাড়া করবে বলে। তবে কম্বলখানা তোমার লাভ হল বলো ?'

'তা হল। তবে কেরাচখানা আর পেলুম না। শেষে লোকে আমার কথা শুনে বলল, বুড়িমা, তুমি ফিরে যাও। আমরা গাড়িতে তুলে দিচ্ছি। আমি বাবা মনে মনে পিতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, বাঁকাছিরামপুরে বাপের ভিটেয় প্রণাম না করে ফিরব না।'

'কী মুশকিল ! তারপর কী হল ?'

'দুদিন ওখেনে থাকলুম। শেষে একজন বললে, বাঁকাছিরামপুর সাহেবগঞ্জের কাছে। সেখানে গেলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম, বাঁকাছিরামপুর লোহাগড়ার কাছে।'

'বুড়িমা ! আর এমন করে ঘুরো না। মারা পড়বে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'তুমি চেন না বাবা বাঁকাছিরামপুর ?'

'নামটা শোনা লাগছে। কিন্তু কোথায় তা বলতে পারব না।'

'একবারে আমার হয়ে রেলের লোককে শুধোও না বাবা। আমি শুধোতে গেলে তেড়ে আসে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুড়িমা ! বাড়ি ফিরে যাও। বাড়িতে কে আছে তোমার ?'

'দুই নাতনি আছে বাবা। আর কেউ নেই।'

'তাদের কাউকে সঙ্গে আননি কেন ?'

'তারা ছিক্কিত মেয়ে। আমার সঙ্গে আসবে কেন ? আর আসবেই বা কী করে ? দুই সোমত্ত মেয়ে। একজন এলে একজন থাকবে কি করে ? আবার দুজনায় এলে বাড়িতে ফুলফলের গাছটা আছে—সব নষ্ট হয়ে যাবে।'

'তোমার কাণ্ড দেখে রাগ হচ্ছে, আবার দুঃখও হচ্ছে। হ্যাঁ গা বুড়িমা, নিজের বাপের গাঁ কোথায় তা জানো না—এটাই বা কেমন কথা হল ?'

'বাবা! সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল। তারপর আর বাপের খবর পাইনি। কেউ আমারও খবর করে নি। সে কতকাল আগের কথা।'

'হাত্তেরি! এতকাল ইচ্ছে করেনি বাপের গাঁ যেতে ?'

'ইচ্ছে তো করত। নিয়ে কে যাবে ?'

'কেন ? তোমার স্বামী।'

'সে বেঁচে নেই, বাবা।'

'যখন বেঁচে ছিল, তখন নিয়ে যায় নি কেন ?

'সে বড় কড়া লোক ছিল। বড় শক্ত পেরান। হ্যাঁ, দয়াধম্ম না ছিল, এমন নয়। তবে বাবার কথা তুললেই বলত, তুলে আছাড় মারব। চুপ করে থাকো। বাবা, আমি খোঁড়া মেয়েমানুষ। নাচার।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা ?'

'মেয়ে তো পেটে ধরি নি। মেয়ে থাকলে মায়ের দুঃখু বুঝত। একটা ছেলে ছিল। সে আলসে বোমভোলা স্বভাবের। যোয়ানবয়সেই পেটে শূল হয়ে মারা গেল।'

'শোনো বুড়িমা। আমি আজিমগঞ্জ জংশনে যাচ্ছি। তোমাকে নিয়ে যাই। ওখানে বসন্তপুরের গাড়ি ধরিয়ে দেব। গাড়ির লোককে বলে দেব। নামিয়ে দেবে। বাড়ি ফিরে যাও।'

'শুধোও না বাবা টেশানবাবুদের বাঁকাছিরামপুর···'

'হাত্তেরি। মারা পড়বে—একেবারে মারা পড়বে! আমার কথা শোনো। বাড়ি গিয়ে তোমার সেই শিক্ষিত নাতনীদের বলো, কোথায় বাঁকাশ্রীরামপুর তারা খুঁজে বের করুক। সদরে ডি এম অফিসে—মানে কালেকটারিতে খুঁজলে পাবে। ল্যাণ্ড রেভেনিউ অফিসে খুঁজলে পাবে। বলিহারি তাদেরও আক্কেল বটে বাপু! বুড়ো ঠাকুমা তার ওপর খোঁড়া মানুষ। তাকে এমন করে·· হ্যাঁ গা, তারা এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে ?'

'না বাবা! আমার নাতনিরা বড় ভাল মেয়ে। ছোটটা তো ইংরেজি বই পড়ে সারাদিন।'

'রাখোদিকি। চলো আমার সঙ্গে।'

এইসময় একজন এসে বলল, 'কী হরিদা! বুড়ির সঙ্গে কী অতক্ষণ বকবক করছ ? হলটা কী ?'

হরিবাবু বললেন, 'এই যে রক্ষাকর, চললে কোথায় ?'

'ধুলিয়ান যাব। তুমি ?'

'আজিমগঞ্জ।'

'ভালই হল। আজিমগঞ্জ পর্যন্ত একসঙ্গে যাই।'

কুড়ানি ঠাকরুন ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দুজনে তাঁর কথা ভুলে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে টিকিট কাটার ঘণ্টা বাজল। তখন হরিবাবু বললেন, 'ও বুড়িমা। টিকিটের পয়সাকড়ি আছে তো সঙ্গে ? না থাকলে আমি কেটে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধা চুপ করে থাকলেন। চোখে জল পড়তে থাকল। পৌছতে পারলেন না বাপের ভিটেয়। পৃথিবীটা এত বড়, এমন অথৈ সাগর। ঢেউয়ে নাকানি চুবানি খাওয়াই সার হল।

রক্ষাকরবাবু বললেন, 'কী ব্যাপার ?'

'পরে বলছি হে। যাচ্ছ নাকি টিকিট কাটতে ? দুটো আজিমগঞ্জ কেটে আনো তো। পয়সা নিয়ে যাও।'

এবার কুড়ানি ঠাকরুন পেটে হাত ভরে কাপড়ের ভেতর ন্যাকড়ার গিঁট খুলতে থাকলেন। এভাবে বরাবর পয়সা বের করা অভ্যাস আছে। হাত দিয়ে বুঝতে পারেন মুদ্রা বা নোটের অংকটা কত।...

অপূর্বের ঘটকালি

বিপাশা খুব অসুস্থ খবর পেয়েও শতদ্রু বসন্তপুরে যায় নি। বাবা-মায়ের ওপর ভীষণ খাপ্পা সে। তার পছন্দ করার মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে অমত বলে নয়, ওঁদের মানসিকতার সঙ্গে এতকাল পরে এ ছিল একটা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। এমনিতেই বাবা-মায়ের সংসর্গের বাইরে কেটেছে শতদ্রুর। তাছাড়া কখনও এমন কোনো পরিস্থিতি দেখা দেয়নি, যাতে ওঁদের সঙ্গে তার কোনো সংঘাত বাধবে।

আসলে লজ্জা হচ্ছে নিজের কাছেই। বিয়ে কি তার মাথায় চড়েছে ? বিয়ে করতেই হবে এমন কোনো ইচ্ছা নিয়ে সে দেশে পাড়ি জমায় নি। নেহাত

কথাটা উঠেছিল এবং তারও মনে হয়েছিল, বিদেশে একজন এদেশী সঙ্গিনী থাকলে মন্দ হয় না।

ব্যাপারটা খুব সহজ পথে চলতে পারত। কিন্তু এ এক অপমানজনক অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল। সবাই ভাবছে মেয়েটির সঙ্গে তার বুঝি দারুণ প্রেম। অপরূপাকে মরিয়া হয়ে একটা চিঠি লিখে ফেলেছিল। এখন পস্তাচ্ছে, সেটা বিশ্রি হঠকারিতা হয়ে গেছে। ছি ছি, কী ভাববে রঞ্জনা?

এদিকে বসন্তপুর থেকে দুবেলা ট্রাংককল ব্রজেন্দ্রর কাছে কৃষ্ণনাথের। ব্রজেন্দ্র বলেন, 'বুঝতেই পারছ ভায়া, আর সে সাটলেজ নেই। বিদেশ থেকে ফিরে দিনকতক যেটুকু বা গ্রাহ্য করছিল আমায়, এখন আর তাও করে না। কোথায়-কোথায় ঘোরে। ফেরে অনেক রাতে। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয় না। বরং তোমাদের ছেলে, তোমরা এসে দেখ কী করতে পার।'

ব্রজেন্দ্রও কৃষ্ণনাথের ওপর চটেছেন। এখনও লোকটা সেই জেদী গোঁয়ো থেকে গেলেন। এখনও হাড়ে-হাড়ে জমিদারী গোঁয়ার্তুমি! দিনকাল কত বদলেছে টের পান না কৃষ্ণনাথ। ব্রজেন্দ্র ভেবে পান না উনি কন্ট্রাকটারি করতেন কেমন করে? ও কাজ তো মানুষকে আগাপাছতলা বদলে দেয়। লজ্জা ঘেন্না ভয়, তিন থাকতে কন্ট্রাকটারি নয়। প্রয়োজনে অনেক সময় তুচ্ছ লোকেরও জুতো বইতে হয়। তাছাড়া কৃষ্ণনাথ নিরীহ সজ্জন মানুষও নন। যা করতে চান, করতেই তো পারেন। তাঁকে ঠেকাবে কে? সম্ভবত কৃষ্ণনাথের চরিত্রেরই এ এক অসঙ্গতি। নাকি মফস্বলের মানুষের এটাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য? ব্রজেন্দ্র ভেবে কুল পান না! ওদিকে বিপাশার কী অদ্ভুত অসুখ—হিস্টিরিয়া বলেই মনে হচ্ছে। মেয়েকে এনে কলকাতায় সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে দেখাক। পরামর্শ দিয়েছেন ব্রজেন্দ্র। বুঝতে পারছেন না ওরা কী করবে। কৃষ্ণনাথ বলেছেন, 'দেখা যাক।' ভারি অদ্ভুত লোক এই কৃষ্ণনাথ।

ভোরে উঠে ব্রজেন্দ্র এক চক্কর ঘুরে আসেন গঙ্গার ধারে। স্নান সেরে ফেরেন। গাড়ি নিয়েই বেরোন। ফিরে এসে দেখলেন শতদ্রু ব্রেকফাস্ট টেবিলে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ব্রজেন্দ্র ভুরু কুঁচকে ভাগ্নের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, হঠাৎ সুমতির উদয় যে '

শতদ্রু আস্তে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

'তাই বুঝি?' ব্রজেন্দ্র একটু হাসলেন। 'আমি ধরেই নিয়েছিলুম তোমার সব কথা আজকাল অপুর সঙ্গে থাকে। আমি এখন ওল্ড হ্যাগার্ড। রটন্ পিস। কদিন বাদে কেওড়াতলা চলে যাব।'

শতদ্রু বুঝল, মামার অভিমান হয়েছে। বলল, 'দোষত্রুটি থাকলে নিজগুণে মার্জনা করে দেবেন। কদিন পুরনো বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলুম।'

ব্রজেন্দ্র হো হো করে হাসলেন। 'নেভার মাইণ্ড। তোমার সাতখুন মাফ।'

'আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে।'

'খুব বুঝেছি। অপুর মাথায় কুলোয় নি।'

'না মামাবাবু। কোনো প্রব্লেম-টব্লেম নয়।' শতদ্রু একটু গম্ভীর হল 'আমি ঠিক করেছি, এ সপ্তাহেই চলে যাব।'

ব্রজেন্দ্র কিছু না বুঝে খুশি হয়ে বললেন, 'ভাল কথা। খুবই ভাল।'

'আমি স্টেটসে ফিরে যাব, মামাবাবু। আমার একেবারে ভাল লাগছে না। মানে, ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। দম আটকে যাচ্ছে...'

ব্রজেন্দ্র তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে।

'আমার জয়েন করার কথা সেভেন্থ্ মার্চ। আজ ফেব্রুয়ারি সেকেণ্ড। এখনও আরবানার রাস্তায় হয়তো বরফ গলে নি। ল্যাণ্ডলেডি মিসেস বারবারা লিখেছেন, এবার শীতটা বড্ড বেশি। তুমি গ্রীষ্মের দেশে গিয়ে বেঁচেছ।' শতদ্রু বলতে থাকল। 'আমি ওঁকে লিখে দিলুম, আরবানা হিলসে স্কি করার জন্য পা সুড় সুড় করছে।' শতদ্রু শুকনো হাসল।

ব্রজেন্দ্র গুম হয়ে বললেন, 'বিয়াস ভীষণ অসুস্থ। তাছাড়া...'

শতদ্রু মুখ নামিয়ে বলল, 'শি ইজ সাইকিক। ছোটবেলা থেকেই। আমার করার কিছু নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট দিয়ে চিকিৎসা করালেও সারবে কি না জানি নে। বাবার যাবতীয় কমপ্লেক্স নিয়ে ও জন্মেছিল।'

ব্রজেন্দ্র ফোঁস করে উঠলেন। 'সাহেবদের দেশে থেকে তুমিও দেখছি ওদের মতো দেউলে হয়ে গেছ সাটলেজ! মূল্যবোধগুলোও হারিয়ে ফেলেছ দেখছি। নিজের বোন সম্পর্কে তোমার এমন কথাবার্তা তো ভাল ঠেকছে না!'

'সায়েবদের মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মামাবাবু।'

মনে মনে আহত হলেন ব্রজেন্দ্র বললেন, 'তোমার ব্রেনওয়াশের বাকি রাখেনি দেখছি।'

'এখানে সবাই তা আমাকে বলছে বটে।'

'তুমি বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে, মাইণ্ড দ্যাট।'

'আপনি তো জানেন, ওসব কথা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি নি।'

'ভাবা উচিত ছিল।'

শতদ্রু একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'সম্ভবত আপনিই সেকথা ভাবার সুযোগ দেন নি—মনে করে দেখুন মামাবাবু! বসন্তপুর গিয়ে একদিন দেরি করলে আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। লোক পাঠাতেন। ফিরে এলে বলতেন, ওই কুৎসিত গ্রাম্য পরিবেশে বেশদিন থাকলে আমি বিগড়ে যাব। বলতেন না?'

'সে তো তোমার ভালর জন্যই বলতুম।' ব্রজেন্দ্রের মুখ লাল হয়ে গেল। 'যতসব ডাকাত আর বদমাসের জায়গা। বসন্তপুরে কে এক ডাকাতসর্দার ছিল নাকি—মেয়ে লুঠ করে এনে আটকে রাখত ঘরে। আইনকানুনের বালাই ছিল না তোমাদের গ্রামে। কত কথা শুনেছি। বীভৎস সব ঘটনা।' ব্রজেন্দ্র আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরও যদি সাংঘাতিক কিছু শুনতে চাও শোনাতে পারি। শুনলে বুঝতে, কেন শমির ছেলেকে এখানে রেখে মানুষ করতে চেয়েছিলুম!'

শতদ্রু গতিক দেখে সাবধান হল। হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি কিছু জানতাম না মামাবাবু।'

'বাবা অত জানলে শমির বিয়ে ওখানে দিতেন না। তোমারও জন্ম হত না।' ব্রজেন্দ্র হঠাৎ একটু শান্ত হলেন। 'জমিদারবংশের ছেলে বলে বাবা ওই ভুলটা করে বসলেন।'

'কী ভুল?

'ওসব কথা তোমার শুনতে নেই। তোমাদের ফ্যামিলির স্ক্যাণ্ডাল। আমার এসব আলোচনা করার প্রবৃত্তি হয় না।'

'বলুন না মামাবাবু। আমার জানা দরকার।'

ব্রজেন্দ্র আরও শান্তভাবে বললেন, 'ছেড়ে দাও। শুধু জেনে রাখো, তোমার মায়ের জীবন খুব সুখের ছিল না। এতকাল পরে বেচারী সম্ভবত একটু সুখশান্তি পেয়ে থাকবে। কারণ তোমার বাবার সে বয়সও নেই—দিনকালও বদলেছে।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'আমারও বরাবর ধারণা, বাবা খুব সচ্চরিত্র মানুষ ছিলেন না। দুএকবার নাকি মার্ডারকেসেও জড়িয়ে পড়েছিলেন।'

ব্রজেন্দ্র কোনো কথা বললেন না। কফি শেষ করে উঠলেন।

শতদ্রু বলল, 'আমি ভাবছি আজই প্লেনের টিকিট কেটে ফেলব। নেক্সট-উইকে রওনা হব।'

'তোমার ইচ্ছা।' বলে ব্রজেন্দ্র করিডোর পেড়িয়ে তাঁর লিভিং রুমে ঢুকলেন।

শতদ্রু বেরিয়ে পড়ল।

এয়ার অফিসে যাবার পথে ভাবল একবার অপূর্বর কাছ হয়ে যাবে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সে সাকসেনা বিল্ডিংয়ের চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। লিফটের সামনে যেতেই সোমার সঙ্গে দেখা। সোমা মিষ্টি হেসে বলল, 'হাই!'

এবারে এসে দুবার সোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে শতদ্রুর। অপূর্বর সঙ্গে একটা অনুষ্ঠানে নাচ দেখতে গিয়েছিল সোমার গ্রুপের। সোমা বলেছিল, 'হচপচ গোছের জাস্ট এ ভ্যারাইটি। শুধু কথকে জমে না।' আরেকদিন হুট করে একা হাজির হয়েছিল শতদ্রু ওর ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। ওখানে সোমা মাঝে-মাঝে একা এসে থাকে। আসলে ওটাই তার গ্রুপের আড্ডা। প্রশস্ত একটা লিভিং রুমে শক্ত কাশ্মীরী কার্পেট পাতা। বাদ্যযন্ত্রে ভর্তি ঘরটা। ওখানে দাঁড়ালে পর্দার আড়ালে সোমার শোবার জায়গা নজরে পড়ে। বেডের দেয়ালে কাঠের থাকে সাজানো স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার। ডাইনে ডাইনিং স্পেস। বেশ চওড়া। টেবিলের দুদিকে কেন ছটা চেয়ার বুঝতে পারে নি শতদ্রু। কোণায় টিভি। টিভি দেখার জন্য সোফাও আছে। তার লাগোয়া কুকিং রেঞ্জ।

শতদ্রু মনে মনে হেসেছিল। 'ইওর গ্র্যাণ্ড হোটেল ইজ নট সো গ্র্যাণ্ড!' মনে পড়ে গিয়েছিল কথাটা। একজন সাধারণ মারকিনের জীবনযাপনের উপকরণ এবং গৃহসজ্জা এর চেয়ে অনেক গুণে সুন্দর এবং আরামদায়ক। বাথরুমের কার্পেটেও পা দেবে যায় কয়েক ইঞ্চি।

সোমা সেদিন একটা ইউরোপীয় কনসার্টের সঙ্গে ভারতীয় কয়েকটা ক্লাসিক নাচ মিশিয়ে নতুন কিছু তৈরি করার নমুনা দেখিয়েছিল। ওর গ্রুপের আরও দুটি মেয়ে ছিল। উর্মিলা যোশি আর নিনা পারভেজ। সাড়ে পাচটায় ওরা চলে গেলে সোমা বলেছিল, 'কী মনে হচ্ছে? ওয়েস্টে এসবের খাতির হবে না? আপনার কী মত?'

শতদ্রু নাচগান বোঝে না। বলেছিল, 'হওয়া তো উচিত।'

'কেন ওকথা বলছেন বলুন তো? আপনি কি ওদের ব্যালে কোনো ধরনের পারফরমেন্স দেখেন নি?'

'দেখেছি।'

সোমা তার কাঁধের কাছে সোফার হাতায় বসে বলেছিল, 'আপনি এমন ইনডিফারেন্ট কেন সব কিছুতে?'

'তাই কি?'

'আই থিংক সো।'

'আসলে আর্ট ব্যাপারটাই আমার মাথায় ঢোকে না।'

সোমা হেসে অস্থির। 'ইউ লুক জাস্ট লাইক এ্যান আর্টিস্ট। আপনাকে দেখেই প্রথম কী মনে হয়েছিল বলব? পেন্টার। আপনি…ওয়েল, ওই ছবিটা দেখছেন। ওটা আমার এক বন্ধুর আঁকা। উষা গ্যাডগিলের নাম নিশ্চয় শুনেছেন। লস এ্যানজেলসে একজিবিশন করল মাস দুই আগে।'

সোমা অনর্গল এধরণের কথা বলছিল। তার ফাঁকে দুটো বিয়ার এনেছিল। শতদ্রুর মনে হয়েছিল, সোমার সঙ্গে একজন মারকিন মেয়ের তফাত কতটুকু? তাছাড়া ওর বাবা-মা এমন অঢেল স্বাধীনতা দিয়েছেন মেয়েকে—যদিও ভেতর-ভেতর সোমাকে পাত্রস্থ করার তাগিদও ভারতীয়মতে চলেছে। সোমার স্বাধীনতায় তাহলে কোথাও একটা অচিহ্নিত সীমা রয়ে গেছে যেন।

আজ লিফটে ঢুকে সোমা চোখে হেসে বলল, 'অপূর্বর কাছেই যাচ্ছি।'

লিফট থেকে নেমে শতদ্রু বলল, 'আমি স্টেটসে ফিরে যাচ্ছি শিগগির। আজই এয়ার অফিসে যাব। ভালই হল আপনার দেখা পেয়ে। বিদায় জানিয়ে দিলাম। অ রিভোয়া!'

সোমা বলল, 'সে কী! বলছিলেন যে আফটার থ ফিরবেন? এনিথিং হ্যাপনড বাই দিস টাইম?'

'নাঃ।' শতদ্রু মাথা দোলাল। 'এমনি। আসলে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।'

সোমা সায় দিয়ে বলল, 'তা ঠিক। দেখুন না, আমিও ঠিক অ্যাডজাস্ট করে চলতে পারি না। দিনে দিনে কেমন আনহ্যাবিটেবল হয়ে যাচ্ছে না কলকাতা? কদর্য ভিড়। ভ্যাণ্ডালিজম। ওমাসে রবীন্দ্রসদনে আমাদের একটা বড় পারফরম্যান্স নষ্ট হয়ে গেল। কী অবসিন সব রিমার্ক পাস করে অডিয়েন্স থেকে, কানে আঙুল দিতে হয়।'

কথা বলতে বলতে করিডোর দিয়ে হেঁটে ওরা অপূর্বর চেম্বারে ঢুকল। দুজনকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে অপূর্ব হকচকিয়ে গেল। তারপর ফিক করে হেসে বলল, 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম জানি না। খুঁজে তাকে বের করে কিছু উপহার দেব বরং।'

সোমা বসে বলল, 'বেশি কিছু আশা কোরো না অপূর্ব। এমনও হতে পারে তোমার ঘাড় ভাঙতে এসেছি আমি। ওঁর কথা আলাদা। উনি তোমার কাজিন ব্রাদার।'

অপূর্ব ভয় পাওয়ার ভান করে বলল, 'তোমার ফর্ম্যাল এ্যাণ্ড ভেরি সিরিয়াস মুড দেখলে আমার সত্যি বড় আতঙ্ক হয়, সোমা। সো মাচ বিজনেসলাইক টক!'

সোমা একটু হাসল। 'ইয়া। দিস ইজ বিজনেস।'

অপূর্ব শতদ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'দেন ইউ ওয়েট, জেণ্টলম্যান।' শতদ্রু ওঠার ভংগি করে বলল, 'সেরে নাও। আমি ততক্ষণ কলকাতাদর্শন করি।'

সোমা তার হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল। 'আপনি বসুন তো। ওর সঙ্গে আমার কোনো...আই মিন, আই হ্যাভ নাথিং প্রাইভেট এ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল উইথ হিম।'

অপূর্ব ওপরে দৃষ্টি তুলে দিয়ে বলল, 'আই নো আই নো। তুম ঔর হাম একদম বোটি ঔর ডাল বরাবর। ঠিক হ্যায় ভাই! কাম অন এ্যাণ্ড লাভ মি।'

সোমা বলল, 'আই লাইক ইউ।'

অপূর্ব হাসতে লাগল। 'শুনলি তো সাট্টু?'

সোমা ভুরু কুঁচকে বলল, 'হোয়াটস দ্যাট? সাট্টু!'

'কিছু না। তুমি শুরু করে দাও।'

সোমা শতদ্রুকে বলল, 'আপনার শতদ্রু নামটাকে টুইস্ট করেছে বুঝি?'

শতদ্রু বলল, 'শতদ্রুর ইংরেজি সাটলেজ। তাই থেকে সাট্টু।'

'মাই গুডনেস!' সোমা অবাক হবার ভংগি করল। 'আমি তো ভেবে দেখিনি—শতদ্রু নামে একটা নদী আছে।'

অপূর্ব বলল, 'ওর বোনের নাম কি জানো? বিপাশা। তাই ডাকনাম বিয়াস।'

'বাঃ! কোথায় থাকেন তিনি?'

অপূর্ব বলল, 'ধাপধাড়া-গোবিন্দপুরে।'

'সে কোথায়?'

'ধরে নাও জাস্ট এ প্লেস।'

সোমা কপট রাগ দেখিয়ে বলল, 'ইউ অলওয়েজ টক নানসেন্স। শতদ্রু, আপনার সেই গ্রামের নামটা কী যেন বলছিলেন—ভেরি সুইট নেম ইনডিড?'

শতদ্রু বলল, 'বসন্তপুর। যদিও বসন্তপুরে বসন্ত আসে বলে মনে হয় না।'

অপূর্ব ভুরু কুঁচকে বলল, 'হাউ ইট ইজ পসিবল?'

সোমা বলল, 'কী ?'

'ওর সঙ্গে কি তোমার কোনো যোগাযোগ আছে—বিয়ণ্ড মাই নলেজ ?'

শতব্রু বলে ফেলল, 'সেদিন ওঁদের গ্রুপের রিহার্সাল দেখতে গিয়েছিলুম।'

'ক্যামাক স্ট্রিটে তো ?'

সোমা দ্রুত বলল, 'ইউ আর গোয়িং বিয়ণ্ড ইওর জুরিসডিকশান।'

'অলরাইট। নো কোশ্চেন বেবি! আই রিট্রিট সেফ্‌লি।'

এরপর কফি এল এবং ফের কিছুক্ষণ এধরণের কথাবার্তা হল। অপূর্ব সবসময় এইরকম স্ফূর্তিতে এবং রসিকতায় থাকে। কফি খাওয়ার পর সোমা তার কথাটা তুলল। পনের ফেব্রুয়ারি তার গ্রুপ টোকিও পৌঁছচ্ছে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থা এ অনুষ্ঠানের হোস্ট। সেখান থেকে আঠারো তারিখে রওনা হবে লসএঞ্জেলস। চেষ্টাচরিত্র করে এ যোগাযোগ ঘটে গেছে। কিন্তু টোকিওতে বাড়তি দুটো দিন যে কাটাবে, তার খরচ কোথায়? ট্রাভেল এজেন্টকে যেমনটি বলেছিল তেমনি ব্যবস্থা হয়েছে। অথচ ঝোঁকের বশে বাড়তি খরচের কথাটা খেয়াল করেনি সোমা। এখন কথা হচ্ছে, অপূর্বদের টোকিও অফিস দুটো শোয়ের ব্যবস্থা করতে পারে কি না স্থানীয় কোনো ক্লাব-টাবকে ধরে? 'ক্রান্তি ট্রুপের' সেরা এ্যাডভেঞ্চার। সোমা তার গ্যারান্টি দিতে রাজি যেভাবে হোক, দুটো মাত্র শো। সেই শো দুটো হতে পারে। ইন্দো-জাপান মৈত্রী সংস্থাকে অবশ্য ধরা যায়। কিন্তু সেটা ওঁদের ওপর অত্যাচারের সামিল হতে পারে। তাছাড়া এমন অনুরোধ করাও তো হ্যাংলামি।

শেষে সোমা করুণ মুখে বলল, 'আই ডিডন্‌ট্‌ থিংক অফ দা আদার সাইড। দ্যাটস মাই ফল্ট। শেষ পর্যন্ত টোকিও থেকে ফিরে আসতে হবে হয়তো। অপূর্ব, উড ইউ প্লিজ···'

অপূর্ব মিটিমিটি হেসে বলল, 'কজন যাচ্ছ তোমরা ?'

'জাস্ট নাইন টু টেন ওনলি।'

'দুদিনের থাকা এবং খাওয়া ?'

'দ্যাটস রাইট।'

'শো না করেও যদি ব্যবস্থা হয় ?'

সোমা লজ্জার ভংগি করে বলল, 'ও নো নো—প্লীজ! সেটা কেমন দেখায়।'

'তুমি কেন ভাবছ এমনি-এমনি আরও অফার জুটবে না। টোকিও ইজ এ ভেরি বিগ প্লেস।'

'অনিশ্চিত তো! যদি—ধরো, আমরা ফেল করি? অডিয়েন্স না নেয় ?'

'আই সি। তুমি বুদ্ধিমতী এবং হিসেবী। তোমার উন্নতি হবে।' বলে অপূর্ব ফোন তুলে পি বি এসে ওভারসি লাইনের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিল। তারপর ফোন রেখে বলল, 'এখন টোকিও লাইন বিজি। বিকেলে পাওয়া সম্ভব। তুমি বরং সন্ধ্যার দিকে আমাকে ক্যালকাটা ক্লাবে একবার রিঙ কোর' কেমন?'

সোমা বলল, 'তাহলে এটাও আনসার্টেন!'

'হতাশ হবার কারণ নেই। আই অ্যাসিওর ইউ।' অপূব বরাভয়ের ভংগিতে হাত তুলল। 'তুমি তৈরি হতে থাকো ততদিনে। নাও, স্মাইল বেবি। জাস্ট আ সুইট স্মাইল!'

সোমা হাসল।

অপূর্ব বলল, 'সাটু, হাসিটা দেখলি? আ লাভলি সানবাইজ না?'

সোমা বলল, 'শাট আপ! ওঁকে জড়াচ্ছ কেন? শতদ্রু, আপনি দেখছেন তো, অপূর্ব বিয়ে করার পর কী বিশ্রিরকমের ডেঁপো হয়ে গেছে! আগে ভীষণ গোবেচারা ছিল।'

'তাই তো হয়। এই যেমন সাটু এখন আছে—বিয়ের পর কি অমনি গোবেচারা থাকবে?'

আবার ফক্কুরি চলতে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সোমা শতদ্রুকে বলল, 'বাই দা বাই, আপনি তখন অ রিভোয়া করলেন। সত্যি কি চলে যাচ্ছেন নাকি?'

শতদ্রু বলল 'হুঁউ। এয়ার অফিসে যাব বলে বেরিয়েছি। যত শিগগির যাওয়া যায়। নেক্সট এ্যাভেলেবল্ ফ্লাইটে।'

অপূর্ব তাকাল ওর দিকে। 'সে কী! বিয়ে না করে ফেরত যাবি? কেন? হল কী তোর?'

'বিয়ে করতে এসেছিলুম বুঝি?'

'সেরকমই শুনেছিলুম।'

শতদ্রু হাসল। সোমা বলল, 'আমি উঠি অপূর্ব। ইভনিংয়ে ক্যালকাটা ক্লাবে তো? শতদ্রু, হোপ টু সি ইউ এগেন। বাই!'

সোমা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অপূর্ব বলল, 'ওয়েট। সোমা, তোমার ট্রাপের সঙ্গে একজন গার্জেন নেবে? লসএঞ্জেলস অব্দি—দেন টু এনিহোয়্যার ইন দা স্টেটস। নিয়ে নাও। আমি দিচ্ছি।

সোমা চোখ বড় করে হাসল। 'মাই গুডনেস! শতদ্রু আপনি টোকিও হয়ে চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমাদের ভীষণ ভাল লাগবে এটা আমার মাথায় আসে নি। রিয়্যালি, ইট উড বি আ প্লেজারট্রিপ।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'তা মন্দ হয় না! আই ক্যান এ্যাফোর্ড ছাট।'

সোমা বলল, 'আমাদের ট্র্যাভেল এজেন্টকে বললে আপনার বুকিং এ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাবে। চলুন, ওদের অফিসে নিয়ে যাই আপনাকে। এই বিল্ডিংয়েই গ্রাউণ্ডফ্লোরে।'

দুজনে বেরুতে যাচ্ছে, অপূর্ব বলল, 'আমার একটা ধন্যবাদ প্রাপ্য ছিল ডালিং!'

সোমা ঘুরে বলে গেল, 'যথাসময়ে পাবে। সব কিছু ম্যাচিওর হতে দাও— তবে না?'

লিফটে দুজনে নেমে গেল নীচের তলায়। ফুটপাতে নেমে গিয়ে ট্রাভেল এজেন্সিতে ঢুকল। লাল কার্পেট মোড়া মেঝের একপাশে কয়েকটা গদিআঁটা চেয়ার এবং সোফাসেট। টেবিলে অনেক রঙীন পত্রিকা। দুজন সায়েব ট্যুরিস্ট বসে আছে। সোমা বলল, 'টোকিওর প্রব্লেমটা মাথায় এমনভাবে ঢুকে ছিল যে এব্যাপারটা আমি চিন্তাও করি নি। অপূর্ব সত্যি একটা জিনিয়াস। ওর মাথায় সব দ্রুত খেলে যায়। কিন্তু···'

তাকে থামতে দেখে শতদ্রু বলল, 'কিন্তু?'

'ও কিছু না।' সোমা ঘড়ি দেখে বলল, 'এই রে! সাড়ে বারোটা! আই অ্যাম সো ফুলিশ টু মিস এ্যান এ্যাপোয়েন্টমেন্ট। অপূর্বটা যা দেরি করিয়ে দিল না! যাক্ গে, এখন হাতে প্রচুর সময় পাওয়া গেল। শতদ্রু, বাইরে কোথাও আমরা ডিনার সেরে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরতে পারি। কী? আপত্তি আছে?'

শতদ্রু বলল, 'না।'

'থ্যাংকস্। আসুন।' সোমা ট্রাভেল এজেন্টের চেম্বারের পর্দা তুলে ঢুকল। শতদ্রু তাকে অনুসরণ করল।···

কুড়ানি ঠাকরুনের প্রত্যাবর্তন

বারোদিনের দিন সন্ধ্যায় কুড়ানি ঠাকরুন বাড়ি ফিরেছেন। কে দয়া করে সাইকেল রিকশোয় তুলে দিয়েছিল বসন্তপুর স্টেশনে। পাদানিতে বসে দুহাতে রড আঁকড়ে ধরে এসেছেন। রিকশোওলার ডাকাডাকিতে দুই বোন দরজা খুলে অবাক।

আর সেই কুড়ানি ঠাকরুন নেই, এ অন্য মানুষ। অথর্ব জরোদ্গব লোল অস্থিচর্মসার এক বুড়ি। মুখের দিকে ক্যাল-ক্যাল করে তাকান। পাঁচটা কথা বললে কোনরকমে একটা জবাব দেন। সেও খুব স্পষ্ট নয়। জীবনের সব কথা যেন শেষবারের মতো বলে নিয়েছেন লোহাগড়ায় এক হরিবাবুর সঙ্গে। নাতনিরা বুঝতে পেরেছে কী ঘটেছিল। দুদিক থেকে দুজনে ঝাঁঝালো স্বরে চেঁচিয়েছে, 'বাড়ি ফিরতে কী হয়েছিল তাহলে? যখন দেখলে ওই অবস্থা—অ্যাঁ? বেশ হয়েছে তোমার। বোকা মেয়ে কোথাকার?'

রঙ্গনা পরে বলেছে, 'আমাদেরই ভুল হয়েছিল রে দিদি! আমরা কেউ খোঁজ নিতে গেলুম না কেন? কিংবা কাউকে পাঠালুম না কেন?'

অপরূপা চোখ পাকিয়ে বলেছে, 'এখন তো বলছিস। তখন মাথায় এসেছিল কি? আর লোকের কথা বললি, কে তোর লোক শুনি? কগণ্ডা লোক পাবি তুই বসন্তপুরে? মুখে রক্ত উঠে মরলেও কি দেখতে আসবে ভেবেছিস? থাম্।'

বৃদ্ধা যে অতগুলো দিন প্রায় না খেয়ে কাটিয়েছেন বোঝা গেছে। এসে যা গোগ্রাসে ভাত খেলেন, দেখে অবাক লাগে। পরদিন দুইবোন ইঁদারাতলায় ফেলে রগড়েছে ঠাকুমাকে। গরম জল আর সাবান ঘষে ময়লা সাফ করে দিয়েছে। অতিকষ্টে একবার বলেছিলেন, 'না-না। সাবুন মাখতে নেই ভাই'—কে শোনে ধর্মের কথা? বসন্তপুরে এই এক বুড়ি বিধবা যিনি হবিষ্যি না করতে পাকন, এক'দশীটা বরাবর পালন করেছেন—কিন্তু তীর্থধর্ম বরাতে জোটেনি। গৌরবাবু গোঁফখেজুরে মানুষ ছিলেন। সময়ও পেতেন না। শুধু অনি আশ্বাস দিত, 'বোসো বুড়ি! তোমায় মথুরা-কাশী-বৃন্দাবন সব ঘুরিয়ে আনব। যত পাপ করেছ, সব ধুইয়ে আনব প্রয়াগে।' অনিকে একঘটি গঙ্গাজলের জন্যে মাথা ভাঙতেন। রঙ্গনা এনে দিত মাঝে মাঝে ছকা পাণ্ডার কাছ থেকে। ছকাও দিয়ে যেত কখনও ফুল নিতে এসে! ও-মাকে নাতনিদের বলেছিলেন, 'মকর-সংক্রান্তিতে একবার গঙ্গাসাগর নিয়ে যাবি আমায়? শুনলুম এখান থেকে বাসমোটরে করে সবাই যাচ্ছে।' নাতনিরা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'থামো! আদিখ্যেতা কোরো না। এককেজনের ভাড়া কত জানো?'

এবার অপরূপা হাসতে হাসতে বলে, 'ওই ভেবে নাও, তীর্থ করে এলে। প্রচুর পুণ্য হয়ে গেছে তোমার।'

মধু ছুতোর অবস্থা দেখে জিভ চুকচুক করে কয়েকঘণ্টার মধ্যে একটা কাঠের ক্রাচ বানিয়ে দিয়ে গেছে। কিন্তু কুড়ানি ঠাকরুনের গায়ে আর একটুও জোর নেই। ক্রাচটাও ভারি অবশ্য। সেটা পড়ে থাকে বারান্দায়। বৃদ্ধা পাছা

ঘষড়ে একটু আধটু চলাফেরা করেন। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন ফলফুলের উদ্ভিদের দিকে। শীর্ণ আঙুলে স্পর্শ করেন তাদের। ছুতোরের মেয়েটি আগের চেয়ে ন্যাওটা হয়েছে বৃদ্ধার। সারাক্ষণ কাছে থাকে। মুখের দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করে জানতে চায়, কী করতে হবে। আর রঙ্গনারও খুব লক্ষ্য ঠাকুমার দিকে আগের চেয়ে। দুহাতে শূন্যে তুলে বারান্দা থেকে নামায় উঠে নে। খিড়কির ঘাটে নিয়ে যায়। ঠাকরুন ঘাটের মাথায় কলাগাছের কাছে বসে তাকিয়ে থাকেন কলার মোচার দিকে। হলুদ বাঁশপাতা ঝরে পড়ে ডোবার সবুজ জলে। মাছরাঙা কঞ্চিতে বসে থাকে। একচোখ জলের দিকে, অন্য চোখ পেনীর দিকে। পেনী ঢিল কুড়োলে কুড়ানি ঠাকরুন জড়ানো গলায় বলেন, 'অই অই।' পেনী হাসতে হাসতে পাশে বসে পড়ে। খোলামকুচি কুড়িয়ে লুফতে লুফতে বলে, 'ও ঠাকমা! লুফা খেলবে?' রঙ্গনা এসে উঁকি মারে। খিড়কির চৌকাঠে দুপাশে হাত রেখে বলে, 'ঠাকুমা, তোমরা কী করছ গো?'

মাঘের সূর্য দক্ষিণায়নে সরেছে। রোদে আঁচ বেড়েছে মাঠের দিক থেকে দুপুরবেলা ঘূর্ণীহাওয়া এসে বাঁশবন নাড়া দিয়ে ডোবার জলের ওপর নাচে। হলুদ পাতা ঝরে পড়ে সর্ সর্ খর্ খর। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ছড়িয়ে পড়ে জলের বুকে। ঘূর্ণীহাওয়াটা কলাবন পেরিয়ে বসন্তপুরে ঢোকে। হাইওয়েতে ছেড়া শালপাতা, কাগজের টুকরো, লালনীল সেলোফেন কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। পেছন পেছন ঘেউ ঘেউ করে ছুটতে থাকে নেড়ি কুকুরটা। শালপাতায় খাদ্যের গন্ধ ছিল।

ডোবার ঘাটে নির্জন দুপুরে এক বৃদ্ধা চুপচাপ বসে বুঝি এবার মৃত্যুর প্রতীক্ষারত। চোখে জল দেখে ছুতোরের মেয়েটা দৌড়ে বাড়ি ঢুকে বলে, 'ও বাবুদিদি! দেখবে এস দেখবে এস। ঠাকমা কাঁদছে।'

অপরূপা নেই। রঙ্গনা এসে বলে, 'কী হল ঠাকুমা? কাঁদছ কেন?'

বৃদ্ধা মাথাটা আস্তে দোলান। 'না। কাঁদি নাই।'

'ফের মিথ্যা কথা? কী তোমার এত দুঃখ বলো তো?' রঙ্গনা পাশে হাঁটু দুমড়ে বসে। 'বাঁকাশ্রীরামপুর খুঁজে পেলে না বলে? দিদি তো বলেছে—ম্যাপে খুঁজে বের করবে। স্কুলে ম্যাপ আছে না জেলার?'

অপরূপা আরও একটা টিউশনি যোগাড় করেছে। সকালসন্ধ্যা দুবেলা পড়াতে যায়। দুপুর অব্দি ঘোরাঘুরি করে ব্লকের অফিসার আর মাতব্বর লোকদের কাছে। ট্রান্সপোর্ট অফিসের হরেন বলেছে, 'সাধুদাকে বলব তোমার কথা। কলকাতা থেকে ফিরুক। না হয় এখানেই একটা কিছু করলে। মাসে শতখানেক টাকা

পাবার আশা আছে। পরে ভালকিছু পেলে ছেড়ে দেবে।' অপরূপা আশায় চনমন করে বেড়াচ্ছে। কবে সাধুবাবু কলকাতা থেকে ফিরবেন কে জানে? কলকাতায় আরেকটা অফিস খুলেছেন। সেখানে হলে তো খুব ভাল। কলকাতায় থাকার সুযোগ পেলে অপরূপাকে আর পায় কে।

কদিন পরে অপরূপা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরল—মুখটা কালো। রঙ্গনা বলল, 'কী হয়েছে রে দিদি?'

অপরূপা শুকনো হেসে বলল, 'কী হবে? কিছু না। তোরা খেয়েছিস?'

'ঠাকুমাকে খাইয়ে দিয়েছি। শুয়ে পড়েছে। আয়, আমরা খেয়ে নিই।'

'আমি কিছু খাব না রে! তুই খেয়ে নে।'

'খাবি নে? কী হয়েছে—তাও বলবিনে?' রঙ্গনা বিরক্তি প্রকাশ করল।

অপরূপা আস্তে বলল, 'আমি খেয়েছি। তুই খাগে যা।'

'মিথ্যা বলিস নে। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

অপরূপা স্বভাবমতো মেজাজ করল না। বলল, 'বিশ্বাস কর্ আমি খেয়ে এলুম।'

'কোথায় খেলি?'

'হুটুবাবুর রেস্টুরেন্টে।' অপরূপা শাড়ির ওপর দিয়ে পেটে হাত বুলোল। 'চপ-কাটলেট কত কিছু।'

রঙ্গনা সন্দেহের দৃষ্টে চেয়ে বলল, 'কে খাওয়াল? নিজের পয়সায় নিশ্চয় না?'

'পয়সা খরচ করে খাব?' অপরূপা হাসল একটু। 'আমি অত স্বার্থপর নই রে—যাই ভাবিস তোরা।'

'বেশ। কে খাওয়াল?

অপরূপা এবার চটল। 'জেরা করছিস কেন? আমার বুঝি বন্ধু নেই?'

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে একটা ভংগি করে চলে গেল। অপরূপা গম্ভীর হয়ে বসে রইল বিছানায় পা ঝুলিয়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটু বেশি এগিয়ে গেছে। হরেনকে সে প্রেমিক হিসেবে চিন্তা করতেই পারে না। অথচ হরেনকে পাত্তা দিতে হচ্ছে। সে আজ নীলা রেস্তোরাঁয় পর্দার আড়ালে তার পায়ে পা ঠেকিয়েছে—তারপর টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁয়েছে। এমন কী হাঁ করে বলেছে, 'আমায় খাইয়ে দাও না অপু।' অপরূপা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছিল এমন আচরণ। কিন্তু তাকে সত্যি কাটলেটের টুকরো গুঁজে দিতে হয়েছে হরেনের মুখে।

বেরিয়ে এসে তখন ভীষণ লজ্জায় পড়ে গিয়েছিল অপরূপা। চেনা লোকেরা তো দেখল। কী ভাববে তারা? রাস্তার পাশাপাশি হেঁটে হরেন তাকে এগিয়ে দিতে এল। নির্জনে এসে তার হাতও ধরল। অপরূপা কাঁপছিল। শিরিসতলায় গলি রাস্তায় ঢোকার মুখে অন্ধকারে হরেন তার দুকাঁধ ধরে চুমু খেতে এল। অপরূপা ছাড়িয়ে নিয়ে হন হন করে চলে এসেছে।

ঠাকুমা ফিরে আসার পর অপরূপা আবার একা শুচ্ছে। রঙ্গনা ওঘরে ঠাকুমার কাছে শোয় আগের মতো। আড়াই টাকায় নীলচে শেড দেওয়া একটা ছোট্ট কেরোসিনবাতি কিনেছে অপরূপা। ইলেকট্রিক টেবিল ল্যাম্পের নকল করে নীলাভ আলোটা বেশ লাগে। শুয়ে কত কী কল্পনা করে অপরূপা। নিজের ভবিষ্যত স্পষ্ট করে দেখতে চায়। চাকরি, কোয়ার্টার, এক অস্পষ্ট পুরুষ, এক শিশু—তাকে স্কুলে দিতে যায়, মাথায় রঙীন ছাতি। কখনও মধ্যরাতে হঠাৎ সে টের পায়, আমেরিকায় আছে। বিপাশার কাছে শতদ্রুর এ্যালবামে অসংখ্য রঙীন ছবি দেখেছিল। সুন্দর বাড়ি, রাস্তাঘাট, মানুষজন। তাদের একজন হয়ে যায় সে। তারপর শতদ্রুর কথা ভাবতে থাকে. কল্পনা বহুদূর এগিয়ে যেতে থাকে। নির্লজ্জ কল্পনা। অবাধ স্বাধীনতাময় সেই কল্পনা। তারপর শতদ্রুর চিঠিটা সেই প্রসারিত কল্পনাকে মুহূর্তে উড়িয়ে দেয়। চোয়াল আঁটো হয়ে যায় অপরূপার।

দূরে হুইস্‌ল্‌ বাজিয়ে চলে যেতে থাকে মধ্যরাতের ট্রেন। শব্দহীন রাতে সেইসব দূরের শব্দ দূরে সরে যেতে থাকে। ডোবার ধারে বাঁশবনে পেঁচা ডেকে ওঠে, ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও। অপরূপা লেপ মুড়ি দিয়ে বালিশে মাথা গোঁজে। তারপর কখন ঘুম এসে তাকে বাঁচিয়ে দেয়।

টিউশনির জন্য খুব সকালে উঠতে হয় অপরূপাকে। বেলাঅব্দি ঘুমোচ্ছে দেখে রঙ্গনা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছিল। অপরূপা দরজা খুলে বলল, 'আজ শরীরটা খারাপ করছে রে! তুই আমার হয়ে যা না রনি। কখনও তো তোকে বলি নি। যা না—কামাই হবে আজ।'

রঙ্গনা দমে গিয়ে বলল, 'আমি? আমায় পড়াতে দেবে? কোন ক্লাসের রে?'

অপরূপা হাসল। 'ব্লক অফিসের এগ্রিকালচারাল অফিসার। জিগ্যেস করলে কোয়ার্টার দেখিয়ে দেবে।'

'ভ্যাট্! কোন ক্লাসের স্টুডেন্ট তাই জিগ্যেস করছি।'

'দুটি মেয়ে—ক্লাস ফাইভ আর ফোর। ছেলেটি ক্লাস টু।'

'তিনটে?'

'আর চাই নাকি ?'

'কত দেয় রে দিদি ?'

'পঞ্চাশ টাকা।'

'ইস! অনেক টাকা দেয় তো তোকে। কী করিস অত টাকা ?'

অপরূপা রেগে গেল। 'শাড়ি-গয়না কিনি মাসে-মাসে। আর খাওয়া দাওয়া-সংসার চালিয়ে দিচ্ছে তোর কর্তাবাবা।'

'কর্তাবাবা না হোক, কর্তামা তো চালিয়েছে।' রঙ্গনা কৌতুকের ভংগিতে বলল। 'তুই তো মোটে এ মাসটা।'

'থাক। তোকে যেতে হবে না। যা—ইংরিজি নভেল পড়গে যা।'

'আহা যাচ্ছি। যাব না বলছি নাকি ?' রঙ্গনা ওঘরে কাপড় বদলাতে গেল। ওঘর থেকে ফের চেঁচিয়ে বলল, 'তোর স্লিপারজুটো দিতে হবে কিন্তু। আমারটা কবে থেকে ছিঁড়ে পড়ে আছে।'

অপরূপা টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে ইঁদারাতলায় গেল। বলল, 'সারিয়ে নিতে কী হয় ? নিয়ে যেতে পারো না মুচির কাছে ?'

রঙ্গনা শাড়ি পরতে পরতে জবাব দিল, 'যাবার পথে দিয়ে যাব।' একটু পরে সে সেজেগুজে বেরিয়ে এসে কুণ্ঠিত মুখে বলল, 'দিদি! ওরা যদি আমায় পড়াতে না দেয় ? আর—ওরা তো আমায় চেনেই না রে!'

'পরিচয় দিবি।' অপরূপা উঠে দাঁড়াল। 'এক মিনিট দাঁড়া বউদিকে চিঠি লিখে দিই।'

কুড়ানি ঠাকরুন এই সাতসকালে লাউগাছের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। কী করছেন, বোঝা যাচ্ছে না। হাতে একটা শুকনো ছোট্ট কঞ্চি। রঙ্গনা বেরচ্ছে দেখলেন মুখ ঘুরিয়ে। তারপর আবার কঞ্চি দিয়ে কী খোঁচাখুঁচি শুরু করলেন।

'জুতো সারতে পঁচিশ পয়সার বেশি লাগা উচিত নয়।' বলে অপরূপা বোনকে আরও পাঁচটা পয়সা বেশি দিয়েছে।

রঙ্গনা বেশ কিছুদিন বাড়ি থেকে বেরোয় নি। সে হাঁফিয়ে উঠেছিল। তবে ব্লক অফিসটা শেষদিকে। বাজার এবং বসতি এলাকার উল্টোদিকে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাইওয়ে। তারপর রশিদুই এগোলে বাঁক। বাঁকের ডাইনে খাল। খালে কাঠের সাঁকো আছে। ওদিকটায় বাজা ডাঙা আর জঙ্গল ছিল একসময়। সমতল করে বিশাল এলাকা জুড়ে হলুদ একতলা বাড়ি, লম্বা পার্ক, ইউক্যালিপটাস, কতরকম ঝাউগাছ, ক্যাকটাস আর ফুলবাগিচার

উজ্জ্বলতা তৈরি করা হয়েছে। সংকীর্ণ ঝকঝকে শুকনো পিচের পথ। দুধারে কৃষ্ণচূড়া। ফুলের সময় হয়ে এল।

আনন্দ এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে সেখানে ঢুকল রঙ্গনা। পার্কে ঘাস ছাঁটছিল মালী। তাকে জিগ্যেস করলে এ. ও. সায়েবের কোয়ার্টার দেখিয়ে দিল। বারান্দায় ফর্সা লম্বা এবং রোগা এক মহিলা দাঁড়িয়ে উল বুনছিলেন। রঙ্গনাকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে তাকালেন। রঙ্গনা ভয়ে-ভয়ে বলল, 'দিদির শরীর খারাপ। তাই আমায় পড়াতে আসতে বলল।'

'তুমি অপুর বোন বুঝি?' মিষ্টি হাসলেন এ. ও. সায়েবের বউ। 'অপুর শরীর খারাপ? আচ্ছা। তুমি পড়াবে? কী করো তুমি?'

রঙ্গনা একটু হাসল। 'কিছু না।'

'এতটুকু মেয়ে তুমি! কোন ক্লাসে পড়ছ?'

রঙ্গনা হকচকিয়ে গেল। 'আমি···আমি আর পড়ি না।'

'সে কী! কতদূর পড়াশুনা করেছ?'

'বি এ পার্ট ওয়ান দিয়েছিলুম।'

'আর পড়লেনা কেন?'

মায়ের পেছনে দুটি মেয়ে এবং একটি বাচ্চা উঁকি দিচ্ছিল। রঙ্গনা বলল, 'হল না। বাবা মারা গেলেন।'

'আচ্ছা। তা ক্লাস ফাইভের ইংরেজি পড়াতে পারবে তো?'

'পারব।'

'অংক?'

'হয়তো পারব।'

এ. ও. সায়েবের বউ ঘুরে ছেলেমেয়েদের ধমক দিলেন, 'কী দেখছ সব? যাও—বসো গিয়ে।' তারপর রঙ্গনাকে বললেন, 'তুমি বললুম বলে কিছু মনে করো নি তো? একেবারে বাচ্চা মেয়ে। এস।'

রঙ্গনা রাগ করেনি বলতে গিয়ে চুপ করল। বলার সুযোগ পেল না। সে বারান্দায় উঠল।···

সেবেলা রঙ্গনা যতক্ষণ পড়াল, এ. ও. সায়েবের বউ ততক্ষণ কাছে বসে নজর রাখলেন। রঙ্গনার অস্বস্তি হচ্ছিল। তার ইংরেজি উচ্চারণ শুনে ভদ্রমহিলা একবার জেনে নিলেন, রঙ্গনা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছে কি না। বসন্তপুরে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কোথায়? কোন আমলে খ্রীস্টান মিশন ছিল। তখন নাকি একটা ছিল। দেশভাগের সময় উঠে যায়। পাদ্রীরা সবাই ছিলেন

সায়েব। বসন্তপুরে একঘর হাড়ি খ্রীস্টান হয়েছিল। তারা কোথায় চলে গেছে। পাশের গাঁয়ে কিছু খ্রীস্টান আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা বাংলা স্কুলে পড়ে।

রঞ্জনা কথা বলে একটা সম্পর্ক গড়তে চাইছিল। কিন্তু মহিলাটি হিসেবী। পড়ানোর সূত্র ধরিয়ে দিয়ে উঠে গেলেন। একটু পরে চা আর দুটো বিস্কুট এল। নিজে হাতে তুলে দিয়ে মহিলা বললেন, 'আমায় সুষমাদি বলবে।' রঞ্জনা ভারি খুশি হল। সে আসলে চেয়েছিল, তার দোষত্রুটির জন্য যেন অপরূপাকে কথা শুনতে না হয়। দিদির দেওয়া দায়িত্বটা ভালভাবে পালন করাও উচিত মনে হয়েছিল।

কিন্তু এতেই বুঝি গণ্ডগোলে পড়ে গেল সে! সুষমা কড়া ধাতের মহিলা সে টের পেয়েছিল। ওটায় ওরা স্কুলের জন্য তৈরি হতে গেল। তখন সুষমা বললেন, 'তোমার পড়ানোটা আমার পছন্দ হয়েছে, বুঝলে মেয়ে? বলি কী, তুমিই এসে পড়াও না কেন—দিদির বদলে? ফ্র্যাংকলি বলাই ভাল, তোমার দিদিকে আমরা নেহাত রেখেছি—তেমন কোনো টিচার পাচ্ছিনা বলে। এখানে টিচারদের যা দেমাক আর টাকার ডিম্যাণ্ড।'

রঞ্জনা ভড়কে গিয়ে বলল, 'দেখুন সুষমাদি, আমার সময় হবে না। তাছাড়া…'

ধমকের সুরে এ. ও. সাহেবের বউ বললেন, 'কী' সময় হবে না? বললে তো কিছু করো-টরো না। দিদি রাগ করবে? সোজা কথা বলছি শোনো। তোমার দিদির দ্বারা এসব হবে না। নেহাত আমরা বলে ওকে রেখেছি। বড্ড ফাঁকিবাজ মেয়ে।'

রঞ্জনা ভেতর-ভেতর চটেছে। কিন্তু মুখে শুকনো হাসি ফুটিয়ে বলল, 'আমি টিউশনি করতে পারি না। আমার ভালও লাগে না। নৈলে কোথাও এতদিন করতুম।'

'আচ্ছা।' বলে সুষমা চোখ কটমট করে তাকালেন।

রঞ্জনা কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'দিদিকে বলব বরং, ভালভাবে পড়াবে। লাস্ট ইয়ার তো গোটাবছর দিদি পড়িয়েছে আপনার ছেলেমেয়েদের। আমার ধারণা…'

ভেতরে ভাইবোনে ঝগড়ার চেচামেচি শোনা যাচ্ছিল। সুষমা চলে গেলেন হন্তদন্ত হয়ে। একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর রঞ্জনা চলে এলো।

সারাপথ উদ্বেগে সে অস্থির। টিউশনি করার মধ্যে যে এমন সব অপমান আছে, সে কোনোদিন ভাবে নি। অপমান ছাড়া আর কী? একবছর ধরে অপরূপা ওদের পড়াচ্ছে। স্ট্যাণ্ড না করুক, ভালভাবে প্রমোশন তো পেয়েছে

ওঁর ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ রঙ্গনাকে পেয়ে এমন অদ্ভুত কথা বলার মানে কী? রঙ্গনা চটে গিয়ে ভাবছিল, সে না গিয়ে অন্য কেউ গিয়ে পড়ালেও হয়তো তাকে একই কথা বলা হত। অপরূপার বদনাম গাওয়া হত।

বাড়ি ফিরলে অপরূপা তার গাম্ভীর্য লক্ষ্য করে হাসতে হাসতে বলল, 'কী রে? একেবারে স্কুলের দিদিমণির মতো তুম্বো মুখ করে আছিস যে? নিশ্চয় সুষমাদি তোর পড়ানোর খুঁত ধরেছেন। তোকে বলা হয়নি—ভদ্রমহিলা নিজে নাকি বিয়েব আগে টিচার ছিলেন। একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। ভুল ধরেছিলেন তো?'

রঙ্গনা বাঁকা ঠোঁটে বলল, 'হুঁ, বিদ্যাদিগগজ মহিলা। ভুল ধরবে আমার। আচ্ছা দিদি, তুই ওখানে কী করে এতকাল টিউশনি করছিস রে?'

'কেন?' অপরূপা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করল। 'তোকে খারাপ কিছু বলেছে বুঝি?'

'হুঁঃ! আমি ওদের ধারি কিছু যে বলবে।' রঙ্গনা রাগ দেখিয়ে বলল। 'তুই নাকি ফাঁকি দিয়ে পড়াস-টড়াস।'

'বলল?'

'হুঁ।' রঙ্গনা জোরে মাথাটা দোলাল।

অপরূপা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল 'কী বলল, কী বলল? ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখবে বলল?'

রঙ্গনা বিরক্তভাবে বলল, 'অত বলতে পারছি না আমি।' সে বলল না যে তাকেই পড়াতে বলেছেন এ. ও. সায়েবের বউ। কথাটা দিদি কীভাবে নেবে সে বুঝতে পারছিল না। অপরূপা ভুরু কুঁচকে কী ভাবছে দেখে সে ফের বলল, 'তুই বরং ওখানটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও খুঁজে ছাখ দিদি। পেয়ে যাবি।'

অপরূপা একটু মাথা দোলাল বটে সায় দিয়ে, কিন্তু ব্লক অফিস এলাকায় পড়াতে যাওয়ার পিছনে তার মনের একটা গোপন স্বপ্ন আছে, বোনকে বলতে পারবে না। কাঠের সাঁকোর মুখে হলুদ-হলুদ ফুলে ভরা গাছটার দিকে চোখ পড়লেই তার নেশাধরা আচ্ছন্নতা এসে যায়। ওই এক সুন্দর চাকরি-বাকরির জগত। ছবির মতো একতালা কোয়ার্টার। জানলায় নীলপর্দা। বুগানভিলিয়ার ঝালর। মাসে মাসে নিশ্চিত টাকাকড়ি। সমাজশিক্ষা কর্মসূচীতে সে একজন হয়ে উঠতে পারে বৈকি কোনো একদিন—হঠাৎ তার দরখাস্তের তলায় গোটা-গোটা হরফে সই 'অপরূপা মুখার্জি' দেখে কোন সদাশয় অফিসারের মন নরম হয়ে ওঠাও কি অসম্ভব? অপরূপা স্পষ্ট দেখতে পায়, সারাদিন সে গ্রামে-গ্রামে

মেয়েদের মধ্যে ঘুরে কথা বলে-বলে ক্লান্ত গ্রামসেবিকাদের দলে দিনশেষে ফিরে আসছে জিপ গাড়িতে চেপে তার সুন্দর কোয়ার্টারে—জানলায় নীল পর্দা, গেটে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপিতে লাল-লাল ফুল। সুষমা কেন যে ওই জীবনকে কথায় কথায় খোঁটাপেটা করেন, অপরূপা বোঝে না। আসলে মহিলাটি স্নায়ুরোগী। বদমেজাজী। খিটখিটে স্বভাব। আরও তো কত মহিলা আছেন ওখানে—এস. ই. ও. সায়েবের বউটি, পুতুলের মতো গোলগাল চেহারা মুখে হাসি লেগেই আছে। লনে বেতের চেয়ার পেতে বসে উল বুনছেন সারা শীতকাল। পিঠের কাছে বিশাল ডালিয়া। নতুন বিয়ে হয়েছে। চোখে চোখ পড়লেই হেসে বলেন, 'এই যে!' অপরূপাকে বসন্তপুরের লোকেরা পাত্তা দিতে চায় না, তার ঠাকুর্দা ছিলেন কুখ্যাত ডাকাত নাকি এবং তার দাদাও গুণ্ডাবদমাস ছেলে, তার ওপর এই দারিদ্র্য। কিন্তু ব্লক কোয়ার্টারে অপরূপার কত সম্মান। যেচে পড়ে কত মেয়ে ভাব জমিয়েছে। পুরুষরাও তাকে খাতির করে ভদ্রভাবে কথা বলেন। এমন কী বি. ডি. ও সায়েব পর্যন্ত।

রঞ্জনা কাপড় বদলে এসে বলল, 'ঠাকুমা বুঝি খিড়কির দোরে?'

অপরূপা আনমনে মাথা নাড়ল।

রঞ্জনা বলল, 'এবেলা তোর কাজ করে দিলুম। কাজেই এবেলা তুই রাঁধবি দিদি। আগেভাগেই কিন্তু বলে দিলুম। সেদিনকার মতো খাবার-সময় গিয়ে যেন না শুনি, তোরই তো রাঁধার কথা—আমায় তো বলিস নি।'

রঞ্জনা অপরূপার নকল করল। তারপর সেই বাঁধানো প্রবাসী পত্রিকাটা নিয়ে খিড়কিতে গেল। কুড়ানি ঠাকরুন কঞ্চিহাতে বসে আছেন। পেনী কলার পাতায় কলমি শাক বাছছে। মাঝে-মাঝে কলমিডাঁটায় ফুঁ দিয়ে বাঁশি বাজানোর চেষ্টা করছে। না পেরে বলছে, 'অ ঠাউরুনদি, দ্যাও না এট্টা করে—সিদিন কেমন দিইছিলে! অ ঠাউরুনদি! দ্যাও না।'

ঠাকরুনের ঠোঁটে একটু হাসি ফুটেছে এতদিন পরে। কঞ্চিটা নাচাচ্ছেন। রঞ্জনা পাশে শুকনো মাটিতে বসে বলল, 'কলমিশাক কোথা পেলিরে পেনী?'

পেনী ডোবার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই তো। তুলে আনলুম। বাবুদিদি, জানো? আর এট্টু হলেই সাপে কামড়ে দিইছিল অ্যাত্তো বড় সাপ।'

কুড়ানি ঠাকরুন বললেন, 'ধোঁয়া, ধোঁয়া!'

রঞ্জনা লক্ষ্য করে বলল, 'ঠাকুমা! ধোঁয়া বলছ কেন? ঢোঁড়া বলতে পারো না? তোমার বাপের দেশে বুঝি ঢোঁড়াকে ধোঁয়া বলে?'

কুড়ানি ঠাকরুন নিজের মুখের দিকে আঙুল তুলে কিছু দেখালেন।

রঞ্জনা ঝুঁকে দেখতে দেখতে বলল, 'কী? কী হয়েছে?'

'কঁতা ওঁছে না।' পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধা। পেনী প্যাট-প্যাট করে তাকিয়ে রইল।

রঞ্জনা চমকে উঠেছিল। বলল, 'ঠাকুমা! একী গো? তোমার কথা অমন জড়িয়ে যাচ্ছে কেন?' বলে সে দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে অপরূপাকে ডাকতে থাকল।

অপরূপা তার ঘরের জানলা থেকে, জানালাটা রঞ্জনাদের পিঠের কাছেই, বলল, 'কী রে?'

'দেখে যা দিদি, ঠাকুমা কথা বলতে জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছিস? ঠোটটা কেমন যেন একটুখানি বেঁকে গেছে। তাই না?'

অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, 'তাই তখন আমাকে আঙুলের ইশারায় মুখ দেখাচ্ছিল। সকাল থেকে কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে। প্যারালেসিস না তো?'

রঞ্জনা বলল, 'ঠাকুমা, চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

বৃদ্ধা মাথা দোলালেন। হচ্ছে না।

'খেতে- টেতে?'

'ব্রঁও।' অর্থাৎ একটু।

পেনী ফিক ফিক করে হেসে বলল, 'তাই তখন থেকে ঠাউরুনদি কী করে কথা বলছে। মাকে ডাকি বাবুদিদি?'

রঞ্জনা ধমকাল। 'চুপ কর্ তো। তোর মা ডাক্তার। ও ঠাকুমা, এখানে তাহলে বসে আছ কেন? অদ্ভুত তো তুমি। এস—চলে এস। বারান্দায় বসে থাকবে এস।'

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। 'নাঁ নাঁ। কিঁছু অঁয় নি।' বলে পেনীর জন্য কলমিডাঁটা ভেঙে বাঁশ বানাতে থাকলেন। রঞ্জনা পত্রিকাটা খুলে চোখ রাখল বটে, কিন্তু মন বসল না পত্রিকার পাতায়। সে বারবার মুখ তুলে বৃদ্ধার ঠোঁট লক্ষ্য করছিল।

একটু পরে অপরূপা ফের জানলায় এসে বলে গেল, 'বৃদ্ধবয়সে এমন কতরকম হয়, বুঝলি রনি? দিদিমারও হয়েছিল না? শেষে মেসোমশাই ধানবাদের হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিলেন। ম্যাসেজ করে ভাল হলেছিল। ওবেলা বরং একটু ম্যাসেজ করে দেব গরম তেল দিয়ে।'

রঞ্জনা বলল, 'রতুডাক্তারকে বললে হয় না দিদি?'

অপরূপা রেগে গেল। 'এসেই দুটাকা ভিজিট চাইবে। তারপর ওষুধের দাম।'

'তাহলে হসপিটালেই ভাল।'

শোনামাত্র কুড়ানি ঠাকরুন জোরে নড়ে উঠলেন। জড়ানো গলায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন, 'না।'

ভংগি দেখে রঙ্গনা না হেসে পারল না। অপরূপা বলল, 'সেই তো বলছি। লাইফে কখনও ওষুধ খেতে দেখেছিস ঠাকুমাকে? একবার—তুই তখন বাচ্চা, বাবা জোর করে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিলেন। বমি-টমি করে কেলেংকারি। বলে ওষুধের গন্ধ সহ্য হয় না।'

রঙ্গনা ভেবে বলল, 'কান্তবাবুর হোমিওপ্যাথি করালে হয় রে।'

অপরূপা উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বুড়োবয়সে অমন একটু-আধটু হয়। ছাড় তো। দেখবি, ম্যাসেজ করে দেব। 'ঠিক হয়ে যাবে।…'

অপরূপা রান্নার ব্যাপারে খেয়ালী। কোনোবেলা সে রাঁধতে বসলে সামান্য উপকরণেই ভাল রাঁধে। মন না থাকলে অখাদ্য করে ছাড়বে। এবেলা ভাগ্যিস খেয়ালবশে চালে-ডালে ঘ্যাটমতো করেছিল। কাঁচা লংকা, কলমি শাক আর উঠোনের কোণায় বৃন্দার হাতের লাগানো বুড়ি বেগুনগাছের সম্ভবত শেষ বেগুনটি পুড়িয়ে খাওয়াটা খুব জমেছিল। ঘ্যাটে জলটা বেশি হওয়াতে কুড়ানি ঠাকরুন খেতে পারলেন কোনোরকমে। রাতে তো দিব্যি শক্ত দিনের ভাত চিবিয়ে খেয়েছেন। সকালে চায়ে মুড়ি ভিজিয়ে গিলেছেন। কিন্তু শক্ত খাদ্য আর গিলতে পারছেন না। খাওয়ার পর সর্ষের তেল গরম করে অপরূপা কিছুক্ষণ মালিশ করে দিল। তাতে ঠোঁট সিধে হল না। তেমনি বেঁকে রইল।

সে-রাতে শুতে গিয়ে অপরূপা রঙ্গনাকে ডাকল, 'রনি কি শুয়ে পড়লি?'

'না রে! কেন?'

'শুনে যা।'

'কী?'

'চেঁচাচ্ছিস কেন? তেমন কিছু না। জাস্ট একটা কথা বলব। এ ঘরে আয় না।'

রঙ্গনা দরজা খুলে বেরুল। অপরূপা তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'ছাখ্, আমার মনে হচ্ছে, ঠাকুমা আর বোধ হয় বেশিদিন বাঁচবে না। দিদিমার ঠিক এমনি হয়েছিল না? তো আমার মাথায় একটা কথা এল। বলি শোন।'

রঞ্জনা দিদির মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে বলল, 'কী রে ?'

অপরূপা আরও গলা চেপে বলল, 'আমার বরাবর ধারণা, তাছাড়া মায়ের কাছেও শুনেছি—ঠাকুর্দার নাকি অনেক টাকাকড়ি আর সোনার গয়না লুকোনো আছে বাড়িতে। ঠাকুমা সব জানে। বাবার মৃত্যুর পর তোর মনে আছে তো—ঠাকুমা অনেক টাকা খরচ করেছিল শ্রাদ্ধের সময়।'

রঞ্জনা বলল, 'যাঃ! সে তো গয়না বেচেছিল নিজের। নীরেন স্যাকরাকে ডেকে এনেছিলুম—মনে নেই বুঝি ?'

অপরূপা হাসল। 'আরও নেই তোকে কে বলল ? নিজের মরার খরচটা রেখে না যাবার পাত্রী নয়—আমি বাজি রেখে বলতে পারি।'

রঞ্জনা বলল, 'দাদা ঠিক এই কথা ভেবে ঠাকুমার ওপর অত্যাচার করত।'

'তুই তর্ক করিস না তো!' অপরূপা চটে গেল। 'এখনও মুখে কথা বলতে পারছে—যা বলছে, বোঝা যাচ্ছে। তাই বলছিলুম, আমার চেয়ে তোকে বেশি ভালবাসে ঠাকুমা। তুই আজ রাতেই কোনো ছলে কথাটা তোল না। নিশ্চয় কোথাও ঠাকুর্দার টাকাকড়ি লুকোনো আছে। শাকপাতা শিমশশা বেচে অত পয়সা পায় কোথায় রে ? তুই বিশ্বাস করিস এটা ?'

রঞ্জনা ভেবেচিন্তে বলল, 'ঠাকুর্দার টাকা হলে তো ব্রিটিশ পিরিয়ডের। সে টাকা চলবে ?'

'সেকথা পরে।' অপরূপা উজ্জ্বল চোখে চেয়ে বলল। 'আর সোনার গয়না ? তার তো মার নেই।'

রঞ্জনা মুখ নামিয়ে লাজুক হাসল। 'যাঃ! আমি জিগ্যেস করতে পারব না। তুই করিস, দিদি।'

অপরূপা গম্ভীর হয়ে বলল, 'রনি! এটা একটা লাইফ এ্যাণ্ড ডেথ কোশ্চেন। আজ রাতেই ·'

রঞ্জনা উঠে দাঁড়াল। তারপর 'সে আমি পারব না' বলে সে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ হল। অপরূপা ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ।···

অমরনাথের হাওয়াকল

শতদ্রুর ঠাকুর্দা অমরনাথ সিংহের বিচিত্র সব বাতিক ছিল। জমিদারী আমলের শেষ জেল্লা তাঁর মধ্যেই দেখা গেছে। কৃষ্ণনাথ পেয়েছিলেন কিঞ্চিৎ ছাই মাত্র। অমরনাথের কাণ্ডকারখানার কোনো মূল্য দেন নি তাই। কলকাতা ফিরে অমরনাথ আরও বড় জমিদার অর্থাৎ তথাকথিত রাজারাজড়া এবং সায়েবদের যা কিছু দেখতেন, বসন্তপুরে তার নকল করতে চাইতেন। বারো-তেরো একর জমির ওপর কুঠিবাড়ির মতো বিশাল বাড়ি, বিদেশী গাড়ি, বিদেশী গাছ ও লতাবিতান, ভাস্কর্য, সুইমিং পুল—তারপর একটা হাওয়াকল পর্যন্ত।

এ এলাকায় এই তাজ্জব জিনিসটি খুব নজর কেড়েছিল লোকের। দলবেঁধে বহু গ্রাম থেকে লোকেরা এসে সেটি দেখে অবাক হয়ে যেত। আসলে ফুলবাগান আর লতানিতানে জলসেচের উদ্দেশ্যও ছিল অমরনাথের। উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ের এ মাটি গ্রীষ্মে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায়। দীঘিতে তলানি পড়ে। পুকুরডোবায় পাঁক বেরিয়ে যায়। গভীর ইঁদারায় নল বসিয়ে চল্লিশফুট উঁচুতে টিনের চরকি লাগিয়ে হাওয়াকল বানিয়েছিলেন অমরনাথ। খরার সময় প্রচণ্ড বাতাসে সেই চরকি বনবন করে ঘুরত এবং ইঁদারা থেকে জল তুলে নলে ঢালার ব্যবস্থা করত। সুইমিং পুলটাও তাই ভর্তি থাকতে পারত বারোটা মাস। গাছপালায় জল সেচনের কাজটাও হত। এমন কী এক ফোয়ারাও ঝরঝরিয়ে জল ছড়াত চারপাশে। অমরনাথ জ্যোৎস্নারাতে ফোয়ারার কল খুলে বসে থাকতেন বাগানে।

১৯৪২ সালের আগস্টে ভয়ংকর ঝড়ে হাওয়াকল ভেঙে উড়ে গিয়েছিল। তখন অমরনাথের আর সেদিন নেই। ইঁদারাটা ছিল দক্ষিণপূর্ব কোণে—যার মাথায় ছিল ওই যন্তরমন্তর। কালক্রমে অব্যবহার্য হয়ে জলটা পচে যায়। তারপর শুকিয়ে যেতে থাকে। বাগানের ভাস্কর্য ঘিরে গজিয়ে ওঠে আগাছা। কিছু তুলে নিয়ে গিয়ে দালানের সামনের বারান্দায় এবং চওড়া সিঁড়ির দুপাশে রাখা হয়েছিল। উজ্জ্বলতা হারালে এবং টুটাফাটা হয়ে গেলে অনেকগুলো ফেলে দেওয়া হয়েছিল আস্তাকুঁড়ে। ইঁদারা ঘিরেও আগাছা জন্মেছিল। নষ্ট ভ্রষ্ট বাগানে আর যেতেন না অমরনাথ। পরবর্তীকালে বড়জোর সাধের সুইমিং পুলের ধারে অতিবৃদ্ধ পক্ককেশ মানুষটি নাতি-নাতনীকে নিয়ে বসে গল্প শোনাতেন কোনো-কোনো দিনাবসানে।

অমরনাথের আমলেই দুধের জন্য একপাল গরু পোষা হত। কৃষ্ণনাথের সময় তাদের সংখ্যা তিনে ঠেকেছিল। একবার একটা বাছুর হাওয়াকলের ইঁদারায় দৈবাৎ পড়ে যায়। তাকে অনেক কষ্টে ওঠানো হয়েছিল বটে, কিন্তু বেচারার কোমর ভেঙে যায়। সেই অবস্থায় সে অনেকদিন বেঁচে ছিল। কৃষ্ণনাথ তখনই বলেছিলেন, 'ইঁদারাটা বুজিয়ে দিতে হবে।'

কৃষ্ণনাথ নিশ্চয় সময় পাচ্ছিলেন না কণ্ট্রাকটারির কাজের চাপে। গতবছর সময় পেয়ে ওটা বুজিয়ে সমতল করে দিয়েছেন। এই একবছরেই সেখানে ঘাস আর ভাটফুলের জঙ্গল গজিয়ে গেছে। চেনা যায়না যে কোনো সময় ওখানে একটা ইঁদারা এবং তার মাথার ওপর একটা হাওয়াকল ছিল।

কলকাতা থেকে শ্যালক ব্রজেন্দ্রের ডাকে কৃষ্ণনাথ দুদিন আগে জিপে কলকাতা ছুটে গিয়েছিলেন। শতদ্রু আর বাড়ি ফিরবেনা এবং ওখান থেকেই অ্যামেরিকা চলে যাবে শুনে কৃষ্ণনাথ মর্মাহত। তাঁর আদতে ইচ্ছাই ছিল না শতদ্রু আবার বিদেশে যাক। কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা বাবা হয়েও তার নেই সেটা জানতেন। বরং যাবেই যখন, সঙ্গে বউ নিয়ে যাক। কিন্তু এবার ব্রজেন্দ্রও ভাগ্নেকে বশ মানাতে পারেন নি দেখে কৃষ্ণনাথ মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। নিজের দুর্দান্ত রূপটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছেলের সামনে। তাতে হিতে বিপরীত হয়ে গেছে। শতদ্রু বাবাকে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, বসন্তপুরে আর কোনোদিন সে যাবে না। এই জঘন্য দেশে থাকতেও তার আর একটুও ইচ্ছা নেই। অমন শান্ত শিষ্ট অমায়িক প্রকৃতির ছেলে ছিল শতদ্রু। কৃষ্ণনাথ এর জন্য মনে-মনে ব্রজেন্দ্রকেই দায়ী করেছেন আশ্চর্য, ব্রজেন্দ্রের সামনে শতদ্রু বাবাকে একরকম অপমানই করল, ব্রজেন্দ্র চুপ করে থাকলেন। কৃষ্ণনাথ রাগ করে চলে এসেছেন কলকাতা থেকে।

তবে ব্রজেন্দ্রের সামনে ছেলেকে শুনিয়েও এসেছেন কড়া কথা। 'বদমাস ডাকু কালু মুখুয্যের কুচ্ছিত নাতনিকে বিয়ে করতে বাধা দিয়েছি বলেই তো? তুমি জানো ওদের বংশের কীর্তিকলাপ? কালু মুখুয্যে একটা খোঁড়া অসহায় মেয়েকে কোত্থেকে লুঠ করে এনে লুকিয়ে রেখেছিল জানো? শুনেছি সেটা খুব নীচু জাতের মেয়ে। তারই পেটের ছেলে ছিল গউর মুখুয্যে—আড়তে খাতা লিখত আর গাঁজা খেত। সেই গউরের মেয়েকে তোমার চোখে ধরল শেষপর্যন্ত—এত দেশবিদেশ ঘুরে এসে এই? ছি ছি ছি! ছিঃ।'

ছেলের কাছ থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণনাথ শোনেন এবার মেয়ের কীর্তি। রাগে দুঃখে এবং কিছুটা আতংকেও কৃষ্ণনাথ ঝিমিয়ে পড়েছেন। কীর্তিই বটে।

কিছুদিন আগে সন্ধ্যাবেলায় বাগানে বর্মীবাঁশের ঝাড়ে অজ্ঞান হয়ে মুখ গুঁজে পড়েছিল বিপাশা। তারপর থেকে তাকে জোর করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। শমিতা সবসময় মেয়ের পাশে। গতরাতে তাঁর তন্দ্রামতো এসেছে, হঠাৎ কেটে গেল বিপাশার কথায়। সে কার সঙ্গে কথা বলছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে দেখেন, বিপাশা দিব্যি তাকিয়ে আছে এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন এক অদৃশ্য লোকের সঙ্গে কথা বলছে। তারপরই চমকে ওঠেন শমিতা। বিপাশা অনি নামে সেই সাংঘাতিক ছেলেটার সঙ্গে যেন কথা বলছে। স্পষ্ট বলছে, 'অনি! তুমি আর এস না। জানাজানি হয়ে যাবে।'

শমিতা ভীষণ ভয় পেয়ে যান। বিপাশাকে ডাকাডাকি করেন। ধাক্কা দেন। বিপাশা বিড়বিড় করে বলে, 'হাওয়াকলের কাছে। হাওয়াকলের কাছে আমি যাব না। আমার বড় ভয় করে হাওয়াকলের কাছে যেতে।'

কৃষ্ণনাথ কাঠ হয়ে শুনছিলেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'হাওয়াকল?'

'হ্যাঁ। তাই তো বলল।' শমিতা চাপাগলায় বললেন। 'তারপর মুখে জল ছেটালুম। ঠাণ্ডার মধ্যে টেবিলফ্যানটাও মাথার কাছে খুলে দিলুম। ডাক্তার যে ট্যাবলেটটা ফিটের সময় মুখে পুরে দিতে বলেছেন, তাও দিলুম। কিন্তু জ্ঞান হল না। তবে চোখ বুজল। মনে হল ঘুমোচ্ছে।'

কৃষ্ণনাথ গলার ভেতর ফের বললেন, 'হাওয়াকলের কথা বলছিল? আশ্চর্য তো।'

'তারপর শোন কী হল। এই দেখ, আমার হাত পা কাঁপছে।' শমিতা বললেন। 'তারপর আবার ঘুমিয়ে গেছি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, বয়াস লেপ ছেড়ে উঠে আমার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললুম, কোথায় যাচ্ছিস? আমায় ধাক্কা মেরে খাটের নিচে নামল। আমি আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলুম। তখন ধস্তাধস্তি করতে শুরু করল আর কাঁদতে কাঁদতে কী বলল জানো?' শমিতা আরও গলা চেপে বললেন, 'আমি অনির কাছে যাব। ছেড়ে দাও, আমি অনির কাছে যাচ্ছি। হাওয়াকলের কাছে অনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমায় ছেড়ে দাও।'

কৃষ্ণনাথ তাকালেন। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন।

শমিতা বললেন, 'আমি কাপড়চোপড় সামলে উঠতে না উঠতে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে। তখন ভুলোদের ডাকলাম। সবাই ছুটে গেল সিঁড়ি বেয়ে। আমিও গেলুম। ও তখন দৌড়ুচ্ছে। খুব জ্যোৎস্না ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, কেউ ওকে আটকাতে পারল না। গায়ে যেন অসম্ভব স্ট্রেন্থ।

একেবারে হাওয়াকলের ওখানে—মানে ইঁদারার জায়গায় আছাড় খেয়ে পড়ল। প
পড়ার সময় সে কী চিৎকার অনি বলে। সে-চিৎকার শুনলে মনে হবে, অন্ত
কেউ।'

'হুঁ। তারপর ?'

'অজ্ঞান হয়ে গেল। কাঁটা-খোঁচে মুখ, গলা সব চিরে রক্তারক্তি। কাপড়
ফালা-ফালা হয়ে গেছে। ধরাধরি করে তুলে আনা হল। তখন রাত তিনটে।
ডাক্তার চ্যাটার্জিকে ফোন করলুম। ভদ্রলোক একটু পরেই এলেন। ওষুধ দিলেন।
ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেলেন। বললেন, ইমিজিয়েটলি কলকাতায় নিয়ে যান
কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। আর ফেলে রাখবেন না। অবস্থা সিরিয়াস
মনে হচ্ছে।'

কৃষ্ণনাথ ফের শুধু বললেন, 'হাওয়াকলের কাছে! তাহলে কি ও…'

থামতে দেখে শমিতা বললেন, 'কী ?'

'কিছু না। কী করছে এখন ?'

'শুয়ে আছে। টেপরেকর্ডার চালিয়ে গান শুনছে।'

'স্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে তো এখন ?'

'বলছে। তবে কথা বলছে খুব কম।'

'খাওয়াদাওয়া ?'

'খাচ্ছে, তবে বলছে মুখের স্বাদ নেই।'

'চলো, গিয়ে দেখছি।'

কিছুক্ষণ পরে পোশাক বদলে কৃষ্ণনাথ বিপাশার ঘরে গেলেন। শমিতা
পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। টেপরেকডারে বিদেশী অর্কেষ্ট্রা বাজছে। জানালা দিয়ে
দক্ষিণ থেকে রোদ এসে পড়েছে বিপাশার গায়ে। সে একটা চাদর বুক অব্দি
ঢেকে শুয়ে আছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন কৃষ্ণনাথ।
মাত্র দুতিনদিনেই বিপাশার চেহারা আরও মলিন হয়ে গেছে কেন? মুখের রঙ
পাণ্ডুর। চোখের তলায় কালি। কী এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাবাকে দেখেই চোখ
নামাল। কৃষ্ণনাথ গিয়ে মাথায় হাত রেখে ডাকলেন, 'বিয়াস!'

বিপাশা একটু হেসে বলল, 'উঁ ?'

'কেমন বোধ করছ এখন ?'

'তুমি কলকাতা গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'দাদা এল না ?'

কৃষ্ণনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, 'আসবে। ওর তো কলকাতায় কোনোদিন মন টেঁকে না। টিকবে কী করে? বরাবর মেট্রপলিসে মানুষ। তারপর অ্যামেরিকার মতো জায়গায়। এখন তো আর এদেশের কোনো মেট্রপলিসে মন টিকবে না।'

শমিতা বললেন, চল্। তুই-আমি কলকাতা যাই। দাদা রোজই তো ডাকছেন। তোকে অনেকদিন দেখেন নি। যা'বি?'

বিপাশা আস্তে বলল, 'উঁহু। আমি কোথাও যাব না।'

শমিতা হেসে বললেন, 'সে কী। কেন রে?'

বিপাশা চুপ করে থাকল। কৃষ্ণনাথ বললেন, 'যাবে, যাবে। শরীরটা একটু দুর্বল তো। ওষুধ টষুধ খেয়ে গায়ে স্ট্রেন্থ হোক—তবে না।'

একটু পরে কৃষ্ণনাথ বেরিয়ে গেলেন। বিকেল নেমেছে। অমরনাথের সুইমিং পুলের কাছে কিছুক্ষণ আনমনে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর হাওয়াকলের ইঁদারার দিকটায় চোখ রাখলেন। হঠাৎ মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড ক্রোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। হনহন করে এগিয়ে গেলেন লুপ্ত ইঁদারার ঝোপের কাছে। একটা ভাটফুলের ঝোপের মাথা খামচে ধরলেন কৃষ্ণনাথ। পটপট করে ছিঁড়ে গেল একগুচ্ছ বন্য ফুল।

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে কৃষ্ণনাথ চোখের দৃষ্টিতে জরিপ করছিলেন। বাড়ির দোতালায় পুবদক্ষিণ কোণে বিপাশার ঘর। জানলা থেকে এখানটা সরাসরি নজরে পড়ে। বিপাশা কি কিছু দেখেছিল তাহলে?

ভাটফুলগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন কৃষ্ণনাথ। তাঁর হঠাৎ কেমন গা ছমছম করতে থাকল। দ্রুত চলে এলেন ওখান থেকে। কিছুটা দূরে চৌকোনা পুকুরের ঘাটের মাথায় বাঁধানো জীর্ণ চত্বরে বসে পানজাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। কিন্তু ধরাতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!

'অপু, অপু!'

অপরূপা হনহন করে ফিরে আসছিল ব্লক কোয়ার্টারে টিউশনি সেরে। মেজাজ ভাল নেই। সেই সময় নির্জন রাস্তায় কেউ পেছন থেকে চাপা গলায় ডাকলে। ঘুরে দেখল হরেন।

বটগাছের তলায় সে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মিটিমিটি হাসি। 'অপু কি রাগ করেছ আমার ওপর? আহা, শোনোই না।' সে হাত তুলে কাছে ডাকল।

অপরূপার বুকের ভেতর কী একটা কাঁপুনি। সে আস্তে বলল, 'বলো। আমার জরুরী কাজ আছে।'

'যা বাবা! তোমার হল কী বলো তো?' হরেন সাইকেল ঠেলে নিয়ে কাছে এল। 'টিউবটা এখানে এসেই পাংচার হয়ে গেল হঠাৎ। এক জায়গায় যাচ্ছিলুম। কী গেরো দেখ তো।'

অপরূপা বলল, 'সারিয়ে নাও গে।'

পায়ে হাঁটতে হাঁটতে হরেন বলল, 'আমি জানি তুমি রাগ করেছ। সেদিন ঝোঁকের মাথায় হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।'

অপরূপা কোনো কথা বলল না।

হরেন বলল, 'ক্ষমা চাইতে যেতুম তোমার কাছে। সাহস হচ্ছিল না। তুমি এজুকেটেড মেয়ে, আমি স্কুলফাইন্যাল।' সে হাসতে লাগল। 'আমার এসব বাড়াবাড়ি সাজে না। তাই না?'

অপরূপা হেসে ফেলল ওর কথার ভংগিতে। বলল, 'সাইকেল সারিয়ে নিয়ে যেখানে যাচ্ছিলে যাও। আমি চলি।'

হরেন বলল, 'শোনো অপু, সাধুবাবু ফিরেছেন এ্যাদ্দিনে। ওনাকে তোমার কথা বলেছি।'

অপরূপা তাকাল তার মুখের দিকে। মুহূর্তে তার মনের সব জ্বালা একপাশে সরে গেল। বলল, 'কী বললেন?'

'বললেন ভালই।' হরেন গাম্ভীর্য নিয়ে বলল। 'বুঝতেই পারছ অপু, তোমার ব্যাপারটা সব সময় আমি ভাবি। এ অবস্থায় কীভাবে তোমরা দুটি বোন বেঁচে আছ, ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়। ঘরদোরের অবস্থাও তো ওই। কখন…'

কথা সেরে অপরূপা বলল, 'কী বললেন সাধুবাবু?'

হরেন একটু হাসল। 'বহরমপুরের অফিসে, নয়তো কলকাতার অফিসে—যেখানে হোক, মনে হচ্ছে হয়ে যাবে। দেশজোড়া ট্রান্সপোর্টের কারবার তো। শিগগির হয়ে যাবে। আমি চেষ্টায় রইলুম।'

'আমি বরং গিয়ে দেখা করি সাধুবাবুকে। কী বলো?' অপরূপা আগ্রহে বলল।

হরেন বলল, 'আরও একটু এগোতে দাও আমায়। বুঝলে না? কোটিপতি লোক। কখন মেজাজ কেমন থাকে। সময় হলে আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে দুলতে অপরূপা বলল, 'যাঃ! সব তোমার চালাকি!'

হরেন দাঁড়িয়ে গেল। অভিমান দেখিয়ে বলল, 'এতটুকুন বেলা থেকে তোমায় আমি দেখছি। তুমিও আমায় দেখছ। আমাদের অবস্থা না হয় এখন পড়ে গেছে—তোমাদেরও গেছে। কিন্তু এত সত্ত্বেও কি কখনও তঞ্চকতা করতে দেখেছ আমাকে? সৎভাবে থেকে দুটো পয়সা রোজগার করি। কারুর হরে-হম্মে খাই নে। তাহলে তো কবে আঙুল ফুলে কলাগাছ হত।'

এসব শোনার পর অপরূপা ওর কথায় অবিশ্বাস করবে কোন যুক্তিতে? মিষ্টি হেসে বলল, 'হয়েছে বাবা, হয়েছে! আমি কি তাই বলেছি?'

হরেন বলল, 'অপু! বিকেলে এসো না! আমাদের অফিসের সামনে এসে একটু দাঁড়াবে। আজ দুজনে সার্কাস...'

'সার্কাস এসেছে শুনেছি।' অপরূপা ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলল। "রনি দেখতে চাইছিল। তো ঠাকুমার যা অবস্থা।'

'কী হয়েছে গো ওনার?'

হরেনের কথার মধ্যে স্নেহ ছিল। অপরূপার ভাল লাগল। বলল, 'প্যারালেসিস মনে হচ্ছে। মুখটা বেঁকে গেছে। কথা বলতে পারছে না।'

'কাকে দেখাচ্ছ?'

'দেখানো হয় নি। ভাবছি।'

'ভাবছ?' হরেন প্রায় তেড়ে এল। 'তোমরা কী বলো তো অপু? আমায় জানাবে তো? গউরকাকা আমার আপন কাকার মতো ছিলেন। ছ্যা ছ্যা, বলতে হয় আগে। রতুজ্যাঠাকে কবে ধরে নিয়ে আসতুম।'

হরেন যখন সাইকেলের চাকার লিক না সারিয়ে তক্ষুনি অপরূপাদের বাড়ি চলে এল, অপরূপার সংশয়টুকু চলে গেল তার ওপর থেকে। গৌরীমোহন বেঁচে থাকতে হরেন কয়েকবার নানা কাজে এ বাড়ি এসেছে। বাড়ি ঢুকে চারপাশে তাকিয়ে সে খুব আফশোস করল। কী অবস্থা হয়েছে বাড়িটার! কুড়ানি ঠাকরুন বারান্দার থামে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন। সে কাছে বসে খুব কথা বলতে থাকল তাঁর সঙ্গে।

রঞ্জনা ইঁদারাতলায় কাপড় কাচছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

অপরূপা হরেনকে ঠাকুমার বাঁকাশ্রীরামপুরে যাওয়ার পুরো ঘটনাটা জানাল।

শুনে হরেন রাগ দেখিয়ে বলল, 'সেই গাঁজাখোর রাস্কেলটা? সে তো বসন্তপুরেই আছে। তোমায় বলেছিলুম না? তারপর তো আর কিছু জানালে না। কালও দেখেছি ওকে। থামো, হীরুকে দিয়ে ওকে রামপেঁদান পেঁদাচ্ছি।'

অপরূপা বলল, 'না না। যা হবার হয়েছে হরেনদা। ভুলটা তো আমাদেরই।'

রঞ্জনা ইঁদারাতলা থেকে বলল, 'মথুরবাবু এসেছিল হরেনদা।'

হরেন লাফিয়ে উঠল। 'এসেছিল? কখন?'

অপরূপাও বলল, 'কখন রে?'

রঞ্জনা হাসতে হাসতে বলল, 'একটু আগে এসে বললে কী জানো? ঠাকুমা মিথ্যে বলেছে। ফেলে পালায় নি—আসলে নাকি ঠাকুমাই তাকে কী কথায় গালমন্দ করেছিল। এইসব আবোল-তাবোল!'

অপরূপা ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠাকুমা! তুমি ওকে লাঠি পেটা করলে না? আর রনি, তুই বা ওকে বাড়ি ঢুকতে দিলি কেন?'

কুড়ানি ঠাকরুন ভুরু কুঁচকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঞ্জনা বলল, 'দরজা খুলতেই দৌড়ে গিয়ে ঠাকুমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।'

'ঢঙ!' অপরূপা বাঁকা মুখে বলল। 'আমি থাকলে মজা দেখিয়ে দিতুম।'

হরেন বলল, 'ঠাকুমার চিকিৎসার দায়িত্ব আমার। এক্ষুনি রতুজ্যাঠাকে ধরে আনছি।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'হরেনদা, আমার কাছে ততকিছু টাকাপয়সা নেই যে। বরং হোমিওপ্যাথি ওষুধের ব্যবস্থা করব।'

হরেন বলল, 'ধুর ধুর! ওসব ছাড়ো তো। আমি এক্ষুনি আসছি।'

সে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলে অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ রে রনি। সেদিন পড়াতে গিয়ে সুষমাদিকে কী এমন বলেছিস বল্ তো—রোজ আমায় কথা শোনাচ্ছে।'

রঞ্জনা একটু ভয় পেয়ে বলল, 'কী বলব? কিছুই তো বলিনি ওকে।'

'বলিস নি তুই ভাল ইংরিজি পড়াতে পারিস? আমি নাকি ইংরিজিতে বরাবর কাঁচা। বলিস নি এসব?'

রঞ্জনা চোখ বড় করে বলল, 'এ রাম! তাই বলছে বুঝি?'

'বলেছিস, তাই বলছে।' অপরূপা অন্যদিকে ঘুরে ফের বলল, 'তোর টিউশনির ইচ্ছে থাকে তো কর্। আমি তো তোকে বরাবর বলি। চুপচাপ না বসে থেকে টিউশনিই কর। পয়সা পাবি। নিজের জামাকাপড়টা হবে। করবি?'

'দিদি। বিশ্বাস কর, ওঁকে কিছু বলিনি এসব।' রঞ্জনা প্রায় কেঁদে ফেলল।

'ভ্যা কন্নিস নে তো। কান্নাকাটি আমার খারাপ লাগে।' অপরূপা কাপড় বদলাতে ঘরে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল। ডাক্তার আসবে। সে ফের বলল, 'পরদিন গিয়েই বুঝেছিলুম একটা কিছু হয়েছে। আমার ভুল ধরতে শুরু করল সুষমাদি। ভুল করছি না—অথচ বলছে, না ওটা কারেক্ট নয়। তারপর থেকে রোজ শোনাচ্ছে, পড়াশোনা ভাল হচ্ছে না। ক্ল্যাসটিচার বকাবকি করছে। হোমটাস্কে ভুল থাকে নাকি। আসলে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে চায়। অথচ কথাবার্তা শুনে এও বুঝতে পারি, তোকে ওর খুব পছন্দ। শতমুখে তোর প্রশংসা।'

রঞ্জনা কাপড়গুলো নিঙড়ে উঠোনের তারে মেলে দিচ্ছিল। কোনো কথা বলল না।

'তুই করবি ওখানে টিউশনি? আমি বরং আরেকজায়গায় দেখে নেব।'

রঞ্জনা বেশ বোঝে, দিদি তার মনোভাব জানতে টোপ ফেলল। সে বলল 'না।'

'অন্য কোথাও?'

'বকবক করতে আমার ভাল লাগে না।'

এবার অপরূপা হাসল একটু। 'হ্যাঁ রে, সংসার চলবে কী করে তাহলে? দুজনে টিউশনি করলে কতগুলো টাকা মাসে ঘরে আসে বল্। হরেনদা এলে ওকে বলি, তোকে কোথাও একটা টিউশনি দেখে দিক।'

রঞ্জনা গোঁ ধরে বলল 'না। ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'তা হলে কেন? তোর কত ব্রাইট ফিউচার! সায়েবসুবো বর তোর জন্য ওয়েট করছে। জেটপ্লেনে তুলে নিয়ে চলে যাবে।' অপরূপা খিলখিল করে হাসতে লাগল। 'আর তুই মেমসায়েব হয়ে যাবি। তাই না?'

রঞ্জনা উঠোন থেকে দিদির হাসিটা দেখল। অশ্লীল বিকৃত এক হাসি। সে ফোঁস করে শ্বাস ফেলে খিড়কির দরজার দিকে চলে গেল। জীবনে এই প্রথম তার সংশয় জাগল, দিদি কি তাকে ঈর্ষা করে?

কিছুক্ষণ পরে হরেন এল রতুডাক্তারকে নিয়ে। রতিকান্তও হরেনের মতো বাড়ির অবস্থা দেখে একটু পস্তালেন। তারপর কুড়ানি ঠাকরুনের সামনে যেতেই উনি থামের দিকে ঘুরে আক্রান্ত কোণঠাসা জন্তুর মতো গোঙিয়ে উঠলেন, 'নাঁ। নাঁ। নাঁ।'

অপরূপা জোর করে ঠাকুমাকে ঘোরাল ডাক্তারবাবুর দিকে। কিন্তু বৃদ্ধার

ছটফটানি বন্ধ হল না। অপরূপা প্রথমে হাসছিল। পরে রেগে গেল। হরেন সুদ্ধ কুড়ানি ঠাকরুনকে চেপে ধরল থামটার সঙ্গে। রতু ডাক্তার খিক খিক করে হেসে বললেন, 'গউরের মা যে ওষুধ-টষুধ খায় না, তা জানি বলেই না তোকে বললুম হরেন, বৃথা চেষ্টা?'

ক্রুদ্ধ অপরূপা বলল, 'ইঞ্জেকশান দিন ডাক্তারজ্যাঠা। ছটফটানি কমবে। আদিখ্যেত! নিজে ভুগবে, আমাদেরও ভুগিয়ে ছাড়বে।'

ইঞ্জেকশান শুনেই কুড়ানি ঠাকরুন গোঁ গোঁ করে আরেকদফা ধস্তাধস্তি করে ফেললেন। রতিকান্ত সত্যি ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ বের করে বললেন, 'একটুখানি জল চাই যে গো! হবে নাকি?'

অপরূপা রঙ্গনাকে ডাকতে থাকল। কিন্তু রঙ্গনার সাড়া নেই। হরেন বলল, 'তুমি করে নিয়ে এস। আমি ধরে থাকছি ঠাকুমাকে।'

অপরূপা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ুল। এবার বৃদ্ধা দুর্বোধ্য শব্দে হরেনের দিকে চোখ কটমটিয়ে কী সব বলতে লাগলেন। হরেন বুঝতে পারছিল, যাচ্ছেতাই গাল দিচ্ছেন কুড়ানি ঠাকরুন। কিন্তু সে দাঁত বের করে হাসিমুখে বলল, যত শাপই দিন ঠাকুমা, এ বাবা যমের হাতে পড়েছেন। আর ছাড়াছাড়ি নেই। আপনাকে সিধে না করে হরেন যাচ্ছে না।'

রতু ডাক্তার বারান্দায় ভাঙা চেয়ারে বসে ঘরদোরের অবস্থা দেখছিলেন। চাপা গলায় হরেনকে বললেন, 'কালু মুখুয্যের নামে একসময়, বুঝলি হন্না, বাঘেগরুতে একঘাটে জল খেত। একেই বলে মহাকাল! তুই এদের হিসট্রি কিছু জানিস নিশ্চয়। আমাদের ছোটবেলায়...' হঠাৎ থেমে গিয়ে দেখলেন বৃদ্ধা শান্তভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাই বললেন, 'কিছু বলবেন মা? কষ্ট হচ্ছে বুঝি? এক মিনিট সহ্য করুন—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বৃদ্ধা কী একটা বললেন, বুঝতে পারলেন না। 'কী বলছেন রে হন্না, বুঝতে পারছিস?' রতু ডাক্তার জিগ্যেস করলেন।

হরেন অনুমান করে বলল, 'হয়তো বাঁকা-শ্রীরামপুরের কথা জিগ্যেস করছেন। ওনার বাপের বাড়ি নাকি সেখানে। বিয়ের পর আর যান নি। কিন্তু আমার বড্ড অবাক লাগছে ডাক্তারজ্যাঠা! বাপের দেশ কোথায় তা ভুলে গেছেন, এমন কী করে হয়? অপুর কথাটা মাথায় ঢুকল না।'

রতু ডাক্তার রহস্যময় হেসে বললেন, 'হয়, হয়। হিসট্রিটা তো তুই জানিস নে হন্না! তাই বলছিস। তোকে বলব'খন।'

হরেন হাসল। 'কিন্তু জায়গাটা কোথায়? শুনেছি বলে মনে হচ্ছে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওই তো মনিগ্রামের আগের স্টেশন বস্তিপুর—সেখান থেকে মাইল তিনেক হবে। আগে স্টেশনের নাম ছিল নাকি কেঁচুয়া। লাইনের পাশেই ছিল হাড়িদের একটা ছোট্ট গাঁ। পরে নাম হয়েছে বস্তিপুর। বেশ বড় গ্রাম। বস্তিপুরে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি না? এখন অবশ্যি ওরা ভাগলপুরে আছে।'

বৃদ্ধা কান খাড়া করে শুনছিলেন। এবার বুক ফেটে কেঁদে উঠলেন। হরেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কাঁদবেন না ঠাকুমা! আমি আপনাকে বাকাশ্রীরামপুর নিয়ে যাব।

এর পর কুড়ানি ঠাকরুন শান্ত মেয়েটি হয়ে চোখ বুজে ইনজেকশান নিলেন। তার সারাশরীর অবশ্য থরথর করে কাঁপছিল। চোখ বুজে ফেলেছিলেন। রতুডাক্তারকে হরেন বিদায় করে এসে বলল, 'ওষুধ আনবে কে? এতক্ষণে আমার সাইকেল রেডি হয়ে গেছে। আর তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না দাদু। মালিকের কাজে যেখানে যাচ্ছিলুম যেতে হবে।'

অপরূপা বলল, 'বনিকে পাঠাচ্ছি। কৈ প্রেসক্রিপশানটা দাও।'

হরেন প্রেসক্রিপশানের সঙ্গে একটা দশটাকার নোট দিয়ে বলল, 'এতেই হয়ে যাবে। যদি লাগে, বাকি রেখে এস আমার নাম করে। নাও, হেজিটেট করো না। আমায় আপনজন ধরে নাও না।'

অপরূপ টাকাটা নিতে আর আপত্তি করল না। হরেন যাবার সময় বিকেলে সার্কাসের কথাটা ইশারায় মনে করিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অপরূপা কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক রইল। কুড়ানি ঠাকরুন বারান্দার মেঝেতে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছেন। রঙ্গনা এসে চমকে উঠল। তারপর পাশে বসে ডাকাডাকি করতেই বৃদ্ধা চোখ খুলে কী একটা বললেন। রঙ্গনা অবাক হয়ে দেখে ঠাকুমা কেমন যেন হাসছেন।

রঙ্গনা তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'দিদি! দ্যাখ্, ঠাকুমা হাসছেন কেন?'

অপরূপা বলল, 'বলেছি না ঢঙ? লোকের সামনে এমন করে যে প্রেসটিজ পর্যন্ত থাকে না।'

কুড়ানি ঠাকরুন রঙ্গনার এক কানে হাত রেখে হাউ মাউ করে বলে উঠলেন, 'কেঁচুয়া! কেঁচুয়া!'

রঙ্গনা আরও চমকে উঠে বলল, 'দিদি! ঠাকুমা কী বলছে!'

'ওই যে রতুডাক্তার ওকে বাপের বাড়ির হদিস দিয়ে গেল এতদিনে।'

অপরূপা বলতে বলতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ফের বলল, 'কেঁচুয়া না ফেঁচুয়া—কী একটা স্টেশন ছিল। এখন হয়েছে নাকি বস্তিপুর। মনিগ্রামের আগের স্টেশন। সেখানে নেমে বাঁকাশ্রীরামপুর না ধাদ্ধাড়া-গোবিন্দপুর —সেখানে যেতে হয়।'

রঙ্গনা উত্তেজিতভাবে বলল, 'ইস্! আমরা কেন রতুবাবুকে জিগ্যেস করিনি রে দিদি?'

এতদিনে কুড়ানি ঠাকরুন দীর্ঘ এক আচ্ছন্নতা কাটিয়ে যেন জেগে উঠলেন। তাঁকে চঞ্চলা বালিকা বলে ভ্রম হচ্ছিল। রান্নাঘরে গিয়ে বাঁধতে হাত লাগালেন। সারা দুপুর আপন মনে বিকৃত স্বরে অনর্গল কথা বলতে থাকলেন। কাঠের সিন্দুক, বাকসো-প্যাটরা হাতড়ালেন। বিকেলে পেনী এলে তাকে দিয়ে জল আনিয়ে গাছ-লতাবিতানের গোড়ায় নিজের হাতে জল সেচন করলেন।

রঙ্গনা ওষুধ এনে দিয়েছিল। কিন্তু ওষুধটা খাওয়ানো যায় নি। রাগ করে দুইবোন একস্বরে বলেছিল, 'চলো—তোমায় বাপের বাড়ি রেখে আসি।' অর্থাৎ তাঁর দায়িত্ব আর তারা বইবে না।

বিকেলে অনেক দোনামনার পর অপরূপা সেজেগুজে বেরিয়ে গেল। তখন রঙ্গনা সুযোগ পেল। মধুরবাবুর বইটা বের করল গুটিয়ে রাখা লেপতোষকের তলা থেকে। বইটা তখন ভাল করে খুলেও দেখে নি। ঠাকুমাকে সেধে আধুলি যোগাড় করে দিয়েছিল মধুরবাবুকে। বলে গেছেন, 'আরও একটা আধুলি পাওনা রইল।' এখন বইটা খুলে দেখে 'স্টোরিজ ফ্রম দি এ্যারাবিয়ান নাইটস।' লনডন থেকে টমাস নেলসন এ্যাণ্ড সনসের প্রকাশিত। ১৯১২ সালে ছাপানো। টাইটেল পেজে লেখা আছে 'ইনক্লুডিং সিন্দবাদ দি সেলর এ্যাণ্ড দি স্টোরি অফ আলাদিন।' তারপরের পাতা উল্টেই সে চমকে উঠল।

বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে। দিস বুক বিলংস্ টু মাস্টার আশুতোষ সান্যাল। রঙ্গনা খুব বিব্রত বোধ করছিল। মধুমিতার বাবা। মধুমিতাই তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। গত বছর বিয়ে হয়ে জামসেদপুরে আছে। আশুবাবু স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এখন অবসর নিয়েছেন। লম্বা রোগা মানুষ। খুব বদরাগী। রঙ্গনা ভেবে পেল না ওদের বাড়ি থেকে কীভাবে বইটা চুরি করল মধুরবাবু!

সে ডটপেন বুলিয়ে নামটা ঢেকে দিল ভাল করে। পাতাটা ছিঁড়তে মায়া হল। কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে রইল রঙ্গনা। ছোটবেলায় কতসব ভাল-ভাল

বই পায় কুড়ো লোকে। চুরির বই তো নয়—কিনে দেয় বাবা কিংবা কোনো স্নেহময় আত্মীয়। তাকে কেউ কোনোদিন বই কিনে দেয় নি। সে বইটার গন্ধ শুঁকে দুঃখটা আরও তীব্রভাবে অনুভব করতে থাকল। তারপর উঠোনের দিকে তাকাতে চোখে পড়ল, কুড়ানি ঠাকরুনের কাপড় খুলে গেছে কোমর থেকে। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় পা ঘষটে চলার চেষ্টা করছেন। সে দৌড়ে গিয়ে বলল, 'এ কী ঠাকুমা! এ রাম!'

জানালার নিচে একটা লোক

বিপাশা বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে উঁচু বেডে। শতদ্রু পাশে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। 'কতকটা বসন্তপুরে আমাদের বাড়ির মতো পরিবেশ, তাই না বিয়াস? রেলিংয়ের ওধারে একটা পুকুর পর্যন্ত।'

বিপাশা বলল, 'ওটা পাবলিক পার্ক। তুই এদিকে আসিস নি কখনও?'

'না।' শতদ্রু হাসল। 'দরকার হয়নি। আমার তো তোর মতো অসুখ হয় নি!'

'বাজে কথা বলিস নে দাদা! আমার কোনো অসুখ হয় নি।'

শতদ্রু সতর্ক হল। বলল, 'ইস! কত ক্রিসেন্থিমাম ফুটেছে দেখছিস? তুই লাকি বিয়াস।'

বিপাশা হাতে একটা ছোট্ট রুমাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'কেন চলে যাচ্ছিস?'

'উঁ?' শতদ্রু তাকাল। তারপর বুঝতে পেরে বলল, 'তাই তো কথা ছিল। তোদের দেখতে আসব। কিছুদিন থাকব। উইন্টার সিজন ততদিনে চলে যাবে। বরফ গলবে। তখন ফিরব।'

'ফেব্রুয়ারি বুঝি উইন্টার সিজন না?'

শতদ্রু চোখ নাচিয়ে বলল, 'আরবানা হিলসে স্নোর ওপর এখন দারুণ স্কেটিং করা যায়। তার ওপর স্কিইং। এখন তো স্কিইং সিজন। জানিস? গত শীতে আমরা ক'জন মিলে কলোরাডো গিয়েছিলুম। রকি মাউন্টেন এলাকায় ভেইল নামে একটা জায়গা আছে। চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে সেখানে স্কি সেন্টার। ইউরোপ থেকেও সেখানে লোকেরা স্কি করতে যায়। ছবিতে তো দেখেছিস ব্যাপারটা। দেখিস নি?'

বিপাশা মাথাটা একটু দোলাল। তারপর রুমালটা ভাঁজ করে বলল, 'রঙ্গনাকে তোর পছন্দ হয়েছিল—আমি সেই সন্ধ্যাবেলাতেই বুঝতে পেরেছিলুম। তারপর বেড়াতে গিয়ে কতক্ষণ তুই রঙ্গনার কথা বলছিলি।'

শতদ্রু চমকে গিয়েছিল। বলল, 'হঠাৎ ওকথা কেন রে?'

'তুই তো রঙ্গনার ব্যাপারেই রাগ করে চলে যাচ্ছিস!'

শতদ্রু হাসতে হাসতে বলল, 'যাঃ! কী যে বলিস!'

'অপুদার কাছে শুনলুম, তুই নাকি একটা ব্যালেট্রুপের সঙ্গে জাপান হয়ে ফিরবি।' বিপাশা বগ্র মুখে একটু হাসল। 'অপুদা বলছিল, ট্রুপের একটা মেয়েকে তোর পছন্দ হয়েছে। তাকে কি বিয়ে করবি নাকি?'

শতদ্রু বলল, 'অপুটা স্কাউণ্ড্রেল।'

'মেয়েটাকে ওবেলা নিয়ে আসবে অপুদা।'

'মাই গুডনেস!' শতদ্রু চমকানোর ভংগি করল। 'অপু তুই কি আমার গার্জেন হয়েছিস শেষঅব্দি?'

বিপাশা রুমালের ভাঁজ এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'জানিস দাদা? পরে ভেবে দেখেছি—রঙ্গনাকেই তোর বিয়ে করা ভাল। বাবা-মায়ের কথা শুনিস নে। ওকে বিয়ে করে নিয়ে তুই চলে যা।'

'বিয়াস। প্লীজ ওসব কথা থাক্।'

বিপাশার দুচোখে আগ্রহ ফুটে উঠল। বলল, 'রঙ্গনাকে আমি ছোটবেলা থেকে ভীষণ ভালবাসি—মুখে যাই বলিনে কেন। ও এলে আমার খুব ভাল লাগত বরাবর। তুই আসার পর কী হল, ও আসা বন্ধ করল। তুই জানিস নে ও কী অসাধারণ মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট ছিল। টাকার অভাবে পড়াশুনো হল না।'

'অত বেশি কথা বললে টায়াড হয়ে পড়বি বিয়াস!'

বিপাশা গ্রাহ্য করল না। বলল, 'অপরূপাকে আমি লিখছি বরং। আজই লিখছি। সেই তো এখন গার্জেন!'

শতদ্রু অপরূপাকে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু কথাটা বলল না। চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই চুপ করবি?' শতদ্রু অবশ্য হাসছিল।

বিপাশা বলল, 'দাদা। আর বোধ হয় আমার চুপ করে থাকা উচিত নয় রে। বসন্তপুরে থেকেই তোকে একটা চিঠি লেখার কথা ভেবেছিলুম। রাগ করে লিখিনি—তুই বসন্তপুরে যাবি না শুনে। মামাবাবুদের ওখানে এসে তোকে কিছু বলার সুযোগ পাই নি। আয়, এখানে বস।'

শতদ্রু ওর বেড়ে বসে মিটিমিটি হেসে বলল, 'বসলুম। বল্।'

'দাদা, তুই রঙ্গনাকে বিয়ে কর্।'

শতদ্রু কৌতুকের ভংগিতে বলল, 'বেশ, করা যাবে। কিন্তু ওর গার্জেন যদি রাজি না হয়? ওরা তো গ্রামের বামুন। কায়েতের ছেলের সঙ্গে মেয়েব বিয়ে দেবে কেন?'

'বাজে কথা। অপরূপা বর্তে যাবে—আমি জানি।'

শতদ্রু মাথা নেড়ে বলল, 'তুই কিছুই জানিস নে। বসন্তপুর কলকাতা নয়।'

বিপাশা একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'আমার শরীরটার যে ছাই কী হয়েছে। খালি মাথা ঘোবে। আগের মতো হলে আমিই সব করতুম।' বলে সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলে উঠল, 'রঙ্গনাকে তুই বিয়ে করলে অনির আত্মা শান্তি পেত। অনি রঙ্গনাকে অপরূপাব চেয়ে বেশি ভালবাসত। রঙ্গনার জন্য কত গর্ব ছিল অনির। আমি সব জানি। রঙ্গনা যেবার স্কুলফাইনালে স্ট্যাণ্ড করল...'

শতদ্রু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এবার কথা কেড়ে বলল, 'কী বললি? অনির আত্মা না কী যেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে তো বেঁচে আছে বলেছিলি। এ্যাবস্কণ্ডার হয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বলেছিলি।'

বিপাশা আস্তে বলল, 'নেই।'

'সে কী!'

বিপাশা নিষ্পলক দৃষ্টে তাকিয়ে কাছে জানলার দিকে। বলল, 'আমিও কি জানতুম? আমাদের বাগানে দাদুব হাওয়াকলটা ছিল মনে আছে তোর?'

'হ্যাঁ। ইঁদারার মাথায় ছিল মনে পড়ছে।'

'গত বছর অক্টোবরে পুজোর পর অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল কারেণ্ট ছিল না। ভীষণ গুমোট। জানলার ধারে বসলুম। তখন দেখি হাওয়াকলের ওখানে টর্চ জ্বলল। জোৎস্না ছিল। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল কারা কী করছে ওখানে। ভাবলুম মাকে ডাকি। কিন্তু আবার টর্চ জ্বালতেই বাবাকে দেখতে পেলুম। একটু পরে ওরা চলে এল। ভাবলুম চোর-ডাকাত এসেছিল হয়তো—খুঁজে বেড়াচ্ছে সেবারকার মতো। তারপর সকালে উঠে দেখি, ইঁদারাটা বোজানো হচ্ছে।'...বিপাশা ক্লান্তভাবে চুপ করল।

শতদ্রু বলল, 'তার সঙ্গে অনির কী সম্পর্ক?'

'বিকেলে রোজকার মতো বেড়াতে বেরিয়েছি।' বিপাশা ফিসফিস করে বলতে থাকল। 'তখন বাগানে প্রচণ্ড ঘাস। বর্মী বাঁশের ঝোপটার পাশে ঘাসের ওপব খানিকটা রক্ত দেখতে পেলুম, জানিস ?'

শতদ্রু চমকে উঠল। 'বলিস কী !'

'জমাটবাঁধা রক্ত। কালো হয়ে গেছে। কিন্তু ওগুলো রক্ত।'

শতদ্রু শ্বাস ছেড়ে বলল, 'তুই কাকেও জিগ্যেস করলি নে ?'

'ভুলোদাকে জিগ্যেস করেছিলুম। বলল, মুসলমান মজুর এসেছিল ইঁদারা বোজাতে। তাবাই মুর্গি কেটে রান্নাবান্না করেছে।' বিপাশা আবার চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

শতদ্রু উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করল বিপাশার চোখের কোনায় জল জমেছে। সে বলল, 'কিন্তু তুই কি ভাবলি রঙ্গনার দাদাকে মার্ডার করে পুঁতে দিয়েছে ?'

মাথাটা দোলাল বিপাশা।

'অসম্ভব। ও তোর মিথ্যা সন্দেহ।'

'বাবা সব পারেন ! বাবার কাছে তো তুই কম থেকেছিস। আমি জানি বাবাকে।' বিপাশা ধরা গলায় বলল। 'অনি বাবাকে শাসিয়েছিল। একবার নাকি কোথায় বাবার জিপ লক্ষ্য করে বোম মেরেছিল।'

'হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হয় না।'

বিপাশা কাঁপা-কাঁপা হাতে রুমালটা তুলে চোখের কোনা মুছে শান্তভাবে বলল, 'কিছুদিন আগে—তুই তখন এখানে আছিস, আমি বাগানে বেড়াচ্ছি, ভুলোদা গেল। তখন হঠাৎ কথাটা মনে এল। আসলে আমার সন্দেহটা ছিলই। ভুলোদাকে চেপে ধরতেই সব বলে দিল।'

'কী বলল ?'

'অনি সন্ধ্যাবেলা পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকেছিল। বাহাদুরকে নাকি ড্যাগার মারতে গিয়েছিল। তখন বাহাদুর কুকরি ছুঁড়ে মারে। অনি মারা যায়। তখন...'

বিপাশা বিছানার ওপর পড়ে গেল হঠাৎ। হাত দুটো মুঠো করে দুপাশে ছুড়তে থাকল সে। শরীরটা বেঁকে গেল। পা দুটোও ছুড়তে থাকল। শতদ্রু ওকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, 'সিস্টার ! সিস্টার !' দুজন নার্স এল ঘরে। শতদ্রু-কে বাইরে যেতে অনুরোধ করল তারা।

একটু পরে ডাক্তার গোবিন্দ চৌধুরী শতদ্রুর পাশ কাটিয়ে ঢুকলেন। শতদ্রু দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল। ভেতরে বিপাশার চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, 'ছেড়ে দাও ! আমি অনির কাছে যাব—আমায় ছেড়ে দাও।'

আস্তে আস্তে বিপাশার কণ্ঠস্বর মিইয়ে যেতে থাকল। ডঃ চৌধুরী বেরিয়ে এসে চুপচাপ শতদ্রুর একটা হাত ধরে নিয়ে তাঁর চেম্বারে নিয়ে গেলেন। মুখোমুখি বসে একটু হাসলেন। 'এ ভেরি পিকিউলিয়ার কেস মিঃ সিনহা! তবে আমার কাছে নতুন কিছু নয়। মেলানকলিয়া এ্যাট দা ফার্স্ট স্টেজ, দেন ইট ডেভালপস ইনটু হিস্টিরিয়া। লাস্ট স্টেজে আসে এপিলেপ্টিক্যাল হিস্টিরিয়া। তবে সে-স্টেজে পৌঁছতে দেব না। আই ক্যান এ্যাসিওর ইউ ছ্যাট। আমার এই মেন্টাল ক্লিনিকের বয়স—স্তে, এ্যাবাউট থার্টি। তো কী কথার পর হঠাৎ ফ্ল্যাশ করল পেসেন্ট বলুন তো? আমার জানা দরকার।'

শতদ্রু সব বলল।

ডঃ চৌধুরী হাসতে লাগলেন। 'ব্যাপারটা সত্য হতেও পারে, আবার নিজেরই কল্পিত হতেও পারে। ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবশ্য আমিও একই ফ্যাক্ট জানতে পেরেছি। কাল রাতে তো গিয়ে দেখি, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কার সঙ্গে। মাইণ্ড ছ্যাট, জানলার নিচে কিন্তু কেউ নেই। এটাই এ কেসের বৈশিষ্ট্য। আপনাকে একটা বই দেখাচ্ছি, বুঝতে পারবেন হ্যালুসেনিসান কী ধরনে ডেভালাপ করে এসব কেসে।' সেলফ থেকে একট প্রকাণ্ড বই এগিয়ে দিলেন শতদ্রুর দিকে। একটুকরো কাগজে চিহ্ন দেওয়া পাতাটা খুলে বললেন, 'পড়ে দেখুন এই প্যাসেজটা।'

শতদ্রু বইটার টাইটেলপেজ দেখে নিল আগে। মার্লো পন্টির 'দা ফেনোমেনলজ অফ পারসেপশান।' সেই পাতায় এক মানসিক রোগীর কাহিনী রয়েছে। সে জানলার কাছে গিয়েই চিৎকার করে ওঠে, 'জানলার নিচে একটা লোক! জানলার নিচে লোক! জানালার নিচে একটা লোক!' সে সেই অদৃশ্য লোকটার পোশাকেরও চমৎকার বর্ণনা দেয়।

শতদ্রু বইটা ফেরত দিয়ে বলল, 'দা সেইম:কেস মনে হচ্ছে।'

'আপনার মামা বলছিলেন আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন নেক্সট্ উইকে?'

শতদ্রু মাথা দোলাল।

'শুনলুম এখনও তো লম্বা ছুটি। নাই বা গেলেন এ অবস্থায়!' ডঃ চৌধুরী একটু গম্ভীর হলেন। 'ফিটের সময় পেসেন্টকে আপনার কথা বলতে শুনেছি। সুস্থ অবস্থাতেও আপনার সম্পর্কে কত কথা বলে। আমার ধারণা হয়েছে, বাবা-মায়ের চেয়ে আপনাকে কাছের লোক মনে করেন মিস সিনহা।'

শতদ্রু তাকিয়ে রইল।

'এর একটা কারণ আই জাস্ট গেস। মিস সিনহার চারপাশে যাঁরা থাকেন, তাঁদের ওপর ওঁর ভীষণ অবিশ্বাস এবং কিছুটা সন্দেহও। ওঁকে নিয়ে যেন সবাই চক্রান্ত করছে। এক্ষেত্রে যেহেতু আপনি খানিকটা আউটসাইডার অথচ নিজের দাদা—পেসেন্ট আপনাকে বিশ্বাস করে। তাই আপনার থাকা খুব দরকার।'

শতদ্রু আস্তে বলল, 'ঠিক আছে। ক্যান্সেল করাচ্ছি জার্নি।'

ডঃ চৌধুরী খুশি হয়ে বললেন, 'আপনার বাবা এবং মামা ওদেরও বলেছি একটা কথা। মিস সিনহা মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলে ওঁকে যেন আর ওই বাড়িতে না নিয়ে যান। আপনার বাবা বললেন, তাঁরও সেই ইচ্ছে। ওখানকার বাড়ি-টাড়ি সম্পত্তি সব বেচে কলকাতায় চলে আসবেন ঠিক করেছেন।'

শতদ্রু বলল, 'হ্যাঁ। মামা বলছিলেন।'

একজন নার্স এসে বলল, 'পেসেন্টের জ্ঞান হয়েছে। দাদাকে ডাকছেন।'

ডঃ চৌধুরী বললেন, 'হ্যাঁ—যান মিঃ সিনহা। স্বচ্ছন্দে। একটু এ্যালার্ট থাকবেন—যেন ওসব কথা বেশি না বলেন পেসেন্ট। কেমন?'

শতদ্রু ঘাড় নেড়ে বিপাশার ঘরে এল। দেখল, বিপাশা ক্ষীণভাবে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। শতদ্রু পাশে বসে হাসতে হাসতে বলল, 'কী রে! খুব ভেল্কি লাগাচ্ছিস দেখছি।'

বিপাশা দুর্বলভাবে হাসল। 'ভেল্কি কিসের লাগালুম বল তো?'

শতদ্রু সতর্ক হয়ে বলল, 'নয়? আমায় কী মন্তর পড়ালি যে এখন ইচ্ছে করছে জার্নি ক্যান্সেল করি। অর্থাৎ যাচ্ছি না।'

বিপাশা খুশি হল। সেই রুমালটা নিয়ে আগের মতো খেলতে থাকল। একটু পরে কেমন চোখে তাকিয়ে বলল, 'অনি এসেছিল।'

শতদ্রু উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'কী বলছিস আবার? অন্য কথা বল তো শুনি।'

'অনি এসেছিল জানলার ওধারে। ডাকলুম, ভেতরে ঢুকল না।' বিপাশা যেন অনেক দূর থেকে বলতে থাকল। 'তোকে ডাকলুম সেজন্য। ওকে ডেকে নিয়ে আয় না দাদা।'

শতদ্রু বিব্রতভাবে জানলার ধারে গিয়ে খোঁজার ভংগি করে বলল, 'কেউ নেই। তোর ভুল বিশ্বাস।'

'আমি ভুল করি নি রে। অনি আমার সঙ্গে কথা বলল ওখানে দাঁড়িয়ে। আমিও বললুম।'

'স্বপ্ন দেখেছিস।'

বিপাশা সেই রুমাল ওর গায়ে ছুড়ে মেরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই মিথ্যুক। তুই চলে যা আমার সামনে থেকে। চলে যা বলছি!'

ডঃ চৌধুরী দ্রুত ঘরে ঢুকে বললেন, 'মিঃ সিনহা, আপনি এবার আসুন বরং।'

শতদ্রু চুপচাপ বেরিয়ে গেল। করিডোরে গিয়ে দেখল বাবা, মা আর মামাবাবু আসছেন।··

মথুরামোহনের ভিটে

সারাজীবন এক নিঃশব্দ মানুষ ছিলেন কুড়ানি ঠাকরুন। যেদিন রতুডাক্তার তাঁকে ইঞ্জেকশান দিয়ে যান এবং সন্ধ্যায় রঙ্গনা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় মাচানের তলায় ঢুকতে দেখে, সেদিনই মৃত্যু তার পিছু নিয়েছিল। তাড়া খেয়ে আক্রান্ত জন্তুর মতো তিনি নিজের আশ্রয়ে লুকোতে চাইছিলেন। বড় যত্নে ও মায়ায়-গড়া সেই উদ্ভিদ-জগত। রঙ্গনা যখন তাঁকে টেনে বের করে, তখন তিনি মৃত। নিঃশব্দ মানুষের নিঃশব্দ মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক ছিল। রঙ্গনার বুঝতে সময় লেগেছিল। অপরূপার সে-বেলা টিউশনি ফাঁকি দিয়ে হরেনের সঙ্গে সার্কাস দেখে ফিরতে একটু রাত হয়েছিল। অপরূপাও বুঝতে পারে নি। হরেনই নাড়ি দেখে বলেছিল, 'হয়ে গেছে।' দুই বোন বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হু হু করে কেঁদে উঠেছিল।

করালীর মন্দিরের পাশে নদীর ধারে শ্মশান। হরেন বাড়ির ছেলের মতো সবকিছু করল-টরল। মুখাগ্নি পর্যন্ত। শেষ রাতে শ্মশান থেকে ফিরে হরেন আর তার বন্ধুরা দুটি ভীত শোকার্ত মেয়েকে সাহস সান্ত্বনা দিতে কার্পণ্য করে নি। রঙ্গনা সারারাত খুব কেঁদেছিল। তার খালি এক কথা, 'রতুডাক্তারই মেরে ফেলল ঠাকুমাকে।' শুনলে রতিকান্ত ক্ষেপে যেতেন। কেউ কানে তোলেনি তাঁর।

তারপর থেকে হরেন এ বাড়ির গার্জেন হয়ে গেছে। যখন-তখন আসে। অপরূপার ঘরে ঢোকে। গল্প-সল্প করে। অপরূপার অস্বস্তি একটাই—অনি যদি হঠাৎ ফিরে আসে, কী হবে? আর রঙ্গনা মনে-মনে ফোঁসে হরেনের ব্যাপারে। আড়ালে দিদিকে মুখ ফুটে কিছু বললে ধমক খায়। অপরূপা বলে, 'তুই বড্ড অকৃতজ্ঞ আর স্বার্থপর রনি। ও এলে তোর কী? কোনো ব্যাপার তুই অনেস্টলি নিতে জানিস নে। সবতাতেই খারাপ ভাবিস।'

ছোট আকারে একটা শ্রাদ্ধ-শান্তি হরেনের উদ্যোগেই হল। আত্মীয়রা খবর পেয়ে কেউ আসেন নি। বহুদূরে থাকেন। কুড়ানি ঠাকরুনের পেটে গোঁজা থলেয় গোটা বত্রিশ টাকা আর খুচরো কিছু পাওয়া গিয়েছিল। অপরূপার টিউশনির বাবদ কিছু আর হরেনের তাগিদে কিছু জুটেছিল। এর পর বসন্তপুরের লোকে জেনেছে হরেন অপরূপাকে বিয়ে করবে। তার গার্জেন বলতে এক জ্যাঠা। বাবা-মা নেই ইহজগতে। জ্যাঠা দীনবন্ধু চাটুয্যের মাথায় বাজ পড়েছে! নিজে অক্ষম বুড়োমানুষ। গণ্ডাকতক পুষ্যি ঘরে। বুঝিয়ে বলেছেন, 'ওরে নির্বোধ! ওই গ্রাজুয়েট মেয়ে তোর সংসার করবে ভেবেছিস? ও তো তোকে ভড়কি দিচ্ছে। তার ওপর গউরের রামপাঠা—সেই অনি হারামজাদা এসে পড়লে কী হবে? ছুরি-চাকু খাবার ইচ্ছে না থাকলে মানে-মানে সরে আয় বাবা। লক্ষ্মী ছেলে, কথাটা শোন।'

হরেনের মাথায় প্রেম চড়ে আছে। তাছাড়া বি এ পাশ বউ পাওয়া তার পক্ষে ভাগ্যের কথা। নিজেও কি কোনোদিন আশা করেছিল, অপরূপার মতো মেয়ে দৈবাৎ তার কাছে এসে জুটবে? সাধুবাবুর টোপ ঝুলিয়ে একেবারে অপরূপার ঘরের দোরে পৌঁছেছিল। কুড়ানি ঠাকরুনও ভাগ্যিস মারা গেলেন। হরেন এবার ঘরে ঢুকে পড়েছে অপরূপার। এখন সারা বসন্তপুর তার লেজে দড়ি বেঁধে টানলে লেজ ছিঁড়ে যাক, হরেনকে ফেরত আনা যাবে না।...

রঞ্জনা একদিন বলল, 'দিদি, ঠাকুমার বাবার পক্ষের কেউ না কেউ বাঁকা-শ্রীরামপুরে আছে। তাদের তো মরার খবর দেওয়া হল না।'

অপরূপা বলল, 'চিঠি লেখা যেত—কিন্তু কারুর নাম তো জানা নেই।'

'চল না রে, আমরা যাই একদিন। দেখে আসি ঠাকুমার দেশ।'

অপরূপা একটু ভেবে বলল, 'ইচ্ছে করে দেখে আসতে, জানিস রনি? বিশেষ করে ঠাকুমার হিস্ট্রিটা জানার পর ভীষণ ইচ্ছে করছে আমারও। কিন্তু সে তো শুনেছি স্টেশনে থেকে অনেকটা হাঁটতে হবে। বাস টাস চলে না ওদিকের রাস্তায়। একেবারে সৃষ্টিছাড়া দেশ ঠাকুমাদের।'

রঞ্জনা ভেবে বলল, 'এই দিদি! হরেনদাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয়!'

অপরূপা মুখে আপত্তি করল। 'ধুর। ওকে আবার কেন?'

'ক্ষতি কী রে দিদি? হরেনদা সঙ্গে গেলে তো ভালই। বললেই রাজি হবে দেখবি।'

'তুই বুঝতে পারছিস না রনি, আমাদের ফ্যামিলির একটা স্ক্যাণ্ডাল আছে না এব্যাপারে? হরেন জেনে যাবে না?'

'জানলেই বা!' রঞ্জনা একটু হাসল।

'জানলেই বা মানে?'

রঞ্জনা চুপ করে গেল। তার ধারণা, অপরূপার সঙ্গে হরেনদার বিয়ে হবে। দুজনের মধ্যে প্রেম-ট্রেম যে চলছে, সে অনুমান করেছে অনেকদিন আগেই। ব্যাপারটা তার মনঃপূত হয় নি। কিন্তু অপরূপা যদি তা চায়, তার বারণ করার সাধ্য নেই এবং ইচ্ছাও নেই।

সে-রাতে অপরূপা টিউশনি থেকে ফিরে বলল, 'রনি। শোন্। হরেনের সঙ্গে কথা হল। ও কাল বিকেলে ফ্রি থাকবে। তিনটের ট্রেনে যাওয়া যায় বলল। ওর অফিসে নাকি এখন ভীষণ কাজের চাপ। তাই বিকেল ছাড়া হবে না।'

রঞ্জনা খুশি হল শুনে। পরদিন সকাল থেকে আর তার সময় কাটছিল না। বইয়ের পাতায় মন বসছিল না। দুটো নাগাদ হরেন সেজেগুজে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাজির হলে রঞ্জনা একমুখ হেসে বলল, 'আমরা এখন রেডি।'

হরেন বলল, 'কী মুশকিল! তুমিসুদ্ধু যাবে নাকি?'

রঞ্জনা হকচকিয়ে গেল। অপরূপা বলল, 'চলুক না। ওর ইচ্ছেই তো বেশি।'

হরেন উদ্বিগ্ন মুখে জোরে মাথা দুলিয়ে বলল, 'পাগল, না মাথাখারাপ! বাড়িতে থাকবে কে? বাড়িতে কেউ না থাকলে ফিরে এসে আর কিছু পাবে ভেবেছ? রোজ চুরি হচ্ছে বাড়ি-বাড়ি।'

অপরূপা হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের নেবেটা কী?'

'তুমি জানো না অপু!' হরেন গম্ভীর হয়ে বলল। 'কথায় বলে চোরের কপনিটুকুও লাভ। মাঠের ধারে বাড়ি। খাট-কপাট-চৌকাঠ সব খুবলে তুলে নিয়ে যাবে। ওই তো মড়িদার বাড়িতে সেবার কী হয়েছিল মনে নেই?'

ওপাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙা একতালা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। মড়িবাবু থাকতেন ধানবাদে। বাড়িতে তালা দেওয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে বাড়ির চৌকাঠ-জানলা-কপাট সব কারা নিয়ে গিয়েছিল। এখন ভূতের আড্ডা হয়ে পড়ে আছে। ছাদের কড়িকাঠগুলো-ঝুলে পড়েছে। নেহাত চাপাপড়ার ভয়ে সেগুলো খুলতে পারেনি চোরেরা।

অপরূপা বলল, 'হুঁ—তাই তো!'

হরেন ঘড়ি দেখে বলল, 'নাও। আর দেরি কোরো না। রনি থাক্। ছুতোর বউকে ডেকে নেবে রাত্রে—আর চিন্তা কিসের?'

অপরূপা বলল, 'আজই ফিরে আসা যাবে না ?'

'সেটা আনসার্টেন। বুঝলে না ? তোমাদের আত্মীয় স্বজন আছেন সেখানে। রাত্রে যদি না আসতে দেন ? তাছাড়া পায়ে-হাঁটা রাস্তা। অনেককিছু ভাববার আছে। দিনকাল তো আর সেরকম নেই।'

অপরূপা রঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আগে দেখে তো আসি। চেনা হয়ে গেলে তোকে নিয়ে যাব'খন। তুই পেনীর মাকে ডেকে নিস। সাবধান, একা থাকবিনে।'

রঞ্জনা চুপ করে থাকল। ওরা দুজনে বেরিয়ে গেলে সে দরজা আটকে দিল। তারপর খিড়কির ওদিকে গিয়ে পেনীকে ডাকাডাকি করতে থাকল।

সেই আদ্যিকালের কয়লাখেকো ইঞ্জিন এই লুপ লাইনে হাঁপকাশের রুগীর মতো কস্টেসিস্টে ডাউনট্রেনটাকে টানছিল। যে স্টেশনে থামছে, থেমেই থাকছে। অপরূপা ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। বক্তিপুরে নামল যখন, তখন সূর্য বিস্তীর্ণ মাঠের শেষে লাল একটা গোলা হয়ে গেছে। প্রায় জনহীন স্টেশন একটা চায়ের দোকান আছে প্ল্যাটফর্মের ওপর। চা খেতে খেতে লালচে আলোটা মরে গেল। অপরূপা শুকনো হেসে বলল, 'কোনদিকে যেতে হবে আমাদের ?'

হরেন আঙুল তুলে পশ্চিমের মাঠ দেখিয়ে বলল, 'ওই যে—ওদিকে।'

'কিন্তু রাস্তা কই ?'

হরেন সিগারেট জ্বেলে বলল, 'সেই তো বলছিলুম। এ তল্লাটের অবস্থা এরকমই। ওই যে দেখছ দীঘির পাড়ে কয়েকখানা কুঁড়ে ঘর—ওই বোধ করি কেঁচুয়া। দাঁড়াও, জিগ্যেস করে নিই। আমি কি কখনও এসেছি এদিকে ?'

চা-ওলাকে জিগ্যেস করলে বলল, 'বাঁকাছিরামপুর যাবেন ? কেঁচুয়া পর্যন্ত আলপথ। ওখানে কাঁচা রাস্তা পাবেন। আর ওই যে দেখছেন কালো মতন গাঁ—হ্যাঁ, ওইটা। নজর করে দেখুন, যেন ধনুক বাঁকা হয়ে বেঁকে আছে না ? তাই বাঁকা ছিরামপুর।'

হরেন বলল, 'কতক্ষণ লাগতে পারে দাদু ?'

চা-ওলা হাসল। 'তা আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে টাউনের লোক। পায়ে হাঁটা অব্যেস আছে ? আমাদের দুয়েক ঘণ্টা লাগে বৈকি ! একটা কাঁদর আছে। এখন অবিশ্যি জল নেই। একটু কাদা হতে পারে।'

অপরূপা কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'তাহলে থাক। আমরা পরের ট্রেনে ফিরে যাই।'

হরেন বলল, 'শুনেই ভড়কে গেলে ? আমি সঙ্গে আছি কেন ? আমার ওপর বিশ্বাস রাখোদিকি অপু।'

সে হনহন করে হাঁটতে থাকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরূপা যন্ত্রের মতো তাকে অনুসরণ করল। উঁচুতে রেললাইন। নিচের মাঠে সবুজ চৈতালি। আলপথে কিছুদূর হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল অপরূপা। হরেন হাসতে হাসতে পিছিয়ে এসে তাকে সঙ্গ দিচ্ছিল। কেঁচুয়ায় দীঘির পাশ দিয়ে একটা সংকীর্ণ রাস্তা পাওয়া গেল। গরুর গাড়ির চাকার দীর্ঘ আঁকা-বাঁকা দাগ গভীর হয়ে আছে। প্রচণ্ড ধুলো জমেছে। অপরূপার স্যাণ্ডেল আর শাড়ির নিচেটা ধুলোয় নোংরা হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে।

ফাঁকে মাঠে শেষ বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় অপরূপা খুব বিপদে পড়ে গেল। হরেন গুনগুন করে গান গাইছিল। নির্জন রাস্তায় সে এতক্ষণে অপরূপার কাঁধ বেড় দিয়ে বলল, 'চলো অপু। তোমায় কাঁধে বসিয়ে নিয়ে যাই।'

অপরূপা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কী অসভ্যতা করছ বলো তো। এমন জানলে আমি কখনো আসতুম না।'

'কী আশ্চর্য।' হরেন খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। একটুতেই এই। মাইরি, এজুকেটেড মেয়েদের সাইকলজি আমি বুঝতে পারিনে। হুইমিজিক্যাল!'

অপরূপা চুপচাপ হাঁটতে থাকল।

হরেন পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'এই অপু! ভাল কথা—তোমায় বলতেই ভুলে গেছি। আজই লোকাল কাগজে দেখলুম, ডিসট্রিক্টে প্রাইমারি টিচার নেওয়া হবে। বুঝলে?'

অপরূপা আস্তে বলল, 'কোন কাগজে বেরিয়েছে?'

'মুর্শিদাবাদ সমাচারে। আমি দেখেছি পাতাটা। আমাদের অফিসে আসে তো।'

'প্রাইমারি টিচার নেবে দেখলে?'

'হ্যাঁ' হরেন উৎসাহ দিয়ে বলল। 'সাধুদা ডিসট্রিক্ট স্কুল বোর্ডের মেম্বার জানো তো?'

'তাই বুঝি?'

'এ তোমার হওয়াই ধরো। চেয়েছে স্কুলফাইনাল। তুমি তো বি এ। এমনিতেই হয়ে যাবে।'

হাতের রেখা দেখা যাচ্ছিল না এবার। দুধারে ঢেউখেলানো শস্যশূন্য মাঠ। দূরে ইলেকট্রিক লাইনের উঁচু সব ফ্রেম এক দিগন্ত থেকে অন্যদিগন্তে চলে গেছে। আকাশে ভেসে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। অপরূপার মনটা চাপা আবেগে চঞ্চল হয়ে গেল। একটু পরে হরেন তার একটা হাত নিলে সে বাধা দিল না আর।

হরেন গুনগুন করে বেসুরো গলায় প্রেমের গান গাইতে থাকল। একবার তার হাত অপরূপার কাঁধে উঠলে অপরূপা আস্তে নামিয়ে দিল তখন হরেন অভিমান দেখিয়ে বলল, 'তুমি আমায় বড্ড পর ভাবো অপু! ঠিক আছে। আমার যা কর্তব্য করে যাই। আমি তো প্রতিদানের আশায় কিছু করি না। বরাবর এই স্বভাব আমার!'

অপরূপা বলল, 'উঃ! আর কতদূর বলো তো?'

হরেন ব্যাগ থেকে টর্চ বের বলল, 'কী অখদ্দে দেশ রে বাবা! রাস্তায় একটা লোকপর্যন্ত পেলুম না যে জিগ্যেস করি! ঠিক আছে, চলো তো।'

অন্ধকার হয়ে এসেছে। টর্চের আলোয় কাঁদরটা দেখে ভড়কে গেল অপরূপা। পাঁকে ভর্তি একটা অপ্রশস্ত নালায় নেমে গেছে রাস্তাটা। অসংখ্য চাকার দাগে বিচিত্তির একেবারে। সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'এ কী!'

হরেন হাসল। 'ভাবছ কেন? কাঁধে চাপো। তোমার পায়ে কাদা লাগলে আমার কষ্ট হবে। এস!'

হরেন সত্যি হেঁট হয়ে কাঁধ পাতছে দেখে অপরূপার হাসি পেল। 'যাঃ! কাঁধে চাপব কী! তুমি পা বাড়াও। আমি তোমায় ফলো করব।'

হরেন হঠাৎ দুহাতে ওকে শূন্যে তুলে নামিয়ে দিল। 'পারব না ভেবেছ তুলতে? তুমি কী এমন ভারি!'

অপরূপা খিলখিল করে হাসছিল। একটা অভিজ্ঞতা হল বটে ঠাকুমার দেশে এসে। সে কল্পনাও করে নি ঠাকুমা এমন দেশের মেয়ে। ইতিমধ্যে হরেন জুতো খুলে ব্যাগে ঢুকিয়েছে। সে বলল, 'তাহলে রেডি! ওয়ান টু থ্রি!' সে ফের অপরূপাকে শূন্যে তুলল।

কিন্তু এবার তার শরীরের আলতো আক্রমণ টের পাচ্ছিল অপরূপা। খালটা পেরিয়ে শুকনো জায়গায় নামিয়ে দিয়েই হরেন তাকে বুকে চেপে ধরল এবং চুমু খাবার চেষ্টা করল। অপরূপা কয়েক মুহূর্তের জন্য অবশ হয়ে পড়েছিল। আরো একদিন এমন করেছিল হরেন। তখন জোর বাধা দিয়েছিল আজ কতকটা অসহায় হয়ে আত্মসমর্পণ করল যেন। একসময় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আস্তে বলল, 'চলো!'

অন্ধকারে একটু দূরে আলো দেখা যাচ্ছিল। আলোটার কাছাকাছি গিয়ে বোঝা গেল একটা গ্রাম। রাস্তার ধারে একটা লোক লণ্ঠন হাতে তৈবকনে এসেছিল। সে এদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

হরেন জিগ্যেস করল, 'দাদু, এটা কি বাঁকাশ্রীরামপুর?'

'তাই বটে বাবুমশাই। আপনারা কোত্থেকে আসছেন ?'

'বসন্তপুর।' হরেন বলল। 'আচ্ছা দাদু, ঘোষেদের বাড়ি কোন দিকে পড়বে ?'

লোকটা হাসল। 'আজ্ঞে ঘোষ বলতে এক আমাদের এই পাড়াটা—গয়লাপাড়া। আর ঘোষ বলতে ধরুন বাবুপাড়ায় কায়েতরা। কার বাড়ি যাবেন বলুন ?'

অপরূপা বলল, 'মথুরা মোহন' ঘোষের কথা জিগ্যেস করে' না। চিনবে নিশ্চয়।'

লোকটা শুনতে পেয়ে বলল, 'সে-নামে তো কেউ নেই মশাই।'

অপরূপা বলল, 'জমিদারের কাছারিতে সেরেস্তাদার ছিলেন।'

'হ্যাঁ—কাছারি ছিল শুনেছি। সে তো এখন ইস্কুল হয়েছে।' লোকটা বলল। 'বরঞ্চ আপনারা সতুবাবুর বাড়ি যান। বাবুপাড়ায় ঢুকেই দেখবেন পেথম বাড়ি—দোতালা। ওনাদের কেউ হবেন তাহলে।'

হরেন বলল, 'তুমি একটু সঙ্গে চলো না দাদু!'

অন্ধকার ও ঠাণ্ডায় গ্রামটা ঝিম মেরে আছে। রাস্তায় ধুলো। প্রকাণ্ড বটতলায় মাচান রয়েছে। লোকজন নেই সেখানে। একটা দোতালা বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। লোকটা বলল, 'এই হল সতুবাবুর বাড়ি। চলে যান—আমার সঙ্গে ওনাদের বনিবনা নেই।'

সে চলে গেলে টর্চের আলোয় হরেন একটা টিউবেল দেখতে পেল। বলল, 'অপু! হেল্প করো দিকি একটু। আগে পা দুটো ধুয়ে নিই।'

অপরূপার ধারণা ছিল না এই সন্ধ্যায় ঠাকুমার গ্রাম এমন নিঃঝুম হয়ে যায়। হরেন পা ধুয়ে জুতো পরে বারান্দায় উঠল। অপরূপা নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের ভেতরে একদিকে একটা টেবিলের ওপর লণ্ঠন জ্বলছে। দুটি ছেলেমেয়ে মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। একজন হরেনের বয়সী যুবক রাশভারি ভংগিতে বসে অঙ্ক কষাচ্ছে। ওরা সবাই যেন এই অন্ধকার নিঃশব্দ গ্রামের অংশ হয়ে রয়েছে। হরেন একটু কাশলে তিনজনে তাকাল। যুবকটি বলল, 'কে ?'

হরেন বলল, 'বসন্তপুর থেকে আসছি। সতুবাবুকে চাই।'

যুবকটির ইশারায় ছেলেটি ভেতরে চলে গেল। একটু পরে বেঁটে নাদুস-নুদুস গড়নের টাক-মাথা প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পরনে লুঙি, গায়ে চাদর, ভেতর থেকে এসে হরেনকে দেখে অবাক হলেন। হরেন নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম হরেন চ্যাটার্জি। বসন্তপুর থেকে আসছি। আপনার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে।'

সতুবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন, 'বসন্তপুর থেকে, না থানা থেকে ?'

হরেন তক্ষুনি বুঝল, তাকে শাদা পোশাকের পুলিশ বা আই বির লোক ভেবেছে। সে হাসতে হাসতে বলল, 'না, না ! আমার সঙ্গে আরও একজন আছেন। অপু, এস।'

অপরূপার ভয় করছিল বলে বারান্দায় এসেছে ততক্ষণে। অপরূপাকে দেখে সতুবাবুর চোখ বড় হয়ে গেল। তারপর সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'আপনারা বসুন। বাবা মদন ওদের নিয়ে ভেতরে বসা গে।'

প্রাইভেট টিউটর ছাত্র-ছাত্রীসহ ভেতরে চলে গেল। হরেন ও অপরূপা বসল। সতুবাবু অন্য একটা চেয়ারে বসে বললেন, 'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে ! কী ব্যাপার বলুন।'

অপরূপা লক্ষ্য করছিল সতুবাবুর কথাবার্তায় ঠাকুমার কথার টান অবিকল। হরেন বলার আগে সে বলল, 'আচ্ছা, এখানে অনেক আগে মথুরামোহন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন। জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন নাকি। তিনি নিশ্চয় বেঁচে নেই। তাঁর কোনো রিলেটিভ কি আছেন কেউ ?'

ভাল করে শুনে সতুবাবু বললেন, 'মথুরমোহন ? মথুরামোহন···এক মিনিট। বাবা বলতে পারবেন। আপনারা বসুন—জিগ্যেস করে এসে বলছি।'

সতুবাবু চলে গেলে হরেন চাপা গলায় মুচকি হেসে বলল, 'যাক্ গে। রাত কাটানোর ভাল জায়গা পাওয়া গেছে। ওই রাস্তায় রাত্তির বেলা ফেরা অসম্ভব। কী বলো ?'

অপরূপা হাসল। 'দিলে তো থাকতে এরা ?'

'আলবাৎ দেবে। তোমায় অন্তত দেবে।'

'হুঁ। যার-তার বাড়ি থাকতে বয়ে গেছে আমার। ফিরে যাব।'

'পারো তো যেও।' হরেন আরামে বসে সিগারেট বের করল। ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'পয়সাওলা পার্টি মনে হচ্ছে। এ শীতের রাতের আরাম ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে বাবা।' সে হুশ হুশ করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকল। ফের বলল, 'এক কাপ চা দরকার। নিশ্চয় এসে যাবে। কী বলো ?'

অপরূপা ঘরের ভেতরটা দেখছিল। দেয়াল ধবধবে সাদা। কয়েকটা ক্যালেণ্ডার আর বাঁধানো ফোটো ঝুলছে। ওপাশে একটা তক্তাপোষের ওপর সতরঞ্জি বিছানা রয়েছে। তাকের থাকে-থাকে সাজানো পাঠ্যপুস্তক। কুলুঙ্গিতে একটা মাকালীর বাঁধানো ছবি—কিছু শুকনো ফুল। তক্তাপোষের মাথার দিকে দেয়ালে একটা ক্যারামবোর্ড দাঁড় করানো আছে।

সতুবাবু ফিরে এসে বললেন, 'একবার ভেতরে আসুন। বাবা বৃদ্ধ মানুষ। আর হাঁটাচলা করতে পারেন না।'

দরজার ওদিকে মেয়েদের ভিড় জমেছিল। সরে গেল ছত্রভঙ্গ হয়ে। অপরূপা টের পেল, খুব সাড়া পড়ে গেছে বাড়িতে। ভেতরে ঢুকে দেখল, মধ্যিখানে উঠোন—চারদিকে ঘর। নিচের একটা ঘরে ঢুকে সতুবাবু ডাকলেন, 'আসুন।'

ঘরে প্রকাণ্ড সেকেলে খাটে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। গায়ে আলোয়ান। একটা লোক দুটো চেয়ার রেখে গেল তক্ষুনি। ইশারায় বসতে বললেন বৃদ্ধ। সতুবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। বললেন, 'বাবা, এঁরাই বসন্তপুর থেকে এসেছেন!'

বৃদ্ধ ফোকলা মুখে বললেন, 'কী নাম বললে? মথুরামোহন? ও! আমাদের সেই মথুরা? আমরা বলতুম মোথুকাকা। বড় সাদাসিদে লোক ছিল। ওই তো লেবুতলায় ভিটে।'

অপরূপা বলল, 'ওনার কেউ আছেন গ্রামে—কোনো আত্মীয়?'

বৃদ্ধ কানে কম শোনেন। সতুবাবু প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিলে বললেন, 'কে থাকবে? কেউ নেই। ওই তো ভিটে পড়ে আছে। মোথুকাকার শেষ বয়সে মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল। অ সতু, সেই যে রে—মনে পড়ে না? তোরা সব ছেলেপুলেরা বড্ড পেছনে লাগতিস!'

সতুবাবু বললেন, 'তাই বলো! মোথা ক্ষ্যাপা বলতুম—একটু একটু মনে পড়ছে যেন। হ্যাঁ—সবসময় চেঁচিয়ে বেড়াতেন—ডাকাত! ডাকাত।'

এক বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে অপরূপাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'মোথো পাগলার কথা এতকাল বাদে কেন গো? সে কি আজকের কথা? তখন সতু এতটুকুন ছেলে। পাঁচ-ছ বছর বয়স হবে।'

সতুবাবু হিসেব করে বললেন, 'তাহলে ধরো বছর পঞ্চাশ আগের কথা। আমি এখন ফিফটি সিক্স।'

বৃদ্ধা বললেন, 'ওইরকমই হবে। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে।'

অপরূপা জিগ্যেস করল, 'ইনি কে?'

সতুবাবু বললেন, 'আমার দিদি।'

সতুবাবুর বাবা একটা ভংগি করে বললেন, 'খালি ডাকাত ডাকাত বলে চেঁচাত। কী যেন একটা হয়েছিল, আর মনে নেই। বেশ বসে আছে চুপচাপ। হঠাৎ···ওই ডাকাত! ডাকাত!'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। মোথোপাগলার নাকি একটা মেয়ে ছিল।'

কথা কেড়ে অপরূপা বলল, 'তার একটা পা খোঁড়া ছিল জন্ম থেকে।'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা জানিনে বাপু। অত মনে নেই। তা এতকাল পরে কেন সেকথা? তোমরাই বা তার খোঁজে এলে কেন—এটুকুন বুঝিয়ে বলোদিকিনি?'

হরেন বলল, 'এই ভদ্রমহিলার ঠাকুমা ছিলেন মথুরাবাবুর মেয়ে। মানে—যে-মেয়ের কথা হচ্ছে।'

সতুবাবু তার বাবাকে কথাটা বুঝিয়ে দিলে বৃদ্ধ ক্যাল-ক্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অপরূপার দিকে। অপরূপা বলল, 'আমরা কিছু জানতুম না। ঠাকুমা সেদিন মারা গেলেন। তাই ভাবলুম···'

বৃদ্ধা বললেন, 'কিছু বুঝলুম না বাপু!'

হরেন একটু হেসে বলল, 'বোঝার কী আছে পিসিমা? ঠাকুমার বাবার ভিটে দেখতে সাধ হয় কি না বলুন নাতনিদের? তাই এসেছে আর কী।'

বৃদ্ধা বললেন, 'তা এতকাল বাদে?'

অপরূপা বলল, 'আমরা তত কিছু জানতুম না। কিছুদিন আগে জেনেছি সব কথা। ঠাকুমা বরাবর অবশ্য বাঁকাশ্রীরামপুরের নাম করতেন, আসতেও চাইতেন। খোঁড়া মানুষ—আসার অসুবিধে ছিল। উনি মারা গেলে ভাবলুম, ভিটেটুকু অন্তত দেখে আসি।'

অপরূপার গলা ধরে এসেছিল। সে ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে থাকল। তখন হরেন বলল, 'মজাটা লক্ষ্য করেছেন তো? নাতনি কিন্তু কুলীন মুখুয্যে—ঠাকুমা আপনাদের কায়েত।' সে খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল।

সতুবাবু বললেন, 'মথুরাবাবুর মেয়ের বুঝি মুখুয্যে ঘরে বিয়ে হয়েছিল? সে-আমলে অসবর্ণ! বলেন কী!'

অপরূপা সতর্কভাবে বলল, 'এখন একবার ওনাদের ভিটেটা দেখা যায়?'

হরেন বলল, 'রাতে কী দেখবে? সকাল হোক। এখন তো বক্সিপুর স্টেশনে ফেরা যাবে না। ফিরতে চাইলেই বা এ ভদ্রলোকেরা দেবেন কেন?'

সতুবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, 'না না—এই শীতের রাতে ছাড়ব কেন? একটা সম্পর্ক ধরে যখন এসেই পড়েছেন।'

সতুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা বললেন, 'হ্যাঁ গো বাছা, তোমার নামটাই বা কী, আর এই ছেলেটারই বা কী নাম?' নাম শুনে নিয়ে ফের বললেন, 'তা ও মেয়ে, এটি তোমার সম্পর্কে কে বটে? আপন কেউ না হলেই বা আসবে কেন সঙ্গে?'

হরেন ঝটপট বলল, 'অপু আমার মামাতো বোন।' অপরূপার অস্বস্তি কেটে গেল।

বৃদ্ধ তাকিয়ে ছিলেন তেমনিভাবে। বললেন, 'সন্নু! ও সন্নু!'

বৃদ্ধা কাছে গিয়ে বললেন, 'কিছু বলছ বাবা?'

হরেন অপরূপার দিকে চোখ নাচাল। অর্থাৎ এই বুড়ির বাবা ওই বুড়ো—দেখছ তো মজাটা!

বৃদ্ধ বললেন, 'মোথুকাকার একটা খোঁড়া মেয়ে ছিল। তুই তাকে দেখিস নি, সন্নু। তখন তুই কোথা, সতুই বা কোথা? আমার তখন বিয়েই হয় নি।'

বৃদ্ধা তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, 'এই মেয়েটা তার নাতনি।'

বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হাসলেন। 'মোথুকাকার মেয়ের নাতনি? ভাল, ভাল। কোথা বিয়ে দিয়েছিল মনে নেই।'

অপরূপা সাবধানে বলল, 'বসন্তপুরে।'

বৃদ্ধা তাঁর বাবার কানে কথাটা পাচার করে বললেন, 'বামুনের ঘরে বে হয়েছিল—বুঝলে?'

বৃদ্ধ ফের হেসে বললেন, 'আমরা শুনি নি। হয়তো শুনে থাকব, মনে নেই।'

অপরূপা বুঝতে পারছিল, মথুরামোহন খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে করালীর থানে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তার ঠাকুর্দা কালু মুখুয্যে সেই মেয়েকে লুঠ করে আনেন—এসব ঘটনা এঁরা জানেন না। কেন জানেন না? মথুরামোহন নিশ্চয় কাকেও কিছু বলেন নি। হয়তো সে-আমলের সমাজটা ছিল খুব কড়া। তাঁকে মেয়ে লুট হওয়ার জন্য জাতিচ্যুত বলে একঘরে করা হত। কিংবা আরও সামাজিক শাস্তির আশংকা ছিল। তাই চেপে গিয়েছিলেন। তারপর একসময় পাগল হয়ে যান।

কিন্তু ঠাকুর্দারই বা কী আক্কেল। পরে যোগাযোগ করলেও তো পারতেন শ্বশুর বেচারার সঙ্গে। অপরূপার মা বলতেন, 'শ্বশুর মশাইকে শেষ বয়সে দেখেছি। নেশাভাঙ করতেন বড্ড। কোথায় ডাকাতি করতে গিয়ে পেটে গুলি লাগে। ওতেই মারা যান। লোকটা এমনিতে বেশ নরম মনের মানুষ ছিলেন। অথচ ওই দুর্দান্ত স্বভাব।'

তবু ঠাকুর্দাকে অপরূপার ভালই লেগেছে শেষ পর্যন্ত। একটা খোঁড়া মেয়েকে লুট করে আনুক আর যাই করুক, তাকে বউ করে সারাজীবন আশ্রয় তো দিয়েছিলেন। তখনকার দিনে গ্রামের কুলীন বামুন। ওই বিকলাঙ্গ বউ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন—আর বিয়ের নাম করেন নি। এটা নিশ্চয় ঠাকুর্দার মহৎ মনের

পরিচয়। শুধু অবাক লাগে ভাবতে, ওই মেয়েটার মধ্যে কী খুঁজে পেয়েছিলেন কালীনাথ মুখুয্যের মতো সাংঘাতিক মানুষ? ঠাকুমা যৌবনে দেখতে নিশ্চয় সুন্দরী ছিলেন—আর গায়ের রঙটাও ফর্সা ছিল। কিন্তু তাও হয়তো নয়—মমতা। ঠাকুমার মতো মমতাময়ী মেয়ে কটাই বা দেখা যায়? বাড়িটাকে কীভাবে দুহাতে আগলে রেখেছিলেন, সাজিয়ে তুলেছিলেন ভালবাসায়, ভাবা যায় না!

ঠাকুমার মৃত্যুর পর রঞ্জনার সঙ্গে অপরূপা এসব নিয়ে কত আলোচনা করেছে। রঞ্জনার দৃষ্টিটা একটু অন্যরকম। সে বলেছে, 'একটা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়লে একটা খোঁড়া মেয়ে কী করতে পারে বল্ দিদি? ঠাকুমা বলছিল তখন মোটে তের-চৌদ্দ বয়স। ঠাকুর্দার তখন তার ডবল বয়স নিশ্চয়। ঠাকুমার জন্য আমার কষ্ট হয় রে!'

অপরূপা তা মানে না। দুজনে পরস্পরের মধ্যে একটা কিছু দেখেছিল—কোনো আশ্রয়, কোনো শান্তি—কিংবা বড় কিছু। এতো আর রাবণের সীতাহরণ নয়!

'হ্যা গো মেয়ে!' বৃদ্ধা ডাকছিলেন। 'কী নাম ছিল তোমার ঠাকুমার?'

অপরূপা বলল, 'কনকলতা।'

বৃদ্ধা তাঁর বাবার কানে নামটা পাচার করলেন। তখন বৃদ্ধ সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ। কনক। বাড়িতে শশা লাগাত। ফুলের গাছ লাগাত। মনে পড়ছে বটে। একটা কঞ্চি হাতে লেবুগাছের ছায়ায় বসে থাকত। আমরা ছেলেপুলেরা ওকে জ্বালাতন করতুম। হাঁটতে পারত না কি না? তাই শশার মাচানের তলায় চুপিচুপি ঢুকে যেতুম। টের পেলে সে কী চেঁচানি।'

বুড়ো বয়স পর্যন্ত তাহলে তাই করে গেলেন ঠাকুমা। অপরূপা ভাবল। আসলে বাইরের পৃথিবীতে যার পা বাড়ানোর উপায় নেই, বাড়ির ভেতর সে একটা পৃথিবী গড়ে নিয়েছিল। গাছপালা ফুলফলের পৃথিবী। সেখানে সে সম্রাজ্ঞীর মতো কঞ্চি হাতে শাসন করত!

বৃদ্ধ হঠাৎ নড়ে উঠলেন।··· 'সন্ন। সন্ন রে!'

'বলো বাবা!'

'অই মনে পড়েছে। মোথুকাকা তার মেয়েকে কোথায় কোন সাধুর আশ্রমে রেখে এসেছিল!'

'তাহলে তার নাতনি এল কোত্থেকে?' বলে বৃদ্ধা ঠোঁটে বাঁকা হেসে অপরূপার দিকে তাকালেন।

বৃদ্ধ বললেন, 'খোঁড়া মেয়ের বে হবে না। তাতে সবসময় পিছুটান—বাড়িতে আর তো কেউ ছিল না। জমিদারি সেরেস্তার কম্ম পণ্ড হয়। তাই মোথুকাকা মেয়েকে সাধুর আশ্রমে রেখে এলেন।'

বৃদ্ধা কড়া মুখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন 'না, না।'

'কেন রে সন্ন ?'

এই মেয়েটা বলছে তার নাতনি। বসন্তপুরে মুখুয্যে ঘরে বে হয়েছিল বলছে।'

'মোথুকাকার মেয়ের ?'

'হ্যাঁ। তাই বলছে।'

বৃদ্ধ হঠাৎ খুব রেগে গেলেন। বললেন, 'মিথ্যে কথা।'

অপরূপা বিব্রত হয়ে বলল, 'বিশ্বাস করুন। আমি কনকলতার নাতনি।'

হরেন ব্যাপার দেখে হা হা করে হেসে বলল, 'বুড়ো মানুষ। স্মৃতিভ্রংশ হতেই পারে।'

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ মুখে বললেন, 'দেখ বাপু, ভাবগতিক আমার ভাল ঠেকছে না। আজকাল দিনকাল খারাপ। কে কোন দলে রেতের বেলা গেরস্থর বাড়ি আসে। একে তো সতু নানা ফৌজদারি মামলায় ফেঁসে রয়েছে। তোমরা বাইরের ঘরে গিয়ে বসো দিকিনি। পরে কথা হচ্ছে।'

হরেন ও অপরূপা মুখ তাকাতাকি করল। অপরূপা লজ্জায় অপমানে লাল হয়ে উঠেছে। দুজনে বেরিয়ে বারান্দা হয়ে সেই বাইরের ঘরে গেল। ঘরটা ভেতর থেকে বন্ধ এবং অন্ধকার। পেছন-পেছন হেরিকেন হাতে সতুবাবু এলেন। এখন তাঁর মুখেও সন্দেহের ছায়া দেখা যাচ্ছে।

সতুবাবু আমতা হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনারা টাউনের লোক—আমাদের পাড়াগায়ে আজকাল বড্ড অশান্তি। এই তো ক'বছর আগে নকশালপন্থীদের নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়ে গেল। গতবছরও একটু গণ্ডগোল বাধিয়েছিল ওরা। এই যেমন আপনারা এলেন, তেমনিভাবে ওরা আসত। মেয়েছেলেও থাকত সঙ্গে। তারপর হঠাৎ…'

কথা কেড়ে হরেন হাসতে হাসতে বলল, 'তারপর হঠাৎ পিস্তল বের করে গুড়ুম! দাদা, আমার নাম হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি। বসন্তপুরে সাধুবাবুর ট্রান্সপোর্টে সারভিস করি। বেশি কী আর বলব আপনাকে!'

অপরূপা গম্ভীরভাবে বলল, 'থাক্ ওসব কথা। আপনি দয়া করে একবার মথুরাবাবুর ভিটেটা দেখিয়ে দেবেন? আমরা দেখেই চলে যাব।'

সতুবাবু বললেন, 'তা কি হয়? ভদ্রলোকের বাড়ি। একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। তবে এখনই যদি দেখতে চান, আপত্তি নেই।' বলে তিনি ভেতরের দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'বদনা! ও বদন!'

একটা গুঁফো বলিষ্ঠ আকৃতির লোক এল। গায়ে তুলোর কম্বল জড়ানো। সতুবাবু বললেন, 'এনাদের মোথো পাগলার ভিটেটা দেখিয়ে আন।'

হেরিকেন নিয়ে বদন বলল, 'আসুন।' অপরূপা ও হরেন তাকে অনুসরণ করল। অপরূপার মন রাগে গরগর করছিল। মথুরাবাবুকে মোথোপাগলা বলছে এখনও! এদের কোনো ভদ্রতাবোধও নেই। এদের বাড়ি রাত কাটানো কি সম্ভব?

লোকটা সারবন্দী মাটির বাড়ির পাশ দিয়ে পুকুরপাড়, আগাছার বন ভেঙে একটা মোটামুটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বলল, 'এই হল গে মোথোপাগলার ভিটে।'

আলোটা খুব কম। চারপাশে যেটুকু ছড়িয়েছে, তাতে শুধু ঘুটিঙ-কাঁকরে ভরা শক্ত খানিকটা নগ্ন মাটি চোখে পড়ছে। তার বাইরে অন্ধকার। অপরূপা লোকটার হাত থেকে হেরিকেন নিয়ে বলল, 'ঘর কোথায় ছিল?'

বদন নির্বিকার মুখে বলল, 'তা কেমন করে জানব বলুন? ওই উঁচু জায়গাটায় হবে।'

অপরূপা ঘুরে ঘুরে দেখে কিছু বুঝতে পারল না। নিমবন চারপাশে। কয়েকটা ঝাঁকড়া লেবুগাছও রয়েছে। এগুলো কি কনকলতার হাতের গাছ? এখনও বেঁচে আছে? কে জানে। বদন সাবধান করে দিল, 'কাঁটায় আটকে যাবেন গো। বড্ড কাঁটা।'

পটাপট কয়েকটা লেবু ছিঁড়ল অপরূপা। আর সেইসময় তার মনে হল কনকলতা চেঁচিয়ে উঠেছে, 'অই! অই!' চমক ভাঙলে টের পেল, বদন নিষেধ করছে। রাতবিরেতে গাছের ফল ছিঁড়তে নেই। লেবুগুলো হাতে নিয়ে সে ঝুঁকে একটু ধুলো-মাটি তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকাল। মনে মনে বলল, 'ঠাকুমা! বড় দেরি হয়ে গেল। তোমায় ফিরিয়ে আনতে পারিনি—ক্ষমা কোরো।'

হরেন মৃদু স্বরে বলল, 'ছি অপু! কাঁদে না। চলে এস। দিনসবরে আবার আসা যাবে। বঙ্গনাকে নিয়ে আসব। আর আইনত এ জায়গা তো তোমাদেরই।' সে টর্চ জেলে চারদিকটা দেখতে থাকল।

পেছন থেকে বদন হাসতে হাসতে বলল, 'জায়গা জায়গা হয়েই আছে—তাই থাকবে। এখন খাস সম্পত্তি। যদি উদ্ধার কত্তে পারেন, তবু কাজ হবে না। কেউ কিনবে না।'

হরেন বলল, 'কেন ?'

'দু-তিনপুরুষ ধরে শুনে আসছি, এ ভিটের দোষ আছে। দোষ-লাগা ভিটে ন হলে কি এ্যাদ্দিন এমন পড়ে থাকত ভাবছেন ? কেউ-না-কেউ দখল করে রাখত।'

'দোষ মানে ?'

'তা জানি নে মশাই!' বদন হাসল। 'শুনেছি কোনপুরুষে কী দোষ ঘটেছিল।'

এইসময় টর্চের আলো ফেলে সতুবাবু এসে গেলেন। 'দেখলেন ?'

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ।'

সতুবাবু টর্চের আলো চারদিকে ফেলে ভালভাবে দেখিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মোটে কাঠা পাচেক জায়গা। এখানে গাঁয়ের শেষ। আর ওদিকটায় কিছুটা গেলে পুরনো আমলের জমিদারি কাছারি পাবেন। এখন প্রাইমারি স্কুল হয়েছে।'

অপরূপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে হরেন তাড়া দিল, 'আর কী! চলে এস অপু।'

সতুবাবুর বাড়ির সামনে গিয়ে অপরূপা বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ সতুবাবু! আমরা তাহলে চলি।'

হরেন অবাক হল। সতুবাবু কাঁচুমাচু হেসে বললেন, 'না—না। সে কী কথা! আমরা কি আপনাদের সত্যি সত্যি সন্দেহ করেছি? ও একটা কথার কথা। তাছাড়া এই শীতের রাতে পাক্কা তিন মাইল রাস্তা হাঁটা কি সম্ভব ? ফেরার ট্রেনও সেই রাত তিনটের আগে নয়।'

অপরূপা গোঁ ধরে বলল, 'না—আমাদের রাতেই ফিরতে হবে। এস হরেনদা!'

সতুবাবু বললেন, 'আহা! সব ব্যবস্থ হয়ে গেছে। অকল্যাণ করবেন না মা! আমরা সামান্য গৃহস্থ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।'

হরেন বলল, 'ঠিক আছে। বলছেন যখন অত করে।'

অপরূপা শক্ত মুখে বলল, 'না। তুমি এস।'

'মারা পড়বে যে! তোমার মাথা খারাপ ?' হরেন হাসতে লাগল।

বাইরের ঘরের বারান্দায় সতুবাবুর সেই দিদি এবং আরও কয়েকটি মেয়ে ভিড় করে দাড়িয়ে গেল। সতুবাবুর দিদি বললেন, 'মেয়ের দেখছি বেজায় দেমাক! অত যদি ইয়ে তো দিনসবরে এলেই পারত বাপু! এ রেতের বেলা ভদ্রলোকের বাড়ি ঝঞ্ঝাট বাধাতে কেন আসা ?'

সতুবাবু ধমক দিলেন, 'তুমি ভেতরে যাও তো দিদি। সব-তাতে তোমার থাকা চাই। মানুষের মানমর্যাদা বোঝ না।'

বৃদ্ধা দুপদাপ পা ফেলে ভিড় ঠেলে চলে গেলেন ভেতরে। বারান্দায় ভিড় থেকে অপরূপার বয়সী এক যুবতী, সিঁথিতে সিঁদুর এবং হাতে শাঁখা নোয়ার সঙ্গে সোনার কাঁকন—এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আসুন তো ভাই! পিসিমার কথায় কান দেবেন না। ওইরকম মানুষ বরাবর। আসুন আপনি

সতুবাবু বললেন, 'আমার বড় মেয়ে। কাটোয়ায় শ্বা ওর সঙ্গে ভেতরে যান।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপরূপা বারান্দায় উঠল। সতুবাবুর মেয়ে তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল। হরেন সতুবাবুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে বলল, 'দাদা! এক কাপ কড়া করে চা পেলে জমত। বড্ড শীত আপনাদের গ্রামে।'

সতুবাবু হেসে বললেন, 'সব ব্যবস্থা হয়েছে। ভাববেন না।'

'না।'···হরেন হাসল।

অপরূপার নতুন স্বপ্ন

রঞ্জনার ভাল ঘুম হয়নি রাতে। পেনি আর তার মাকে শুতে দিয়েছিল মেঝেয়, রঞ্জনা ছিল অপরূপার খাটে। ওদের ঘরে ঢুকিয়েছে এবং শুতে দিয়েছে জানলে অপরূপা কী বলবে, সেই ভয়টাও কম ছিল না রঞ্জনার। ভোরবেলা ওদের জাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর বেলাঅব্দি অপরূপার প্রতীক্ষায় বারবার দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেছে। সে তখনও ঘর-বার করছে। অবশেষে একসময় রিকশো থেকে অপরূপা নেমেই দৌড়ে এসে বোনকে জড়িয়ে ধরল। রঞ্জনা দমআটকানো গলায় বলল, 'দেখে এলি দিদি? দেখতে পেলি ঠাকুমার ভিটে? কে কে সব আছে রে? তাদের সঙ্গে দেখা হল? কী বলল?'

উঠোনে গিয়ে রঞ্জনাকে ছেড়ে অপরূপা বলল, 'সব বলছি। কী সুন্দর গ্রামটা রে রনি! ঠাকুমার বাবার ভিটেয় কত লেবু গাছ! নিশ্চয় ঠাকুমা ছোটবেলায় পুঁতেছিল গাছগুলো। এই নে, লেবু এনেছি সেই গাছের।'

সে ব্যাগ খুলে কয়েকটা লেবু বের করল। রঞ্জনা সেগুলো দুহাতে নিয়ে

বুকে গালে ঘসে আদর করতে থাকল। 'ইস! কী সুন্দর গন্ধ রে দিদি! ঠাকুমার গায়ের গন্ধ। অবিকল! আমায় কবে নিয়ে যাবি রে?'

অপরূপা বলল, 'শিগগির যাব। তুইও দেখে আসবি। আর জানিস? অনেক সুখবর আছে। বলছি দাঁড়া।'

সে ইঁদারাতলায় গেল। জল তুলে হাত মুখ পা রগড়ে ধুল। তারপর বারান্দায় গিয়ে তোয়ালেতে মুছতে মুছতে বলল, 'ওখানে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে রাতে ছিলুম। খুব আদর যত্ন করল। প্রথমে একটু মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়েছিল, জানিস? আমাদের নকশাল ভেবেছিল!'

রঙ্গনা খিল খিল করে হেসে উঠল। 'বলিস কী! তারপর?'

অপরূপা ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে গেল। রঙ্গনাও ঢুকল পেছনে-পেছনে। কাপড় বদলাতে-বদলাতে মোটামুটি একটা বিবরণ দিল অপরূপা। রঙ্গনা বলল, 'এ্যাডভেঞ্চার বল্! থ্রিলিং রে! তাই না?'

অপরূপা পরনের শাড়িটা পায়ে ঠেলে মেঝের একপাশে রেখে বলল, 'সতুবাবুদের বাড়িতে আমার খুব খাতির হয়ে গেছে। সেই বুড়ি ভদ্রমহিলা পর্যন্ত আসার সময় কত আদর করল জানিস? বামুনের মেয়ে বলে প্রণামের ঘটা যদি দেখতিস! তারপর আসল ব্যাপারটা বলি শোন্। ওদের ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। সেটা ওরা ক্ল্যাস এইট অব্দি আপাতত করতে চেষ্টা করছে। মেয়েদের এডুকেশনের অসুবিধা হচ্ছে তো—প্রাইমারি পাস করে ছেলেরা দূরের গ্রামে কোনো হাইস্কুলে যায়। হোস্টেল পায় সেখানে। মেয়েদের বেলায় তো প্রব্লেম।

'তোকে মাস্টারি দেবে বলল বুঝি?'

'বলল মানে? সাধল বল্।' অপরূপা উজ্জ্বল মুখে বলল। 'সতুবাবু বলল, আমরা আপনাদের কুটুম্ব হয়ে গেলুম গ্রামসম্পর্কে। সতুবাবুই স্কুলের সেক্রেটারি। বলল, কোনো অসুবিধে হবে না। বাড়িতে আলাদা ঘর দেব। আমার ছেলে-মেয়েদের পড়াবেন। স্কুলে ফাইভ এবছরই চালু হয়েছে। ছাত্র হয়েছে। এখনই বাড়তি টিচিং স্টাফ দরকার। আমি জয়েন করলেই হল।'

'মাইনে দেবে তো? নাকি বিনি মাইনেতে?'

'ধ্যাঃ! তা কেন? গ্রামের লোকে আপাতত চাঁদা তুলে স্কুলফাণ্ড করেছে। স্যাংশান হলে তখন বোর্ড থেকে গ্রান্ট দেবে। ব্যস! আর ভাবনা কী?' বলে অপরূপা কপালে ও বুকে হাত ঠেকাল। আস্তে বলল, 'সবই যেন ঠাকুমার ইচ্ছেয় হচ্ছে রে রনি!'

রঞ্জনা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তুই ওখানে থাকলে আমি এখানে একা কীভাবে থাকব ?'

অপরূপা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোর কথা বলিনি বুঝি ? তোকেও তো চায় ওরা। তোর ইংরিজি পড়ানোর প্রশংসা করেছি।'

'সত্যি বলছিস ?'

'তোর গা ছুঁয়ে বলছি।' অপরূপা শান্তভাবে তার চিরাচরিত স্বপ্ন দেখার সমঝদার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল। 'সতুবাবু একা নাকি ? বললুম না—আমাকে দেখতে কত লোক জুটেছিল সকালে। আমার ধারণা, বি এ পাশ করা মেয়ে ঠাকুমার গাঁয়ে এই প্রথম দেখল ওরা।'

রঞ্জনা চিন্তিতভাবে বলল, 'আমরা চলে গেলে বাড়ির কী হবে ?'

'দাদা যখন আসবে, তখন থাকবে তার বাড়িতে।' অপরূপা গার্জেনের ভংগিতে বলল। 'মেয়েরা কি বাবার বাড়ি চিরকাল থাকে ? দাদা ফিরে এসে থাকবে।'

দাদার কী হল বল্ তো !' রঞ্জনা ধরা গলায় বলল। 'বোম্বেতে থাকলেও তো চিঠি অন্তত লিখত।'

অপরূপার মাথায় অন্য ভাবনা। বলল, 'শিগগির—ধর্, পরশু-তরশু তোতে-আমাতে যাই। কেমন ? গিয়ে কবে একেবারে যাব, তাও ঠিক করে আসি। জিনিসপত্র কা আর নেব ? সবই থাকবে। ছুতোর বউকে থাকতে বলে যাব।'

রঞ্জনা বলল, 'ঠাকুমার গাছপালাগুলো ?'

'ছুতোব বউ ভোগ করবে যখন, তখন সেই জলটল দেবে-টেবে। ওটা প্রব্লেম নয়।'

হঠাৎ রঞ্জনা একটু হাসল। 'দিদি ! হরেনদার কী হবে ?'

অপরূপা চোখ কটমটিয়ে তাকাল। 'কী হবে মানে ? কে ওর ধার ধারে ? নেহাত একটা চাকরির জন্য একটু আস্কারা দিতুম—সতুবাবুর লোক বলে। নৈলে ওইসব আজেবাজে আনএডুকেটেড লোককে আমি পাত্তা দিতুম ভাবছিল ? পথে আসতে-আসতে ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আমার। ইস্ ! আমি কী করব, না-করব, তা ঠিক করবে ও ?'

রঞ্জনার মনে হল, দিদি তাকেই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর বলে, অথচ সে নিজে কী ? হরেনদা এতদিন বাড়ির লোক হয়ে কত দেখাশোনা করল। রঞ্জনা মুখে কিছু বলল না।

অপরূপা বলল, 'এ্যাদ্দিন তোকে বলিনি—আজ বলছি শোন। হরেনদা

লোকটা মোটেও ভাল না। অনিচ্ছায় বাধ্য হয়ে মিশেছি। আছাড়া বড্ড গায়েপড়া তো—এড়ানো যায় না। বস্তিপুর স্টেশন থেকে বাঁকাশ্রীরামপুর যাবার পথে খানিকটা অন্ধকার হয়েছিল।' অপরূপা ফিসফিস করে বলল। 'তখন জানিস—আমার সঙ্গে অসভ্যতা করতে এসেছিল। আমায় তো চেনে না! জড়িয়ে ধরে কিস করতে আসছিল—এত ওর সাহস!'

রঞ্জনা মনে মনে হেসে মুখে রাগ দেখিয়ে বলল, 'থাপ্পড় দিসনি কেন?' বলে হাসিটা চাপতে পারল না। পরক্ষণে ফিক করে হেসে ফেলল। 'তুই নিশ্চয় ইনডালজেন্স দিয়েছিস্। নৈলে অত সাহস হবে?'

অপরূপা রেগে গেল। 'বাজে কথা বলিস নে রনি! আমার মেজাজ ঠিক থাকবে না বলে দিচ্ছি।'

রঞ্জনা হাসতে হাসতে লেবুগুলো লুফতে-লুফতে বেরুল। বলল, 'আজ লেবু-ভাত দিদি। আর কিচ্ছু চাই নে।' সে ঠাকুমার ঘরের দরজা খুলে কয়েকটা লেবু ঠাকুমার পুজোর জায়গায় রাখল। প্রণাম করল। তারপর দুটো লেবু নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ডাল-ভাত করা আছে। লেবু হলে জমবে ভাল।

মধুরবাবুর মুক্তি

বসন্তপুরের 'সিংহভবনে' একসময় ঘণ্টাঘড়ি ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেটা গেটের কাছে ঢঙ ঢঙ করে বাজত। কৃষ্ণনাথের আমলে আর বাজে না সেটা। এখন দারোয়ান মাত্র একজন—ওই বাহাদুর। ইদানিং বাড়ির মালিক কলকাতায় বলে তার অঢেল স্বাধীনতা। গেটের পাশে টানা একতালা কয়েকটা ঘর। দুটো ঘরে মোটরগাড়ির গ্যারেজ। একটা অ্যামবাসাডার, একটা জিপ। অ্যামবাসাডার গাড়িটা এখন কলকাতায়। ড্রাইভারও সঙ্গে গেছে। গেটের লাগোয়া বাহাদুরের ঘরের খাটিয়ায় বসে সে রোজ রাতে শোবার আগে গাঁজা টানত। গাঁজার ব্যাপারে সঙ্গী একজন চাই-ই। একটানা ছিলিম টানা পোষায় না। তাই বাহাদুর একজন সঙ্গী খুঁজছিল। বদমেজাজী গোঁয়ার বলে বসন্তপুরে তার সঙ্গী জোটে নি। এতদিনে জুটে গেছেন মধুরকৃষ্ণ গোস্বামী। তিনিও তক্কে তক্কে ছিলেন।

শুধু ছিলিমসঙ্গী হন নি মধুরবাবু, আহারনিদ্রারও সঙ্গী বাহাদুরের। বাড়ির ভারপ্রাপ্ত গার্জেন ভুলো—মহেশ্বর যার প্রকৃত নাম, আপত্তি জানাতে এসে বাহাদুর এমন চোখে তাকিয়েছিল যে ভুলো আর ভুলেও উচ্চবাচ্য করে না। ভুলো জানে, বাহাদুর খুনে প্রকৃতির যুবক—কুকরির কোপ ঝাড়তে ভাবনা-চিন্তা পর্যন্ত করবে না। আর কর্তাবাবু বাহাদুরকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। কেন করেন, তাও জানে ভুলো। পয়সা দিয়ে ভালকুত্তা পুষেছেন।

মধুরবাবুর চেহারায় আর বাকি জেল্লাটুকুও নেই। কিন্তু কোত্থেকে একটা ঢোলা প্যান্ট আর খদ্দরের পানজাবি জুটিয়ে চেহারার ভোল রক্ষা করেছেন। রঞ্জনার ঠাকুমার কাছে যে কম্বলটা ফেলে পালিয়েছিলেন নিমতিতা স্টেশনে, এতদিনে সেটা ফেরত পেয়েছেন। রঞ্জনা মেয়েটা—তাঁর মতে, পৃথিবীর এক সেরা মেয়ে। ও মেয়ে যার বউ হবে, তার বরাতকে হিংসে করা উচিত।

বাহাদুর স্বপাক খায়। মধুরবাবু যত পৈতে দেখান না কেন, সে তাঁর ছোঁয়া খাবে না। তবে ছিলিম জিনিসটা আলাদা ব্যাপার। আগুনের কি এঁটো থাকে? তদুপরি শিবের প্রসাদ। শবের চেলাদের জাতিবর্ণ ভেদ নেই।

ড্রাইভার ভগবতীপ্রসাদের খাটিয়া বাহাদুরের ছোট ঘরে আনায় একটু ঠাসাঠাসি হয়েছে। হাতে সেঁকা চাপাটি আর আলুফুলকপির ঘ্যাঁট দুজনে খেয়ে ছিলিম টেনেছে এবং প্রচুর সুখদুঃখের কথাবার্তা হয়েছে। মৌতাত যত জমে, কথাও তত কমতে থাকে। তারপর পাশাপাশি দুটি খাটিয়ায় দুজনে শুয়ে বেঘোরে ঘুমোয়।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ ক্ষয়ে গেছে—উঠবে সেই শেষ রাতে। কম্বলের ভেতর থেকে মধুরবাবু মুখ বের করে বাহাদুরের অবস্থা অনুমান করছিলেন। তার নাক সমানে ডাকছে। কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার পর আস্তে আস্তে উঠে বসলেন। অন্ধকারে ঠাহর করে আগে ওর বালিশের পাশ থেকে লম্বা টর্চ, তারপর খাপেভরা মারাত্মক কুকরিটা তুলে নিলেন। তারপর দরজা খুললেন সাবধানে। সামনে ফালি রাস্তার পর লতার বেড়া, তার ওদিকে টেনিস লন। বাড়ির মাথা থেকে একটা বাল্‌ব্‌ আলো ছড়াচ্ছে গেট অব্দি। গেটে ভেতর থেকে তালা আঁটা। চাবির থোকা দেয়ালের হুকে ঝুলছে। মধুরবাবু সাবধানে টর্চ জেলে বাহাদুরের খাটিয়ার তলায় আলো ফেললেন। প্রকাণ্ড টিনের ট্রাংক। টানলেই শব্দ হবে। হতাশ হয়ে অগত্যা নিজের কম্বল, বাহাদুরের টর্চ আর কুকরিটা সম্বল করেই বেরুলেন। দরজা বাইরে থেকে ঠেলে ভেজিয়ে দিতে ভুললেন না।

গেটের তালা খুলে একটু ফাঁক করে বেরিয়ে গেলেন মধুরবাবু। তারপর তাঁকে আর পায় কে? সিংহভবনের সামনের রাস্তায় দূরে-দূরে একটা করে ল্যাম্পপোস্ট। রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে আগাছার জঙ্গল ভেঙে মাঠে নামলেন। তারপর খিক খিক করে আপন মনে হেসে উঠলেন। আজ ছিলিমের টানে বড্ড ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়েছেন ছোকরাকে। মাথার ওপর ঝকঝক করছে নক্ষত্রপুঞ্জ। কম্বলটা এযাত্রা রক্ষা করেছেন বলে আরও আনন্দ হচ্ছিল। কম্বল মুড়ি দিয়ে নাকবরাবর চললেন স্টেশনের দিকে। এই ছোটলোকদের দেশ থেকে পালানোর জন্য কবে থেকে মন ছটফট করছিল। টর্চটা প্রথমেই ঝেড়ে দেবেন কাউকে। কুকরির খদ্দেরের অভাব হবে না। তাছাড়া যতক্ষণ সঙ্গে এ জিনিস থাকে, ততক্ষণ সাহসও থাকে। আসুক না নেপালী ছোঁড়াটা, এক কোপে মুণ্ড নামিয়ে দেবেন। অন্ধকারে কুকরিটা একবার বের করে চারদিকে শূন্যে কোপ ছেড়ে মধুরবাবু চাপা গর্জালেন, 'আয় শালারা! চলে আয়—এবার দেখছি।'

স্টেশনের আলো জ্বল জ্বল করছিল কুয়াশায়। ঠাণ্ডাটা বেড়ে যাচ্ছিল। রাত একটা দশের ডাউন ট্রেনে বিস্তর লোক কলকাতা যায়। ঝিমধরা ভিড় জমে ওঠে প্ল্যাটফর্মে। ঘুমঘুম গলায় চা হেঁকে বেড়ায় জয়রাম আর মঙ্গল। মঙ্গলের চায়ে আদার রস থাকে। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু ঘোড়ার মতো স্টেশনের দিকে চললেন

অনেকদিন থেকে কলকাতা যাবার কথা ভাবছিলেন মধুর বাবু। যাওয়া হচ্ছিল না। কলকাতায় না গেলে মানুষের উন্নতি হয় না। এবার যাওয়াটা ঠেকাবার মতো কিছু রইল না। কারণ ওই বাহাদুর। বাহাদুরকে শত্রু করতে পেরে নিজের একটা মুক্তি জোটাতে পেরেছেন মধুরবাবু। বাপ্‌স! ওই খুনে বসন্তপুরে থাকতে আর কি ফেরার কথা ভাবা যায়?

রাত একটার পর যে কোনো সময় বসন্তপুরে আপ ও ডাউন দুটো ট্রেন এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়। যতক্ষণ না অন্য ট্রেনটা পৌঁছচ্ছে, স্টেশনে আগে-আসা ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। লুপ লাইনের এই নিয়ম। একটু গণ্ডগোল হলেই মুখোমুখি একই লাইনে সংঘর্ষ ঘটে যাবে।

মধুরবাবু কম্বল মুড়ি দিয়ে এককোণে বসে যখন চা খাচ্ছেন, তখন হাওড়া থেকে আপ গয়াপ্যাসেঞ্জার এসে পৌঁছল। মধুরবাবু হনহন করে টাট্টু ঘোড়ার মতো কেষ্ট সিন্দির মেয়েকে একা নামতে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আর এ কী চেহারা হয়েছে মেয়েটার! শুনেছিলেন কী অসুখ-বিসুখ হয়ে কলকাতায় আছে নার্সিং হোমে। এত রাতে একা এভাবে ফিরে এল যে?

ভীষণ ইচ্ছে করল কথা বলতে, কিন্তু উপায় নেই। একসময় দেখা হলে নিঃসংকোচে টাকাপয়সা চাইতেন। হাসিমুখে দু-একটা টাকা দিত মেয়েটা। দূর থেকে দেখলেই মধুরবাবু চেঁচিয়ে ডাকতেন, 'বিয়াস। বিয়াস!' খুব ভাল মেয়ে। অমন বড়লোকের মেয়ে, দেমাক তো থাকবেই। কিন্তু মধুরবাবুর সামনে একটুও দেমাক দেখায় নি কোনোদিন।

একটা সুন্দর চান্স চলে গেল। কিছু পয়সাকড়ি চাওয়া যেত। দুঃখিত মনে মধুরবাবু চায়ে শেষ চুমুক দিলেন। তারপর ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেললেন স্টেশন ঘরের ড্রেনের দিকে। এবার ভয় হল, ও তো গিয়েই ডাকবে বাহাদুরকে। বাহাদুর জেগে উঠে দেখবে তার টর্চ নেই। কুকরি নেই। তখন কী হবে?

মধুরবাবু মনে মনে মাথা কুটতে থাকলেন, ডাউন ট্রেনটা এক্ষুনি এসে যাক ভালয়-ভালয়। হে মা কালী! হে বাবা মহাদেব!

আপের দিকে সিগন্যাল দিয়েছে। দেখে উঠে পড়লেন। তর সইল না। ওভারব্রিজ না পেরিয়ে গয়াপ্যাসেঞ্জারের কামরা গলিয়ে লাইন ডিঙিয়ে হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারের প্ল্যাটফর্মে উঠে নিশ্চিন্ত হলেন মধুরবাবু। দূরে বাঁকের মুখে আলো দেখা যাচ্ছে। ঢঙ ঢঙ করে ঘণ্টা বেজে উঠেছে আবার। মধুরবাবু কাঁপা-কাঁপা গলায় গান গাইবার চেষ্টা করছিলেন।

'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি…'

বাড়ির উত্তর অংশে একটা ঘরে সপরিবারে ভুলো বাস করে। দরজায় ধাক্কা আর ডাকাডাকিতে আলো জেলে সে বেরুল। তারপর আকাশ থেকে পড়ল। 'দিদিমণি তুমি! কর্তাবাবু কৈ? কী ব্যাপার। এমন করে…'

বিপাশা রুক্ষ স্বরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'থামো তো। ওদিকে দরজা খুলে দাও।'

সে বাড়ির সামনের দিকটায় চলে গেল। ভুলো ভেতরের ঘর দিয়ে গিয়ে হলঘরের দরজা খুলল। উঁকি মেরে দেখল গেটের দিকটায় জনপ্রাণী নেই। সে হতবাক হয়ে রইল। বাহাদুর নিশ্চয় গেট খুলে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

বিপাশা বলল, 'হাঁ করে কী দেখছ? আমার ঘরের দরজা খুলে দাও গে। আমি বড্ড টায়ার্ড।'

ভুলো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। দরজা খুলে দিল। সিঁড়ি বেয়ে বিপাশার পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। সে দোতালার বারান্দায় পৌঁছে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে সোফায় বসল। আস্তে বলল, 'বিছানাটা ঠিক করে দাও। আমি শোব।'

ভুলো বিছানা গুছিয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু খাবে গো? গরম দুধ এনে দেব?'

বিপাশা বলল, 'না। জল খাব।'

ভুলো জল এনে দিল। জলটা খেয়ে বিপাশা একটু হাসল। 'অবাক লাগছে—না ভুলোদা? আমি পালিয়ে এসেছি।'

'সে কী গো!'

'হ্যাঁ। বলো ভুলোদা, মিছিমিছি রুগী সেজে থাকতে ভাল লাগে?' বিপাশা আস্তে আস্তে বলল। 'রোজ বিকেলে একটু বেড়াই। একটা সুন্দর বাগান করে রেখেছে নার্সিং হোমের পেছনে। ওখানে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। বাড়ির কথা ভেবে কান্না পায়। তাই চলে এলুম।'

ভুলো একটু হাসল। 'কী কাণ্ড! ওনারা তো খুঁজবেন গো।'

'হুঁ! তুমি ট্রাংক কল করে মামাকে জানিয়ে দাও।'

'কর্তাবাবুর ঘরের চাবি তো নেই আমার কাছে। ফোন যে ওনার ঘরে!'

'চাবি নেই?'

'না।'

'তাহলে সকালে পোস্ট অফিসে গিয়ে করবে। যাও ভুলোদা, ঘুমোও গিয়ে।'

'লক্ষ্মী দিদি, কিছু খাও। দুধ গরম করে আনছি।'

বিপাশা রাগ দেখিয়ে বলল, 'কী জ্বালাতন করো ভুলোদা! বললুম না আমি টায়ার্ড। ঘুমুবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি ঘুমোও।' বলে উদ্বিগ্ন ভুলো চলে গেল। বাইরে গিয়ে সে ফের বলল, 'দরজা ভাল করে আটকে দিও দিদি।'

বিপাশা বলল, 'দিচ্ছি! তুমি শুয়ে পড় গে তো! খালি কথা বাড়ায়।'

ভুলোর পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়িতে তালিয়ে গেলে সে উঠে দরজা বন্ধ করল। দক্ষিণের জানলাটা খুলে দেখল, ওদিকটা অন্ধকার হয়ে আছে। ঘরের উষ্ণতায় সে আরাম পাচ্ছিল। কিন্তু জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে দেখে বন্ধ করে দিল। ফের সোফায় কিছুক্ষণ বসে রইল। কাপড় বদলানো উচিত। কিন্তু ইচ্ছে করছিল না। জীবনে এমন দীর্ঘ আর ক্লান্তিকর ট্রেনজার্নির অভিজ্ঞতা

তার ছিল না। রিকশো করে বাড়ি পৌঁছুতে ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গিয়েছিল। এখন একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠছে তার শরীর-মন।

বাড়ি ফেরার আনন্দ তাকে নাড়া দিচ্ছিল। তখন ড্রয়ার খুলে একটা ক্যাসেট বের করল। ক্যাসেট চলিয়ে দিল। এই টেপরেকর্ডারটা দিশি জিনিস। শতক্রু যেটা এনেছে, সেটা ডঃ চৌধুরীর ক্লিনিকে তার ঘরে রয়ে গেছে। এটা একটা ঘসঘস শব্দ করে। ক্যাসেটটাও হিন্দি ফিল্মের। তবু এখন এই নির্জন রাতে সঙ্গীত তার বড় প্রয়োজন। যা হোক কোনো সঙ্গীত— শুনতে শুনতে তার ঘুমুনোর অভ্যাস বহুদিনের। বড় আলোটা নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জেলে দিল সে। তারপর বিছানায় উঠে শুয়ে পড়ল। কার্ডিগানটা ছুঁড়ে ফেলল সোফায়। কার্ডিগানটাও শতক্রু এনে দিয়েছে। এদেশের শীতের পক্ষে বাড়াবাড়ি বলা যায়। কলকাতায় তো গায়ে ঘাম এনে দিত। তবু রাতের ট্রেনে কার্ডিগানটা তাকে বাঁচিয়েছে আজ।

বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে সে গান শুনতে থাকল। সুরটা তার ভাল লাগছিল এখন। কোন্ গান কোন্ সুরে কখন যে ভাল লাগে, বলা কঠিন। এই ক্যাসেটটা সে দৈবাৎ ঝোঁকের বশে কিনে ফেলেছিল। একটুও ভাল লাগত না। এখন ভাল লাগছে। সে গভীর সুখে ডুবে রইল।

কতক্ষণ পরে তার মনে হল পুবের জানলার বাইরে কে হাওয়ার শব্দে কী একটা বলছে। কান পাতল সে। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য।' বিপাশা উঠে বসল। 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি…' সে অস্ফুটস্বরে বলল, 'কে ?'

তেমনি হাওয়ার শব্দে জবাব এল, 'আমি অনি।' বিপাশা বিছানা থেকে নেমে পুবের জানলা খুলে দিল। দেখল, বাগানের পুব-দক্ষিণ কোণে একটা হাওয়াকল উঁচুতে খুব আস্তে ঘুরছে। তার গায়ে আটকে গেছে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা এককালি চাঁদ। ক্ষীণ জ্যোৎস্না তার। হাওয়াকলের প্রকাণ্ড চাকাটা ঘুরে-ঘুরে চাপা ও গম্ভীর শ্বাসপ্রশ্বাসে আবৃত্তি করছে, 'তোমার সঙ্গে পাপ করেছি সেই তো আমার পুণ্য…'

সুপ্রাচীন অলীক এক হাওয়াকলের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বিপাশা।…

বিপাশার চিঠি

বাঁকাশ্রীরামপুর খুব একটা পছন্দ হয়নি রঞ্জনার। তবে লোকগুলো বেশ ভাল। কথায় কেমন ঠাকুমার মতো টান। শুনতে হাসি পায়। ঠাকুমাদের ভিটের ওপর দাঁড়িয়ে রঞ্জনা হতাশ হয়ে ভেবেছে, এই শুকনো ঢিবি, নিমবন, লেবুগাছের ঝোপ-ঝাড় দেখতে আসার জন্য এত ছটফটানি ছিল ঠাকুমার। রঞ্জনা যদি বসন্তপুর ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকত, কক্ষণো তার মন খারাপ করত না। অবশ্য জায়গাটা ভাল হওয়া চাই। বাঁকা-শ্রীরামপুরের মতো হলেই মুশকিল। না রাস্তাঘাট, না কিছু। এঁদো পাড়াগাঁ। সতুবাবু বলেছেন, 'শিগগির রাস্তা পাকা হচ্ছে স্টেশন অব্দি। ওদিকে মাত্র পাঁচমাইল দূরে রয়েছে হাইওয়ে। তার সঙ্গে জুড়ে দিলে তো এ গ্রাম একেবারে শহর হয়ে যাবে। তখন বাসে চেপেই বসন্তপুর পৌছে যাবে লোকে।'

মথুরামোহনের ভিটেয় তুবোনকে ঘর তুলে দেবে গাঁয়ের লোকে। অপরূপা ফেরার পথে সেই ঘরের গল্পও সাতকাহন করে শুনিয়েছিল রঞ্জনাকে। 'মাটির ঘর হোক না—দেয়ালে প্ল্যাস্টারিং করে নেব। চূণকাম করলে দারুণ দেখাবে। পরে ইটের করে নিলেই চলবে। জানিস? ওখানকার মাটিতে ভাল ইট হয়? সতুকাকা বলছিলেন। তাছাড়া ধর, তুতিন বছরের মধ্যে ইলেকট্রিসিটিও এসে যাবে গ্রামে। বসন্তপুর কী ছিল বল্? আমাদের ছেলেবেলায় তো কত মাটির ঘর দেখেছি। এখনও তুচারটে আছে। এভাবেই তো হয়। দেশের চেহারা বদলাচ্ছে না বুঝি?'

রঞ্জনা এত শুনেও ভেতর-ভেতর মনমরা হয়ে পড়েছে। তার একটা আশা, দাদা ফিরে এলে তাকে বাঁকাশ্রীরামপুরে নিশ্চয় থাকতে দেবে না। দিদির একটা চাকরির দরকার—করুক না ওখানে। যদি দৈবাৎ কলকাতার সেই ইন্টারভিউয়ের চাকরিটা হয়ে যায়, দিদিও কি ওখানে থাকতে চাইবে?

রঞ্জনা টের পেয়েছে, অপরূপার সঙ্গে হরেনের সম্ভবত একটা রফা হয়েছে। হরেন তাদের সঙ্গে আবার যেতে চেয়েছিল তার মানেটা কী? তাই বলে অপরূপা কি ওকে বিয়ে করবে শেষ পর্যন্ত? রঞ্জনার খুব খারাপ লাগে এটা। দিদিটা বড্ড বোকা। কেন ছেলেদের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিল? রঞ্জনা তো এ পর্যন্ত কোনো ছেলেকে পাত্তা দেয় নি। দেবেও না কোনোদিন।

অবেলায় বাড়ি ঢুকলে ছুতোর বউ একগাল হেসে বলল, 'খুব খাওনা-দাওনা হল তাহলে কুটুম বাড়িতে? তা না গো?'

উঠোনের পোয়ারাগাছে একটা দোলনা ঝুলছে, তার ভেতর পেনীর ছোট্ট ভাইটা। অবাক হয়ে অপরূপা বলল, 'ও কী গো বউ?'

'পেনীর বাবা বানিয়েছে। রোজ বলি, কানে করে না।' ছুতোর বউ কুণ্ঠিত হেসে বলল। 'খুলে নিয়ে যাব এক্ষুনি। কোলের খোকা সামলাব, না তোমাদের বাড়ি আগলাব বলো? সবসময় চোরচোট্টার উঁকি ঝুঁকি।'

অপরূপা হেসে বলল, 'না না। থাক না। বেশ তো টাঙিয়েছ।'

দুটো ব্যাগ ভর্তি কপি, টমাটো, আলু নিয়ে এসেছে দুইবোন। চটের ব্যাগে ভরে দিয়েছেন সতুবাবু। ছুতোর বউ তার ভাগ পেল। কোঁচড়ভরে নিয়ে যাবার সময় হঠাৎ পিছু ফিরে বলল, 'উদিকে এক কাণ্ড। পথে আসতে শুনলে না কিছু?'

অপরূপা আনমনে বলল, 'কী গো বউ?'

ছুতোর বউ ফিসফিস করে বলল, 'কেষ্টসিঙ্গির মেয়ে—বুঝলে? কাল রাত্তিরে ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছে।'…

অপরূপা চমকে উঠল। 'বিয়াস? বিয়াস ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল?'

রঙ্গনা চোখ বড়ো করে বলল, 'সে কী। বিয়াসদি তো কলকাতায় ছিল, কবে এল? যাঃ! সব মিথ্যা কথা।'

'না গো। চোখের দিব্যি।' ছুতোর বউ চোখ ছুঁয়ে বলল, 'পেনীর বাবা বললে, কখন হাসপাতাল থেকে পালিয়ে বাড়ি চলে এসেছিল। তারপর রেতের বেলা নাকি নিশিতে ছাদে ডেকে নিয়ে যায়।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণ পুড়িয়ে এসেছে শ্মশানে। নাকি পোড়াচ্ছে।' ছুতোর বউ খিড়কির দিকে যেতে যেতে বলল। 'সিঙ্গি, সিঙ্গির বউ, সিঙ্গির ছেলে দুপুরবেলা এসেছে খবর পেয়ে। ফোন করেছিল—বুঝলে না? ফোন করেছিল ভোরবেলা। পেনীর বাবা বললে।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্ধকার এল। নিঃশ্বাস ফেলে অপরূপা বলল, 'রনি, আলো জ্বালবি নাকি?'

রঙ্গনা হেরিকেন জ্বেলে এনে বলল, 'বিয়াসদির কী হয়েছিল, জানিস দিদি?'

অপরূপা মাথা নাড়ল। একটু পরে বলল, 'ওদের বাড়ি তো যাওয়া হয় না। তোকে অপমান করেছিল। ঢুকতে দেয়নি। নৈলে একবার যেতুম। বিয়াস এভাবে মরে যাবে কে ভেবেছিল বল্?'

রঞ্জনা ধরা গলায় বলল, 'আমায় খুব ভালবাসত বিয়াসদি। কত বই দিত।'

'হ্যাঁ। বিয়াসের মনটা বড় ভাল ছিল।'

'দিদি!'

'উঁ?'

'বিয়াসদি আমায় চুপিচুপি দাদার কথা জিগ্যেস করত। কেন রে?'

অপরূপা ঝাঁঝালো স্বরে বললে, 'আমি কেমন করে জানব? ওসব ছেড়ে দে তো। সন্ধ্যাবেলা আজেবাজে কথা ভাল লাগে না। উনুন ধরাতে হবে। কুকারে তেল নেই। কে আনবে বাবা? কয়লা ধরিয়ে দিচ্ছি।'

রঞ্জনা চুপ করে থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল। তার কান্না পাচ্ছিল। বিয়াসদি এভাবে মারা গেল! সত্যি কি নিশি বলে কিছু আছে—যা মানুষকে রাতের বেলা ডেকে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলে? চোখে জল নিয়ে রঞ্জনা ভয়-পাওয়া দৃষ্টিতে অন্ধকার পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে রইল।

পরদিন সকালে টিউশনি করে ফেরার সময় অপরূপা একটা চিঠি পেয়ে চমকে উঠল। বিয়াসের চিঠি যে! তার হাত কাঁপছিল। খামটা কোনোরকমে ছিঁড়ে তারিখটার ওপর চোখ পড়ল সে নিশ্চিন্ত হল। চারদিন আগের তারিখ। ড্রিমল্যাণ্ড নার্সিং হোম থেকে লেখা। কলকাতার ঠিকানা। বিয়াস লিখেছে: 'অপু, কতদিন থেকে ভাবছি, তোকে একটা চিঠি লিখব। আলসেমি করে হয়ে ওঠে নি। তুই তো জানিস, আমি চিরকাল ভীষণ অলস। চুপচাপ সময় কাটাতে পারলে আর কিছু চাই নি। এতদিনে যেন তার শাস্তিটা ভালরকমে পাচ্ছি। আমি জানি আমার কোনো অসুখ নেই। অথচ আমাকে জোর করে এই নার্সিং হোমে আটকে রেখেছে। এটা একটা মেণ্টাল ক্লিনিক আসলে। রাজ্যের পাগল এনে এখানে ঢুকিয়েছে। আমি কি পাগল? তুই বল্ অপু! আমাকে এবার সত্যি সত্যি পাগল করে ছাড়বে এরা। তাই খুব শিগগির এখান থেকে পালাতে চাই। তার আগে তোকে এই চিঠিটা লিখে ফেললাম একটা জরুরী তাগিদে। তুইও ভাল করে ভেবে দেখিস, যা লিখছি তাতে তোর বা তোদের ফ্যামিলির কোনো অপমান হবে না। আমি জানি, তোদের ভাইবোন কারুর মধ্যে গ্রাম্য লোকের মতো কুসংস্কার ছিল না। অনিদা ঠাট্টা করে আমাকে বলত, তোমরা তো ছাতুরুটিখেকো খোট্টা ছত্রী রাজপুত বংশ। এদেশে এসে জাত ভাঁড়িয়ে কায়েত হয়েছ। আমি বলতুম, তোমাদের দেহেও কিন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্ত নেই। তোমার ঠাকুমা নাকি কায়েতের মেয়ে।...'

অপরূপা চিঠি থেকে চোখ তুলে দাড়িয়ে রইল। কী সব লিখেছে বিপাশা!

কেন এসব কথা লিখেছে ? তারপরই তার মনে পড়ে গেল ফের, বিপাশা মৃত। সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল কিছুক্ষণ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এভাবে চিঠি পড়া উচিত নয় ভেবে সে হন হন করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

বাড়ি ঢুকে দেখল, রঙ্গনা চুপচাপ বসে আছে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে। পেনী তার পায়ের কাছে বসে কড়ি খেলছে আপন মনে। রঙ্গনা বলল, 'চিঠি নাকি রে দিদি ? কার চিঠি ?'

অপরূপা বলল, 'বলছি।' তারপর সে ঘরে ঢুকে ফের চিঠিটা নিয়ে বসল।

'..তখন অনিদা হাসতে হাসতে বলত, তাহলেও প্লাসে-মাইনাসে মাইনাস হয়ে গেছে। নিছক কথার কথা। এতদিনে তোকে বলা দরকার অপু, তুই ছাড়া বসন্তপুরে কেউ আমার বন্ধু ছিল না—সে তুই যাই ভাব না কেন। তোকেই বলছি শোন্, অনিদার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বুঝতেই পারিস, খুব গোপন সম্পর্ক সেটা। অনিদা আমাকে নিয়ে চলে যেতে চেয়েছিল। আমি সাহস পাই নি। এখন ভাবি, চলে গেলে দুজনেই বেঁচে যেতুম। তবে সেকথা যাক্। যা হয় নি, হল না এ-জন্মে—তার দুঃখ নিয়ে আমি বেঁচে থাকলুম। আমার দুঃখ আমারই একার। তাই থাক ওকথা। এবার আসল কথাটি বলি শোন্। দাদার রঙ্গনাকে খুব পছন্দ। দাদা তোকে বলতে সাহস পায় নি। কিন্তু আমাদের বাড়িতে এ নিয়ে প্রচণ্ড অশান্তি হয়ে গেছে। এখনও বাবাব সঙ্গে দাদার কথা বন্ধ। কেন তা আশা করি বুঝতে পারছিস। বাবা সেকেলে মানুষ। ফিউডাল সংস্কারে আচ্ছন্ন। দাদার সঙ্গে বাবার কোনোদিন তো মতের মিল হয় নি।...'

অপরূপা একটু হাসল। শতদ্রু তাকে চিঠি লিখেছিল, বলে নি বিপাশাকে। বললেই পারত।

'...জায়গা কমে গেল লেখার। লিখতেও কষ্ট হয় আজকাল। শরীর দুর্বল। অপু, আমার অনুরোধ তুই রঙ্গনাকে দাদার হাতে তুলে দে। রঙ্গনার ভাল হবে। দাদা ওকে নিয়ে অ্যামেরিকা চলে যাবে। আমি জানি, রঙ্গনার মনেও এধরণের একটা স্বপ্ন আছে। ইংরেজি উপন্যাসের পোকা বরাবর। দাদা যখন বিদেশে, তখন রঙ্গনা আমার কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে সেখানকার কথা জানতে চাইত। দাদার পাঠানো ছবি গুলো দেখে মুগ্ধ হত। ওকে যদি বলতুম, তুই যাবি ওদেশে ? রঙ্গনা বলত, কে নিয়ে যাবে ? তাকে তখন বলতে পারি নি, দাদা নিয়ে যাবে। কারণ তখন ওসব কথা মাথায় আসে নি। এখন বলতে পারি।...'

বিপাশা ক্ষুদে অক্ষরে মার্জিনগুলো ভরিয়ে ফেলেছে। শেষপাতার মার্জিনে লেখা খুব অস্পষ্ট হয়ে গেছে। খুঁটিয়ে কষ্ট করে অপরূপা উদ্ধার করল, নাম সইয়ের ওপর দুটো লাইনে লেখা আছে: 'অপু, আমি হয়তো বেশিদিন বাঁচব না। অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে চলে যাব। ইতি তোর বিয়াস।'

অপরূপা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভুল পড়ল নাকি? আবার পড়ার চেষ্টা করল।...'অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব।'

অপরূপা নড়ে বসল। ডাকল, 'রনি! রনি! আয় তো।'

রঙ্গনা এসে বলল, 'কী রে দিদি? কার চিঠি?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে অপরূপা বলল, 'এই লাইন দুটো পড়তে পারিস?'

রঙ্গনা পড়ল: 'অনি আমাকে ডাকছে। আমি অনির কাছে যাব। ইতি তোর বিয়াস।' সে চমকে উঠে বলল, 'বিয়াসদির চিঠি! সে কী!'

অপরূপা বলল, 'আমি, না অনি লিখেছে? ভাল করে গ্যাখ।'

রঙ্গনা দেখে বলল, 'হ্যাঁ-রে! অনি। দিদি, অনি কে রে?'

অপরূপা গলার ভেতর বলল, 'দাদা।'

'দাদার কথা লিখেছে বিয়াসদি?' রঙ্গনা অবাক হল। 'দাদা ওকে ডাকছে—দাদার কাছে যাবে, তার মানে কী রে দিদি? কিছু তা বোঝা যাচ্ছে না।'

অপরূপা তার হাতে চিঠিটা দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে জানলার বাইরে কলাবনের ফাঁক দিয়ে ডোবা দেখতে থাকল। মাছরাঙাটা বাঁশের কঞ্চিতে চুপ করে বসে আছে। জলটা সরে আরও সবুজ হয়েছে।

রঙ্গনা খুঁটিয়ে চিঠি পড়ার পর করুণভাবে হাসল। 'যাঃ! কোনো মানে হয় না! মনেই পড়ে না কবে বিয়াসদিকে বলেছিলুম অ্যামেরিকা যাব। বিয়াসদি থাকলে...' সে চুপ করে গেল.

অপরূপা অস্ফুটস্বরে বলল 'শেষ কথাটা এমনভাবে লিখেছে যেন দাদা একজন ডেড ম্যান। পাগলামি না কী! বিয়াসের অসুখটা তো মেণ্টাল। সাইকিক পেসেণ্টের কীর্তি!' সে ঘুরে রঙ্গনার দিকে তাকিয়ে তার মতামত বুঝতে চাইল। 'তাই না রনি? দাদার কিছু হলে বিয়া- জানবে, আমরা বুঝি জানব না?'

রঙ্গনা ঠোঁট উল্টে চিঠির দিকে তাকিয়ে বলল' 'কে জানে!'

অপরূপা একটু হাসল। 'কী রে? ইচ্ছে করছে?'

'কিসের ইচ্ছে?'

'যাবি অ্যামেরিকা?'

'মারব বলে দিচ্ছি!' রঙ্গনা কিল তুলল। 'দিদি বলে খাতির করব না।' চিঠিটা সে অপরূপার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বেড়িয়ে গেল।

অপরূপা ডাকল, 'রনি! শোন।'

বাইরে থেকে রঙ্গনা বলল, 'কী?'

'এখানে আয়। কথা আছে।'

'ওখান থেকে বল্। কান আছে আমার।'

অপরূপা বেরিয়ে গিয়ে বলল, 'সিরিয়াসলি বলছি, রনি। সিঙ্গিরা তোকে বাড়ি ঢুকতে দেয় নি। তোর কি প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করছে না?'

রঙ্গনা মুখ নামিয়ে বলল, 'খুব করছে।'

'তাহলে?'

রঙ্গনা চুপ করে থাকল। তার পায়ের আঙুলে থামের গোড়ার ভাঙা পলেস্তারা খসে পড়ছিল।

অপরূপা বলল, 'কী হল? কাঁদছিস কেন?'

রঙ্গনা জবাব দিল না।

তখন অপরূপা বোনকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ছিঃ রনি! এতে কাঁদবার কী হল বল্ তো? বিয়াস আমার একমাত্র বন্ধু ছিল। বেচারা অমন করে মরে গেল। কিন্তু কী করব? আমার নিজের সমস্যা কি কম? আর কিছু ভাববার সময়ই পাচ্ছি না। অন্তত বিয়াসের মুখ চেয়ে একটা কিছু করা দরকার। তুই অমত করিসনে রে! কেমন?'

গোপনে নির্জনে

সূর্য এখন উত্তরায়নে চলে এসেছে। রোদে উষ্ণতা জেগেছে। বসন্তপুরের মাঠে ঘূর্ণীহাওয়া রেললাইন ডিঙিয়ে চলে যায় করালী নদীর দিকে। শ্মশানের ভস্ম উড়িয়ে ঢোকে দেবী করালীর ভিটেয়। প্রাচীন বৃক্ষেরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। মধ্য ফাল্গুনে এখন মন্দার শিমুল পলাশের লাল ফুল দাউদাউ জ্বলছে চতুর্দিকে। হাইওয়ের দুধারে দীর্ঘ বৃক্ষরেখা। শিরিস দেবদারু বট অশত্থ চিকণ ঘনসবুজ রঙে ঢাকা। নদীর সাঁকোর কোণে অমলতাস গাছটা হলুদ ফুলে ঢাকা। দুই বোন বাস থেকে নেমে করালীর ভিটেয় গিয়েছিল।

কুড়ানি ঠাকরুন বলতেন, 'করালী আমার মা। আমি তার মেয়ে।' বলতেন, 'মা স্বপ্ন দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। মায়ের মনে এট্টা ইচ্ছে ছিল। সে-ইচ্ছের ফল এই দেখছিস ভাই! আমার ঘরসংসার, আমার ফুল-ফলের বিরিক্ষি, আমার গউর, আমার অপু, আমার রনি, আমার দুষ্টুটা—ওই অনি। আর কী চাই মানুষের? শুধু দুঃখুটা রইল বাপটার জন্যে। সেই যে জল আনতে গেল, আর ফিরে এল না—দেখাও হল না এ জন্মেতে।'

দেবী করালীর কাছে তাঁর জন্য 'মানসা' করতে এসেছিল দুজনে। ঠাকুমার গাছের কিছু ফুলফল এনেছিল রেকাবিতে। দুজনেরই পরনে নতুন তাঁতের শাড়ি। স্নান করে এসেছে। এলোচুল ছড়িয়ে রয়েছে পিঠে। ভাঙা মন্দিরের চত্বরে রেকাবিটা রেখে দুজনেই চোখের জল ফেলেছে। গলবস্ত্রে প্রণাম করেছে। তারপর শেষ বেলায় বাস রাস্তায় ফিরে এসে বাসের প্রতীক্ষা করছে বকুল গাছটার তলায়।

সেই সময় ব্রিজের শেষ প্রান্তে অমলতাস গাছটার ধারে একটা মোটরগাড়ি এসে থামল। অমনি রঞ্জনা অস্ফুটস্বরে বলে উঠল, 'বিয়াসদির দাদা না?'

অপরূপা তাকিয়ে রইল। শতদ্রু গাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্রিজের ওপর উঠল। রেলিঙে ভর দিয়ে নদী দেখতে থাকল।

অপরূপা চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, 'আমাদের দেখতে পায় নি। নৈলে চলে আসত। আয় রনি!'

'কোথায়?'

'শাটলেজদার কাছে।' অপরূপা দুষ্টুমি করে হাসল। রঞ্জনার হাত ধরে টানলও।

রঞ্জনা কাঁচুমুখে বলল 'তুই যেন কী! যেচে পড়ে ভাব জমাতে যাস্ লোকের সঙ্গে।'

অপরূপা বলল, 'অতবড় একটা ট্র্যাজেডি ঘটল। নিজের ছোট বোন! তাই এ্যাদ্দিন আমাদের বাড়ি আসে নি। আমিও সেইকথা ভেবে কোনো যোগযোগ করি নি। আয় না! অন্তত বিয়াসের জন্য সিম্প্যাথি জানানো উচিত কি না বল্ তুই?'

রঞ্জনা বলল, 'সিম্প্যাথি থাকলে দুলাইন পোস্টকার্ডে লিখে পাঠাতিস! পাঠাস নি কেন?'

অপরূপা দোষী মুখে বলল, 'ঠিক বলেছিস। অতটা খেয়াল হয় নি। যাক গে, যা হবার হয়েছে—আয়।'

রঞ্জনা দ্বিধাজড়িত পা ফেলে অপরূপাকে অনুসরণ করল। অপরূপার এই

ভাগিদের কিছু বোঝে না রঞ্জনা। অপরূপা ফেব্রুয়ারি মাসটা টিউশনি করে জবাব দিয়েছে। বাঁকা-শ্রীরামপুর চলে যেতে খরচপাতি আছে বলে হিসেব করে চলছে। বিয়াস ওভাবে মারা না গেলে সে শতদ্রুর সঙ্গে শিগগির যোগাযোগ করত। কিন্তু শোকতাপগ্রস্ত মানুষকে এসব কথা এখন বলা যায় না! অবশ্য ইচ্ছে তো শতদ্রুরই। কিন্তু শতদ্রুরও এসে কিছু বলার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না এতদিন। এবার কথাটা নিয়ে বসা যায়। রঞ্জনার ব্যবস্থাটা সেরে ফেলে অপরূপা তখন বাঁকাশ্রীরামপুরে চলে যাবে।

পায়েব শব্দে মুখ ফিরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শতদ্রু। তার পরনে ঘিয়ে বঙের পাঞ্জাবি আর দুধের মতো শাদা রঙের পাজামা। তার চুল উড়ছিল এলোমেলো হাওয়ায়। অপরূপার চোখে খুব সুন্দর দেখাল তাকে। এমন ছেলের হাতে বোনকে তুলে দেবার গর্বে সে চঞ্চল হল আরও।

শতদ্রু আস্তে বলল, 'কী খবর?'

একটু দমে গেল অপরূপা। ভাবল, এখনও বোনের শোকটা কাটিয়ে ওঠে নি শতদ্রু। অপরূপা একটু হাসল। 'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলুম। বিয়াস ওভাবে হঠাৎ...'

শতদ্রু বলল, 'মন্দিরে গিয়েছিলেন বুঝি? পুজো দিতে?'

অপরূপা বলল, 'হ্যাঁ। আমবা—মানে আমি চলে যাচ্ছি তো বাঁকাশ্রীরামপুরে, তাই প্রণাম করতে এসেছিলুম।'

'সেটা কোথায়?'

'বেশ খানিকটা দূরে। আমার ঠাকুমাব বাবার গ্রাম। সেখানে স্কুলে একটা চাকরি পেয়েছি।'

'আচ্ছা!' শতদ্রু একটু হেসে রঞ্জনার উদ্দেশে বলল, 'আপনিও যাচ্ছেন তো?'

রঞ্জনা আস্তে ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ কিংবা না বোঝা কঠিন। অপরূপা দ্রুত বলল, 'কিছু ঠিক নেই। ওর গ্রাম-ট্রাম ভীষণ অপছন্দ। আপনি তো ভালই জানেন শাটলেজদা, দিনরাত্তির ইংরিজি উপন্যাস পড়ে ওর মনে এখন সে-দেশের স্বপ্ন।' অপরূপা হাসতে লাগল। রঞ্জনা মুখ ফিরিয়ে নদী দেখতে থাকল।

শতদ্রু হাসল। 'তাই বুঝি? বেশ তো। আরও পড়াশুনো করুন। নিউজপেপার দেখবেন, মাঝে মাঝে ফরেন স্কলারশিপের বিজ্ঞাপন দেয়।'

অপরূপা বলল, 'বিয়াসদি মৃত্যুর আগে কলকাতা থেকে আমাকে চিঠি লিখেছিল।'

'হ্যাঁ আমাকে বলেছিল লিখবে।'...বলে শতদ্রু একটু হাসল। 'কিন্তু আর তো সে-প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনি কবে ফিরছেন শাটলেজদা ?'

শতদ্রু ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বলল, 'কোথায় ? স্টেট্‌সে ? নাঃ। ফিরছি না।'

অপরূপা আস্তে বলল, 'হ্যাঁ—এমন একটা ট্র্যাজিক ঘটনা ঘটল। বাড়ির একমাত্র ছেলে আপনি।'

'ঠিকই ধরেছেন।' শতদ্রু একটা চাবির রিঙ আঙুলে জড়িয়ে ঘোরাতে-ঘোরাতে বলল। 'এ বয়সে বাবাকে কষ্ট দেওয়া উচিত মনে করলুম না। তবে বসন্তপুরে থাকছি না ডেফিনিটলি! আমাদের এখানকার বাড়ি-টাড়ি এভরিথিং বেচে দিচ্ছি। সব ঠিক হয়ে গেছে। মোস্ট্‌ প্রবেবলি বাই দা নেক্সট্‌ উইক আমরা কলকাতায় নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠছি।'

অপরূপা শুকনো মুখে বলল, 'হ্যাঁ—বাড়িটার তো দোষ ঘটে গেল।'

শতদ্রু হাসতে লাগল। 'যিনি কিনছেন, তিনি সব জেনেশুনেই কিনছেন।'

'আপনি কলকাতায় থাকছেন তাহলে ?

'হ্যাঃ।' শতদ্রু ঠোঁট বাঁকা করে বলল। 'একটা কিছু করতে হবে রুজিরোজগারের জন্য। আমার বরাত! নরক বলে যাকে ঘেন্না করি, তার সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে চলতেই হবে। উপায় কী ?' সে শিস দেবার ভংগিতে ঠোঁট গোল করে নদীর দিকে ঝুঁকল।

রঞ্জনা বলল, 'দিদি! একটা ট্রাক আসছে। নিয়ে যাবে না ?' অপরূপা দেখে নিয়ে বলল, 'ছাখ না, দাঁড়ায় নাকি।'

শতদ্রু বলল, 'কেন ? আমি অনায়াসে আপনাদের লিফট্‌ দিতে পারি।'

অপরূপা জবাব দিল না। দুই বোন রাস্তার একেবারে মাঝখানে। ট্রাকটা থেমে গেল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল, 'গাড়ি বিগড়ে গেসে ?'

অপরূপা দ্রুত বলল, 'হ্যাঁ। আমাদের একটু বসন্তপুরে পৌছে দেবেন সর্দারজী ?'

'আইয়ে, আইয়ে। বৈঠ্‌ যাইয়ে '

বাড়ি ঢুকেই অপরূপা বলল, 'মা করালী যা করেন, সবই ভালর জন্যে রে! ভেবে ছাখ, কেষ্টসিঙ্গির ছেলের কথায় তখন যদি কিছু করে বসতুম, এখন কী অবস্থা হত তোর ? ওই ছত্রী রাজপুত—খোট্টাবংশের বুড়ো আর তার দেমাকী বৌ-এর পাল্লায় পড়তেই হ'তো তোকে। আর শাটলেজ না কাটলেট বলতিস, ঠিকই বলতিস। আসলে বড়লোকের ছেলের খেয়াল। কথায় বলে না ? বড়র পীরিতি বালির বাঁধ...'

রঞ্জনা ইঁদারাতলার দিকে যাচ্ছিল। ঘুরে বলল, 'শাট্‌ আপ! খুব হয়েছে।'

অপরূপা আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর আলোয় শান্তভাবে হাসল। 'সত্যি বলছি

রে রনি, তুই না থাকলে বাঁকাশ্রীরামপুরে কী করে একা থাকতুম ভেবে পাচ্ছিনে। আকটার অল বিদেশবিভুঁই জায়গা তো বটে। অজ পাড়াগাঁ। দুজনে থাকলে কত সাহস পাব বল্ রনি।'

তারপর সে বাড়ির ভেতর চোখ বুলিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ফের বলল, 'দাদা যদি কোনোদিন ফিরে আসে, সে এ বাড়িতে বাস করবে। সেই ভেবেই বাড়িটা বেচলুম না। থাক পড়ে। ছুতোর বউ দেখাশোনা করবে। ঠাকুমার লাগানো ফুল-ফলের গাছপালাগুলো একটু জলটল পেয়ে বেঁচে থাকলে ঠাকুমার আত্মা শান্তি পাবে। আব কী করতে পাবি আমরা, বল্ রনি?'

রঙ্গনা কিছু বলল না। সে ইদারায় ঝুঁকে গভীরতর জলের ভেতর আকাশ দেখার চেষ্টা করছিল। বালতিটা ডুবিয়ে জলকে স্থির হতে দিচ্ছিল। তার দিদি জানে না, কেউ জানে না, সেই কবে ঠাকুমার সঙ্গে করালীর মন্দির থেকে ফেরার সময় শতক্রুর গাড়িতে তার মনের খুব তলার দিকে কী এক আবছা গোপন স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেই স্বপ্ন সে মুছে ফেলতে পারে নি। স্বপ্নটা ছিল অজানা সুন্দর আশ্চর্য এক দেশের—সে এক বহুদূরের পৃথিবী। ছবির মতো সাজানো রাস্তাঘাট। প্রজাপতির মতো ফুটফুটে রঙীন মানুষজন। হয়তো অ্যামেরিকা নয়, ইউরোপ নয়--অন্য এক দেশ। স্বর্গের মতো সুন্দর, মহৎ, সম্ভাবনাময়, নিরুপদ্রব।

বিশ্বাস দব চিঠিটা পড়ার পর সেই গোপন স্বপ্ন তাকে আরও চঞ্চল করেছিল। সারারাত সে ভাবত কত সব ভাবনা। আর ভাবনাগুলোর মধ্যে ফুটে উঠত দীর্ঘ সুঠাম উজ্জ্বল চেহারার এক যুবাপুরুষ—তার মধ্যে শতক্রুর আদল দেখে সে লজ্জায় বালিশে মুখ গুঁজত। রঙ্গনা সেই যুবাপুরুষটিকে চুপিচুপি ভালবাসতে শুরু করেছিল। এতদিনে আবিষ্কার করল, সেই যুবাপুরুষ শতক্রু নয়। অন্য একজন। তার প্রতীক্ষা রঙ্গনার জীবনে আমৃত্যু থেকে যাবে। রূপের জগতে সে বুঝি এক অরূপরতন।

রঙ্গনা ইঁদারায় ঝুঁকে স্বপ্নভঙ্গের দুঃখটাকে লুকোতে চাইছিল। তার বুকের ভেতরে তীব্র একটা কান্নার আবেগ ঠেলে উঠছিল। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে গভীরতর প্রতিবিম্বিত আকাশ দেখতে থাকল।

অপরূপা যখন তাকে ডেকে বলল, 'অমন করে সন্ধ্যেবেলা ইঁদারায় ঝুঁকে থাকতে নেই, সরে আয়—' তখন সে মুখ তুলে আস্তে বলল, 'যাচ্ছি।' তারপর ভরা বালতিটা তাড়াতাড়ি টেনে তুলল। দিদি দেখার আগেই ভেজা চোখ দুটো সে বালতির জল দিয়ে ধুয়ে ফেলল।..

উপসংহার

আজকাল গ্রামাঞ্চলের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আসত কারণ অবশ্য ভোটের রাজনীতি। ভোটকুড়ুনো মোটরগাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তাঘাট দরকার। মাত্র একটা ভোট জয়-পরাজয় সূচিত করে। সুতরাং এই তৎপরতা। হাইওয়ে থেকে বাঁকা-শ্রীরামপুর পর্যন্ত পাঁচমাইল কাঁচা রাস্তা পাকা হচ্ছে। একপ্রস্থ ঝামা ইটের সোলিং পড়েছে, যদিও প্রত্যেকটা টুকরোর মধ্যে কালো রঙ খোঁজা বৃথা এবং দ্রুত ডিজেলচালিত বৃহৎ রোলারে পেষাই করে তখনই একস্তর হাল্কা পাথরকুচি ছড়িয়ে সত্যাসত্য গোপন করা হচ্ছে। রোডস দফতরের ওভারশিয়ারবাবু কন্ট্রাকটারের তাবুতে বসে মুরগির ঠ্যাং চিবোন এবং ওকে আওয়াজ দিয়ে সদর অফিসে ফেরেন। কচিৎ কোনো মোলায়েম-স্বভাবী ইঞ্জিনিয়ারের আগমন ঘটে। পথিপার্শে কালো ড্রামে পিচ সেদ্ধ হয়। কড়াইভর্তি গরম পিচ নিয়ে লোকেরা ছোটাছুটি করে। তাদের পেছনে আদিবাসী মেয়েদের মাথায় বালির ঝুড়ি। ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক উদাসচোখে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ দেখতে দেখতে হঠাৎ-জেগে-ওঠা কণ্ঠস্বরে বলেন, 'মাই গুডনেস! এ যে দেখছি সত্যিই সবুজ বিপ্লব!'

এখন বসন্তকাল। তবু শরতকাল বলে ভ্রম হয়। বাঁক-শ্রীরামপুরের গা ঘেঁষে বাজা ডাঙায় কন্ট্রাকটারের তেরপলের কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। পেছনে ঢ্যাঙা বিশাল শিমুল তার ফুল উজাড করে ফেলে নিঃস্ব হয়ে সারাদিন উচ্ছৃংখল হাওয়ায় পুঞ্জপুঞ্জ তুলো ছড়ায়। পুকুরপাড়ে জীর্ণ প্রাচীন শিবমন্দিরে ভক্ত সন্নেসীরা দেয় আসন্ন সংক্রান্তির উদ্দেশে জয়ধ্বনি। স্কুলপালানো ছেলেমেয়েরা তাঁবুর আনাচেকানাচে ঘুরঘুর করে। সিগারেটের শূন্য প্যাকেট থেকে রাংতাকাগজ সংগ্রহ করে। প্রাইমারি সেকশনের দিদিমণিটি বড় কড়া। স্কুলের বারান্দা থেকে এদিকে তাকালেই তাদের বুকের স্পন্দন বেড়ে যায়। শিবমন্দিরের কল্কেফুলের জঙ্গলে তারা গা ঢাকা দেয়। ঠিক তখনই ঢং ঢং করে টিফিনের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বাঁকা-শ্রীরামপুর আমোদিনী বিদ্যালয় এখন সরকারী অনুমোদন লাভ করেছে। সামনে বছর অন্তত একডজন ছাত্র-ছাত্রী স্কুলফাইনাল দেবে। প্রাচীনকালের জমিদারী কাছারিবাড়ির একতালা সারবাঁধা ঘরগুলোর ভোল বদলেছে। দুপাশে

কিছু নতুন ঘর জোড়া দেওয়া হয়েছে। সামনে ফুলবাগিচা জেগে উঠেছে, এবং গেটে বুগানভিলিয়ার ঝাঁপি। ফুলে ফুলে লাল ঝরনা নেমেছে।

ছুটির পর রঞ্জনা বাড়ি ফেরে না। স্কুলের পেছনে বাঁধের নিচেই ছোট্ট নদী। সে বাঁধে কিছুদূর এগিয়ে ঘাসেঢাকা একটুকরো জমিতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বসে থাকে। হাতে একটা বই। বইপড়া স্বভাব তাকে আজও ছাড়েনি। পড়তে পড়তে কখনও মুখ তুলে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরের ঘাটে থানপরা কোনো বৃদ্ধাকে দেখলেই তার বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কুড়ানি ঠাকরুন নাকি?

কুড়ানি ঠাকরুনের বাপের ভিটেয় গ্রামপঞ্চায়েত ছুবোনের জন্য মাটির ঘর তুলে দিয়েছে। উঠোন ঘিরে সুন্দর বাঁশের বেড়া আর বেড়া ঢেকে ফেলেছে সবুজ লতাব ঝালর। উঠোনে কত ফুলফলের গাছ। কুড়োনি ঠাকরুনের আত্মা ভর করেছে রঞ্জনাকে। জামাইবাবু হরেনকে দিয়ে বীজ ও চারা আনায়। হরেন এখনও বসন্তপুরে সাধুবাবুদের পেট্রল পাম্পে চাকরি করছে। ছুটির দিনটা ছুটে আসে বউয়েব কাছে। চাকরি ছাড়লে তার চলবে না। তার অথর্ব জ্যাঠামশাইকে সপরিবারে ভিখিরী হতে দেবে কোন মুখে সে? এদিকে অপরূপা সন্তানসম্ভবা। হরেনের ইচ্ছা, বাচ্চাটা পৃথিবীর মুখ দেখলেই সে শ্যালিকাকে কোথাও গায়ের জোরে ঝুলিয়ে দেবে পাকাপোক্ত জায়গা দেখে। আর কোনো আপত্তি বরদাস্ত করবে না। আর কতকাল ধিঙ্গি আইবুড়ি থাকবে অমন সুন্দর মেয়েটা? বিয়ের কথা শুনলেই আত্মহত্যার শাসানিতে নিশ্চয় গভীর কোনো অভিমান আছে, হবেনের এই ধারণা। তবে হরেনের এও মনে হয়, গতবছর বহরমপুরে বেসিক ট্রেনিং পড়াব সময় মাসছয়েক একা ছিল। তখন কারুব সঙ্গে প্রেম-ট্রেম বাধিয়ে আসে নি তো? অপরূপা তাই শুনে বলে, 'তোমার মাথা খারাপ? তাহলেও তো বেঁচে যেতুম। ওব মনটা অষ্টধাতুতে গড়া।'

একদিন বিকেলে রঞ্জনা স্কুলের ছুটির পর নদীর ধাবে বসে ছিল। তার হাতে একটা হাল্কাধরনের ইংরেজি নভেল। বহুবার পড়া হয়ে গেছে। কিন্তু উপায় কী? শাঁকাশ্রীরামপুরে বই কোথায় পাবে? বহরমপুবে ট্রেনিংয়েব সময় কয়েকটা বই স্টাইপেণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে কিনেছিল। আর কয়েকখানা যা আছে, সবই মধুরবাবুর চোরাইমাল। বইগুলো সে যত্ন করে তাকে সাজিয়ে রেখেছে। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুখী চোখে তাকিয়ে থাকে। কল্পনা করে তার সারাঘর বইয়ে ঢাকা—রঙীন ফুলের মতো সুন্দর কত বই, কত কথা। সেখানেই তার বেঁচে থাকার পৃথিবী।

বাঁদিকে বাঁধের ওধারে উঁচু বাঁজা ডাঙায় কন্ট্রাকটারের তাবুর মাথা দেখা

যাচ্ছিল। শেষবেলায় কালো ধোঁয়া উঠেছে চাপচাপ সেদিকটায়। পিচের ড্রাম গরম করছে মজুরেরা। মার্চেই কাজ শেষ করার কথা ছিল। শেষ করা যায় নি। এপ্রিলের একটা সপ্তাহ চলে গেল। তাই ব্যস্ততা। সন্ধ্যা অব্দি কাজ চলেছে। আগামী পয়লা বোশেখ পূর্তমন্ত্রী উদ্বোধন করতে আসবেন।

বাঁজা ডাঙা থেকে কেউ দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে—পরনে ধূসর প্যান্ট, সাদা শার্ট, মাথায় টুপি। রঙ্গনা অস্বস্তি বোধ করছিল। লোকটাকে সে এদিকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়াল। নির্জন জায়গা। তার গা ছমছম করছিল। বাঁধে উঠতেই সে দেখল, লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। পড়ন্ত বেলার লালচে আলো তার মুখের একটা পাশে পড়েছে। রঙ্গনাও দাঁড়িয়ে গেল। তার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত ছলকে উঠল। শতদ্রু না?

পরক্ষণেই দেখল শতদ্রু হাসছে। তারপর লম্বা পায়ে এগিয়ে সে বাঁধে উঠল। 'কী আশ্চর্য! আপনি রঙ্গনা না?'

রঙ্গনা হাসল এতক্ষণে। 'আপনি এখানে?'

শতদ্রু একটু মুষড়িয়ে গেছে। রঙের সেই উজ্জ্বলতা আর নেই। ঈষৎ তামাটে, রোদপোড়া আর রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। বলল, 'কদিন থেকে লক্ষ্য করছি আপনাকে। কি ভুলেও ভাবিনি যে আপনি।' শতদ্রু সিগারেট ধরাল উদ্দাম হাওয়ার আড়ালে 'বাঁকা-শ্রীরামপুরের কথা আপনার দিদির কাছে শুনেছিলুম যেন। নাকি অ-কেউ বলেছিল। যাক্ গে, খবর বলুন। আপনার দিদি কেমন আছেন?'

রঙ্গনা বলল 'দিদি ভাল আছে। আপনি বুঝি রাস্তার কাজে এসেছেন?'

'আর বলেন না।' শতদ্রু একটু বিরক্ত মুখে বলল। 'শেষপর্যন্ত পৈতৃক পেশায় ঢুকলুম। চাকরি-টাকরি আমার পোষাল না। ওদিকে বাবা মারা গেলেন। তখন ভাবলুম, বাবার পরিচিত এলাকাতেই কাজকর্ম নেওয়ার সুবিধে অনেক বাবার অনেক কন্ট্যাক্ট ছিল তো এ জেলায়।'

রঙ্গনা বলল। 'তাহলে সত্যি আমেরিকায় ফিরে যাননি দেখছি।'

শতদ্রু হাসল। 'সেই শেষ দেখা আপনার সঙ্গে—করালী নদীর ব্রিজে। মনে আছে? আমি সম্ভবত খানিক রূঢ় ব্যবহার করেছিলুম। এতদিনে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। আসলে তখন আমি প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ে আবার?' ক্ষমা করছেন তো?'

রঙ্গনা আস্তে বলল, 'কেন ও কথা? পাঁচবছর আগে কী ঘটেছিল, আমার আছে এখানে,

'আমার মনে আছে।' শতদ্রু দূরের দিকে তাকিয়ে চাপা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ঘুরে বলল ফের, 'তারপর আমার খুব ইচ্ছে করেছিল, আপনাদের বাড়ি যাই। সবকথা বলে আসি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কীভাবে আপনারা নেবেন ব্যাপারটা।'

রঞ্জনা ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'কী?'

'আপনার দাদার ব্যাপারটা।'

'আমরা জানি।'

'জানেন?' শতদ্রু একটু চমকে উঠল। 'কীভাবে জানলেন?'

'আমার জামাইবাবু শুনেছিলেন আপনাদের বাড়ির একটা লোকের কাছে।'

'ভুলোদার কাছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

শতদ্রু গলায় একটু ব্যাকুলতা এনে বলল, 'বাবার কোনো হাত ছিল না এতে। জানোয়ার পুষেছিলেন বাড়িতে—'

বাধা দিয়ে রঞ্জনা বলল, 'ওসব কথা থাক। বসন্তপুরের বাড়িটা তো বেচে দিয়েছেন শুনেছি।'

শতদ্রু আনমনে বলল, 'হ্যাঁ। বহরমপুরে একটা বাড়ি করেছি সম্প্রতি। কলকাতার বাড়িটায় ভাড়াটে বসিয়েছি।' তারপর একটু হাসল। 'এখন বাবার মতো ঘোর বিষয়ী মানুষ হয়ে গেছি, বুঝলেন? খুব হিসেবী মানুষ।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। বউ, ছেলেপুলে—অবশ্য মাত্র একখানা, সবে হাঁটতে শিখেছে—বড্ড বিচ্ছু। বুঝলেন?'

রঞ্জনা তাকাল তার মুখের দিকে। 'কোথায় বিয়ে করলেন

'বহরমপুরেই শেষপর্যন্ত। বাবাকে আর বুড়োবয়সে কষ্ট দিতে চাইনি। তাছাড়া মায়েরও...'

রঞ্জনা হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, চলি। দিদিকে বলব আপনার কথা

শতদ্রু আস্তে বলল, 'এলাকায় আছি। তাই আশা করছি, কোনোদিন আপনার বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে যাব। ভুলে যাবেন না কিন্তু। আর বিয়েটা এমন হঠাৎ হয়ে গেল যে কিছু করার ছিল না। আসলে ভাগ্য তার বেঁচে একটা আছে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো মূল্য সে দেয়

রঞ্জনার চোখ জলে উঠেছিল। মুহূর্তে শান্ত হয়ে সে ঠোঁট বুর মাথা দেখা

হাসল। 'বিয়ে ছাড়া এখনও অন্যকিছু ভাবতে শেখেন নি মনে হচ্ছে। আচ্ছা, চলি'

শতদ্রু পা বাড়িয়ে বলল, 'রঞ্জনা! শুনুন। আপনি কি রাগ করলেন আমার কথায়?'

'না।'

'রঞ্জনা, আপনি রাগ করেছেন।'

।'...

আক্রান্ত প্রাণীর মতো রঞ্জনা হনহন করে হাঁটছিল। স্কুলবাড়ির কাছে গিয়ে একবার ঘুরে দেখল, শতদ্রু তখনও বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। এক-মুহূর্তের জন্য তার মনে প্রশ্ন উঠল, কেন? কিন্তু জবাব খুঁজতে গিয়ে দেখল তার বুকের ভেতরটা পাঁচবছর আগের এক সন্ধ্যাবেলার মতোই দুলে উঠেছে, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে।

যখন সে বাড়ি ঢুকল, তখন সে শান্ত এবং কঠোর। অপরূপা বলল, 'কোথায় থাকিস রনি এতক্ষণ পর্যন্ত? রতুর বউ এসেছিল। এই ভাখ, একগাদা মাছ দিয়ে গেল। কাল থেকে ওর ছেলেটাকে নিয়ে একটু বসবি, বুঝলি? জাস্ট আর্থটা একটু পড়াবি।' অপরূপা কলাপাতা তালতোহাতে খুলে খয়রামাছ-গুলো দেখিয়ে হাসল। 'রতুর বউ বলল, রোজ এমনি টাটকা মাছ খাওয়াবে। ও রনি, অবেলায় আমি আর আঁশের হাত করব না রে! লক্ষ্মী ভাই তুই এগুলোর ব্যবস্থা কর।'

টাটকা মাছগুলো দেখে মুহূর্তে রঞ্জনার মুখ খুশিতে ভরে গেল। বঁটি নিয়ে কলতলায় দৌড়ল হন্তদন্ত। দিনশেষের ধূসর আলোয় ফুলফলের সংসারে বসন্তপুরের ভিটের সেই পুরনো কোনো দিনের আনন্দ ফিরে এসেছে। আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে রঞ্জনার মনে হয়, কুড়ানি ঠাকরুন তেমনি করে দাওয়ায় বসে তাকে দেখছেন এবং হাতে কাটলেই বলে উঠবেন, 'অই। অই।'

রঞ্জনা বলল 'দিদি, ভুলে গেছি বলতে। আজ কী অদ্ভুত ব্যাপার জানিস?'

'কী?'

'বিয়াত্রিব দাদার সঙ্গে দেখা হল।'

অপরূপা ব্যস্ত হয়ে কাছে এল। 'সে কী রে! সাটলেজদাকে কোথায় দেখলি আবার?'

রঞ্জনা কাজে মন দিয়ে বলল, 'ওই যে রাস্তা হচ্ছে—তার কন্ট্রাক্টার। অ্যাদ্দিন আছে এখানে, আমরা জানিই না। আর বুঝলি দিদি? মুখের জিওগ্র্যাফি

বদলে গেছে। হঠাৎ দেখলে চিনতেই পারবিনা। কাঁদুটিয়ে না গেছে! তোমার কথা জিগ্যেস করছিল।'

অপরূপা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুই সঙ্গে করে ডেকে আনলিনে কেন? কোথায় উঠেছে বল তো সাটলেজদা?'

'কে. ? তুই যাব নাকি দেখা করতে?'

অপরূপা হাসল। 'যাব বৈকি। হাতের কাছে এসে পড়েছে। যাব না?' শিবমন্দিরের পাশে কন্ট্রাক্টারের ক্যাম্প দেখেছি। ওখানেই

রঞ্জনা মাথা দোলাল।

'হ্যাঁ রে, কেমন মনে হল ওকে?' অপরূপা চাপা গলায় বলল।' আসলে দাদার ব্যাপারটার জন্যেই পিছিয়ে গিয়েছিল। কনসেনসাস ছেলে তো! কিন্তু ভেবে ছাখ রনি, ওর তো কোনো দোষ নেই ওতে। ওর বাবাও নেই ভাবতে গেলে। বাহাদুরটাকে যদি পেতুম, বঁটি দিয়ে কাটতুম। পালিয়ে গেছে যে।'

রঞ্জনা টিউবেলের হাতল চেপে মাছের ওপর জল ঢালতে থাকল। টিউবেলটা হরেনের টাকায় হয়েছে। পলিমাটি এলাকার জল বলে কেমন আঁশটে গন্ধ জলটার। তবু অল্প চাপেই ঝরঝর করে একরাশ জল উগরে দেয়।

অপরূপা চোখের জল মুছে বলল ফের, 'পাস্ট্ ইজ পাস্ট্। আমি সকালে যাব সাটলেজদার কাছে। শুনেছি কেষ্ট সিঙ্গি মারা গেছে। তবে ওর বউটি ভালমানুষ। হবে না কেন? কলকাতার মেয়ে—এজুকেটেড মেয়ে। কথাবার্তায় কি আভাস পেলুম না তোকে কত পছন্দ বিশ্বাসের মায়ের?'

রঞ্জনা মাছগুলো ধোয়া কলাপাতায় নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'কুড়ানি দিদি, তোর সাটলেজদা বহরমপুরে বিয়ে করেছে। বাচ্চা হয়েছে। হাঁটি-হাটি পা-পা করছে বলল। আর বলল, বড্ড বিচ্ছু।'

অপরূপা ঘুরে দাঁড়িয়ে কান করে শুনছিল। চমক খেয়ে বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

রান্নাঘরের বারান্দায় হেরিকেন জ্বেলে রঞ্জনা দেখল, অপরূপা জ্যোৎস্নায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে কলতলার কাছে। আবছা আঁধারে তাকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। রঞ্জনা কুড়ানি ঠাকরুনের কণ্ঠস্বরে ডাকল, 'সন্ধেবেলা অমন করে দাঁড়িয়ে থাকে না। এখানে আয় না রে দিদি!'

অপরূপা আস্তে বলল, 'যাই।'...